দেবীকল্পনার ৩৮টি অসামান্য শিল্পরূপ, 'দেশ' পত্রিকার অর্ধশতকের গর্ব

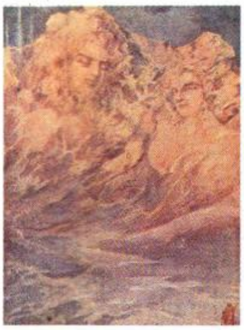

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ পনেরো টাকা

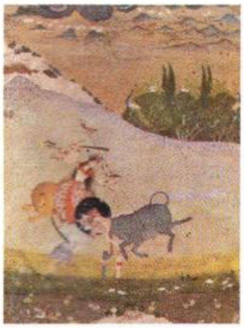

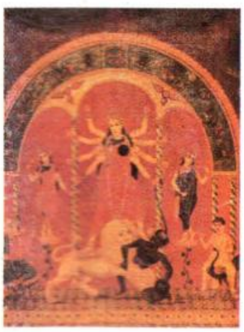

অভিনব পঞ্জিকা ❋ মহিষমর্দিনী বনাম মার্কসবাহিনী ❋ কুমোরটুলির শব্দকোষ

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - লাইব্রেরী

স্ক্যান ও এডিট করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম

আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার স্পেশাল ইস্যু থাকে
এবং আপনি যদি আমাদের সাথে সেগুলি সংরক্ষণে সাহায্য করতে চান
তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

আমার মা-বাবার ইচ্ছে ছিল অনুষ্ঠান হোক সাদাসিধে, কাজ নেই ঘটাপটায়।
ওর মা-বাবাও রাজি, বাদে একটি রোশনি-ছটা।

আমি, ও, আর নেহাত আপনজনেরা। হঠাৎ কোত্থেকে ও বাড়িয়ে ধরল অপরূপ এই আংটিটি। ও একা নয়, ওর মা-বাবা সবাই মিলেই ঠিক করেছে হীরে দিয়েই জানিয়ে দেবে ওদের কাছে আমি কত স্পেশাল। আমায় কুণ্ঠিত দেখে ওরা হেসে সান্ত্বনা দিল দাম কিছু আকাশছোঁয়া নয় যে বিয়ের কনেকে মাথা ঘামাতে হবে। আশ্বাসভরা ওর সেই স্বর বাজে কানের কাছে, যখনই এই হীরের পানে তাকাই। সাদামাটা অনুষ্ঠান, এই পরশমণির ছোঁয়ায় হয়ে উঠেছে জীবনজোড়া মহোৎসব!

হীরে কেনার নির্দেশিকা

পরীক্ষা করে নিন '4C' - CUT (কাট), COLOUR (কালার), CLARITY (ক্ল্যারিটি) এবং CARAT WEIGHT (ক্যারেট ওজন), যা দিয়ে হীরের কোয়ালিটি আর দাম স্থির করা হয়।

সাইজ এবং কোয়ালিটি অনুযায়ী হীরের দাম ভিন্ন-ভিন্ন হয়। ভালো কোয়ালিটির হীরের জন্য দাম পড়বে মোটামুটি এইরকম...

10 পয়েন্ট	20 পয়েন্ট	30 পয়েন্ট
টা.2000-5000	টা.7000-11000	টা.15000-25000

হীরে সম্পর্কে বিশদভাবে খবর নিতে হলে আপনার জুয়েলারকে জিজ্ঞাসা করুন অথবা ডি বিয়ার্সকে লিখুন, সেই 1888 থেকে যাঁরা সারাবিশ্বে হীরে-বিশারদ। ঠিকানা: ডায়মণ্ড ইনফরমেশন সেন্টার, পোঃ আঃ বক্স নং 1887, জি.পি.ও., মুম্বই।

ডি বিয়ার্স
DE BEERS
হীরে চিরতরের

HTA.2240.99

দেশ

২ আশ্বিন ১৪০৫ • ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ • ৬৫ বর্ষ ২৪ সংখ্যা

প্র চ্ছ দ প্র তি মা

অর্ধশতকের দেবীভাষ্য

'দেশ' পূজা সংখ্যায় ১৩৫১ থেকে ১৪০৪ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত শ্রীদুর্গার প্রতিমাকল্পনাগুলি গবেষণা করতে গিয়ে দেখা গেল, এর স্তরে স্তরে তিনটি অসামান্য ইতিহাস কথা বলতে চাইছে। একটির ভাষা সত্যকার বাঙালিরই ভাষা, তবে তুলিতে আঁকা একালের বাঙালির মনের ইতিবৃত্ত। এই সংখ্যায় প্রচ্ছদে ও ভিতরে যে-৩৮টি প্রতিমা-প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যেও আর একটি ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুচ্চস্বরে চিত্রশৈলীর বিবর্তনের বর্ণনা দিচ্ছে— নন্দলাল থেকে প্রকাশ কর্মকার, ওড়িশার পট থেকে কাঠখোদাই, সেখান থেকে প্রাচীন কাংড়া পর্যন্ত। তৃতীয় ইতিহাসটিও অনুচ্চ থাকাই উচিত, যেহেতু বিষয়টি আত্মগৌরবের। অর্ধশতকই বলা চলে, সাতচল্লিশ বৎসর যাবৎ বাংলার সর্বাগ্রগণ্য সাহিত্য-চিন্তার পত্রিকাটি কীভাবে দেবীকে চিত্রার্পিত কল্পনায় বিধৃত করেছে, সে ইতিহাসটিও মূল্যবান। বিশেষত আরও এইজন্য যে, প্রকৃত প্রস্তাবে 'দেশ' ধর্মনিরপেক্ষতার ধর্মে আহৃদয় দীক্ষিত। প্রচ্ছদেই কেবল নয়, ভেতরের রঙের পাতাতেও দেওয়া হয়েছে প্রতিমার ৩৮টি প্রতিলিপি (প্রতিটি চিত্রপরিচিতির শেষে পূজা সংখ্যায় প্রকাশের বর্ষটি উল্লিখিত হয়েছে)।

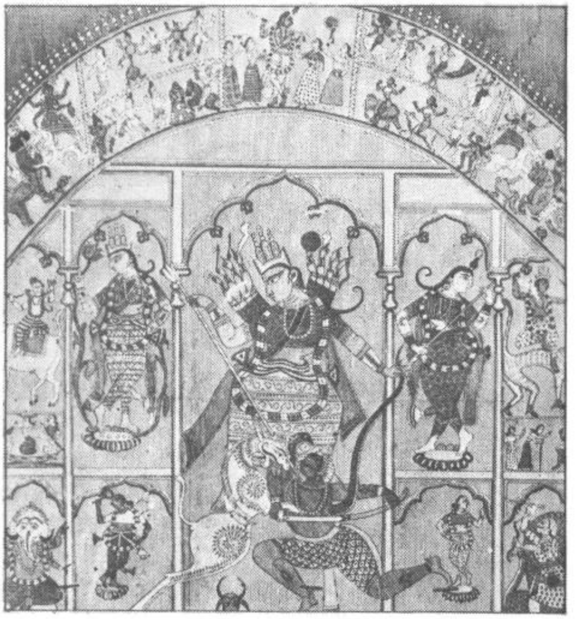

১৭৬৭-তে প্রকাশিত জে জেড হলওয়েলের বইতে দুর্গাপ্রতিমার এনগ্রেভিং

বর্ষক্রম অনুযায়ী প্রচ্ছদের ছবিগুলির পরিচিতি (প্রতি সারি, বাঁ দিক থেকে ডান দিকে) এইরকম:

প্রথম সারি ❑ শিল্পী **প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়**। ১৩৫০ ❈ **বাঁকুড়ার প্রাচীন পট**। ১৩৫৩ ❈ শিল্পী **নন্দলাল বসু**। ১৩৫৫ ❈ **প্রাচীন পট**। ১৩৫৯ ❈ হুগলীর প্রাচীন পট। শিল্পী **যোগেন্দ্র চিত্রকর**। ১৩৬০

দ্বিতীয় সারি ❑ **প্রাচীন কাংড়া চিত্র**। ১৩৬১ ❈ ওড়িশার পটচিত্র। শিল্পী **রাম মহারানা**। ১৩৬৫ ❈ **ওড়িশার প্রাচীন পট**। ১৩৬৭ ❈ **বাংলার প্রাচীন পট**। ১৩৭৪ ❈ **প্রাচীন পট, বীরভূম**। ১৩৭৬

তৃতীয় সারি ❑ **পুরনো তৈলচিত্র**। ১৩৭৭ ❈ **প্রাচীন চিত্র**। হাটসারিন্দার, বীরভূম। ১৩৮২ ❈ শিল্পী **রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়**। ১৩৮৩ ❈ বীরভূমের পটচিত্র। শিল্পী **কালীপদ সূত্রধর**। ১৩৮৪ ❈ বাংলার প্রাচীন কাঠখোদাই। ১৩৮৫

চতুর্থ সারি ❑ শিল্পী **গণেশ পাইন**। ১৩৮৬ ❈ শিল্পী **প্রকাশ কর্মকার**। ১৩৮৮ ❈ **বাংলার প্রাচীন চিত্র**। ১৩৮৯ ❈ শিল্পী **জে সুলতান আলি**। ১৩৯১ ❈ **বাংলার প্রাচীন পট**। ১৩৯২

পঞ্চম সারি ❑ **বাংলার প্রাচীন পট**। ১৩৯৪ ❈ শিল্পী **পরিতোষ সেন**। ১৩৯৯ ❈ শিল্পী **রামকিঙ্কর**। ১৪০২ ❈ অষ্টাদশভুজা দুর্গা। **প্রাচীন রাজস্থানী চিত্র**। ১৪০৩ ❈ **টেরাকোটা**। দক্ষিণা কালীর মন্দির, মালঞ্চ, মেদিনীপুর। ১৪০৪

প্র চ্ছ দ নি ব ন্ধ

মহিষাসুর, ১ম ও ২য় সংস্করণ

একদা মার্কসীয় বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও মহিষমর্দিনী এখন নিঃসন্দেহে বিজয়িনী। এই সাংস্কৃতিক বিজয়টি সম্বন্ধে লিখেছেন *রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়*। দেবীকাহিনী ও তদাশ্রয়ী কথকতার স্রোতধারা বিষয়ে আলোচনা করেছেন *গৌতম ভদ্র*। ❑ ৫৫

ক বি তা

নূতন কবিতার সন্ধানে

'এই হেমন্তের কবিতা'-রূপী সংখ্যাটির সঙ্গে তুলনীয় নয়, ঠিকই। কিন্তু দুর্গাপূজার সপ্তাহের এই বিশেষ সংখ্যাটির সমৃদ্ধি ও কোমলতা দিয়েছে প্রতিষ্ঠিত দুজন ছাড়া আরও ছয়জন গণ্ডিবহির্ভূত কবি এই সংখ্যার সম্পদ। ❑ ২২

সম্পাদকীয় ❑ ৫ ❑ চিঠিপত্র ❑ ৭

প্রচ্ছদ নিবন্ধ ❑ জ্যোতিভূষণ চাকী • বিশ্বজিৎ রায় • নীলাক্ষ গুপ্ত • গৌতম ভদ্র • রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় • জয়ন্ত দাস • গৌতম চক্রবর্তী ❑ ৪৭

কবিতা ❑ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় • বিবেকানন্দ মোদক • শ্রীজাত • জয় গোস্বামী • দীপ্তেন্দু ঘোষ • শম্ভু রক্ষিত • একরাম আলি • অচ্যুত মণ্ডল • অনুরাধা মহাপাত্র • বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় • অদিতি ঘোষ • সাম্যব্রত জোয়ারদার • হিন্দোল ভট্টাচার্য • চন্দ্রিল ভট্টাচার্য • অর্ণব সাহা • তৃষ্ণা ভট্টাচার্য ❑ ২২

গল্প ❑ অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ৩৪ ❑ সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় ❑ ৪০

ধারাবাহিক উপন্যাস ❑ সমরেশ মজুমদার ❑ ২৯ ❑ বাণী বসু ❑ ৭৬

গ্রন্থলোক ❑ ৮৩ ❑ কখন কোথায় ❑ ৮১

শিল্পসংস্কৃতি ❑ ৯৩ ❑ শেষের পাতা ❑ ৯৮

সাম্মানিক সম্পাদক সাগরময় ঘোষ • **সম্পাদক** অমিতাভ চৌধুরী

এবিপি লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ২০ পয়সা। উত্তর-পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

Desh (USPS 007-887) is published fortnightly for an annual subscription of $54.00 by ABP LTD., 6 PRAFULLA SARKAR STREET, CALCUTTA-700 001, INDIA. Our distributor in USA is House of Ananda Inc. 113, Lexington Ave. Rear, New York 10016. Periodicals class postage paid at NY-10199. Post Master Please send address change to House of Ananda Inc. P.O. BOX 1833, NY-10010

দ্বিগুণ চমক বিনামূল্যে !

বিনামূল্যে ৫০টি মেমোর‍্যাক্স ট্যাবলেট অথবা ১০০ মিঃ লিঃ শঙ্খপুষ্পি প্রতি ১কেজি চ্যবনপ্রাশ পেট জার-এর সাথে।

বিনামূল্যে ৫০ টি মেমোর‍্যাক্স ট্যাবলেট অথবা ১০০ মিঃ লিঃ শঙ্খপুষ্পি ও একটি স্টেনলেস স্টীলের চামচ প্রতি ২কেজি চ্যবনপ্রাশ পেট জার-এর সাথে।

সাধারণ চ্যবনপ্রাশের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকরী **বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ**। কারণ এতে **মকরধ্বজ** ছাড়াও আছে ৪৮টি প্রাকৃতিক উপাদান, যেমন বংশলোচন, পিপুল এবং আমলা।

তা ছাড়া সাধারণ অসুখবিসুখ এবং সর্দিকাশি প্রতিরোধ করতে **বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশে** যোগ করা হয়েছে **অকৃত্রিম ভিটামিন 'সি', ক্যালসিয়াম ও মিনারেল**।

দিনে দু'বার দু-চামচ **বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ** সারা পরিবারের জন্য আদর্শ টনিক। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, শক্তিমান ও প্রাণবন্ত জীবনের এই একটিই সহজ উপায়।

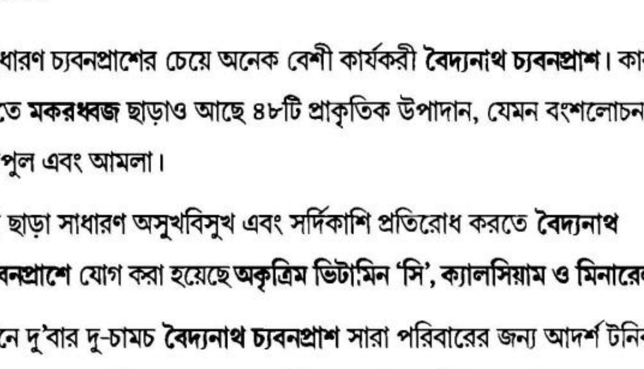

এখন
৩৪ টাকা মূল্যের
পুনর্ব্যবহারযোগ্য আকর্ষণীয়
পেটজারে উপলব্ধ

বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ স্পেশাল

Mileage 1300

সব বাড়ন্ত বাচ্চার যা একান্ত প্রয়োজনীয়

ভাঙনের পর তৎপরতা

আগে ভাঙে, তারপর আমরা ভাঙনের জন্য সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি। এটাই আমাদের জাতীয় চরিত্র। নদীর বাঁধে ফাটল ধরে, আমরা পাশ দিয়ে হেঁটে যাই, তারপর প্রবল জলের ধাক্কায় সেই বাঁধ বিধ্বস্ত হয়, প্লাবনে ভেসে যায় গ্রাম-নগর, লক্ষ লক্ষ মানুষ বিপন্ন হয়, অনেকে প্রাণ হারায়, তখন মনে পড়ে, ফাটল মেরামত করা কিংবা বাঁধ উঁচু করা উচিত ছিল। রোগ ছড়ায়, রোগ মহামারীর আকার ধারণ করে, তখন ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে, আগে থেকে রোগ প্রতিরোধ করার মানসিকতাই আমাদের নেই।

হাওড়া ব্রিজে এমন গর্ত হয়ে যায় যে তার মধ্য দিয়ে একটা লোক গঙ্গায় পড়ে গিয়ে মরে। তখন ব্রিজ সারাবার কথাটা ওঠে, যেন গর্তটা আগে কেউ দেখেনি। ইস্কুল বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়ে ছাত্রদের মাথায়, বাড়িটা যে কতদিন আগে থেকে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল, তা লক্ষ করে না কেউ। এ শহরে বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনা মোটেই বিরল নয়। নতুন বাড়ি তৈরির নকশা অনুমোদন করার জন্য পুরসভা কতরকম টালবাহানা করে, কিন্তু কত পুরনো বাড়ি যে কুৎসিত, কদর্য হয়ে আছে, সেদিকে নজর দেবার দরকার মনে করেন না নগর-কর্তৃপক্ষ, সিনেট হল সমেত অনেক ঐতিহাসিক অট্টালিকা ধ্বংস হওয়ায় কলকাতা-প্রেমীদের হঠাৎ টনক নড়েছে, এই রকম কিছু কিছু ভবনকে বাঁচিয়ে রাখার সদিচ্ছায় হেরিটেজ বিল্ডিং বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে শুধু টাউন হলটির সংস্কার হয়েছে এতদিনে, তবে সেই টাউন হলের সদ্ব্যবহার হবে কী ভাবে, তার ঠিক নেই। বাকি বাড়িগুলি সংরক্ষণের উপায় নির্ধারণের জন্য কমিটি হয়েছে, কমিটি রিপোর্টও পেশ করে, তা নিয়ে বৈঠক হয়, বৈঠকে কোনও সিদ্ধান্ত হয় না, আদালতের দীর্ঘসূত্রী মামলার মতন পরবর্তী বৈঠকের তারিখ পড়ে। এর মধ্যে সেই বাড়িগুলি আরও জীর্ণ, আরও ধ্বংসের পথে যাচ্ছে কি না, তা নিয়ে কে মাথা ঘামাবে?

এখন জীবন বিমা কর্তৃপক্ষ ও পুরসভার মধ্যে মেরামত-সংস্কারের ব্যয়ভার কে কতখানি নেবে বা নেবে না, তাই নিয়ে দরাদরি চলছে। কথা চলবে, কথা চলতেই থাকবে।

এই ঔদাসীন্যেরই নবতম দৃষ্টান্তটি দেখা গেল সম্প্রতি। ধর্মতলা-চৌরঙ্গি অঞ্চলে সবচেয়ে বৃহৎ ও সুদৃশ্য প্রাসাদটি এখন একটি কঙ্কাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রিটিশ আমলে এটি ছিল এশিয়ার বৃহত্তম ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, নাম ছিল হোয়াইট ওয়ে লেডল বিল্ডিং, এর চূড়ার ঘড়িটি দেখা যেত বহু দূর থেকে, পথচারীরা সঠিক সময় মিলিয়ে নিত। স্বাধীনতার পর এক বাঙালি বিমা-ব্যবসায়ী এই অট্টালিকাটি কিনে নেন, তখন থেকেই এর রূপ নষ্ট হতে থাকে। তখন এর নতুন নামকরণ হয় মেট্রোপলিটন বিল্ডিং। বাঙালির ব্যবসা আর কতকাল চলবে? তা ছাড়া বিমা জাতীয়করণের পর এই অট্টালিকার মালিকানা চলে যায় জীবন বিমা সংস্থার কাছে। বর্তমানে এই অট্টালিকা একটি নামহীন কবন্ধ।

মালিকানা যারই হোক, শহরের প্রাণকেন্দ্রে এরকম একটি বিখ্যাত প্রাসাদ যে হানাবাড়ির রূপ ধারণ করছে, তা রোধ করার দায়িত্ব কি সরকার বা নগর কর্তৃপক্ষের নয়? এটাকে হেরিটেজ বিল্ডিং বলে দেগে দিলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? এর মধ্যেই একদিন এর চাতালের সুদৃশ্য কাচের ছাদ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে। ভাঙার পরেই যথারীতি তৎপরতা শুরু হয়। এখন জীবন বিমা কর্তৃপক্ষ ও পুরসভার মধ্যে মেরামত-সংস্কারের ব্যয়ভার কে কতখানি নেবে বা নেবে না, তাই নিয়ে দরাদরি চলছে। কথা চলবে, কথা চলতেই থাকবে। কবে কাজ শুরু হবে কেউ জানে না। এর মধ্যে পুরো বাড়িটি ধূলিসাৎ হয়ে গেলেও আশ্চর্যের কিছু নেই।

বিশেষ ছাড় ২০%

অপরাজেয় কথাশিল্পী
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
পুণ্য জন্মমাস উপলক্ষে

১ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত
অবিশ্বাস্য কম দামে

সমগ্র শরৎসাহিত্যসম্ভার

সুলভ শরৎসমগ্র । কমিশন ২০%

২০০ টাকা দামের দু-খণ্ডের এই সেট হাতে-হাতে নিলে এখন পাওয়া যাবে ১৬০ টাকায়। ডাকে নিলে পড়বে মোট ১৮০ টাকা।

শরৎ সাহিত্যসমগ্র । কমিশন ২০%

দু-খণ্ডের সেট গিফট-কেসসহ মূল্য ৪০০ টাকা। কাউন্টারের ক্রেতারা এই সময়ে পাবেন ৩২০ টাকায়। ডাকে নিলে পড়বে মোট ৩৪৪ টাকা।

অখণ্ড শ্রীকান্ত । কমিশন ২০%

চার পর্বে লিখিত শ্রীকান্ত উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে দুই মলাটে বিধৃত এক অভিনব সংস্করণে।
বোর্ড বাঁধাই ৮০·০০। এখন পাবেন ৬৪·০০ ডাকে ৭৭·০০।
পেপারব্যাক ৭০·০০। এখন পাবেন ৫৬·০০ ডাকে ৬৯·০০।

- পুস্তক বিক্রেতারা এই সময়ে পাবেন অতিরিক্ত কমিশন।
- বাইরের পুস্তক বিক্রেতাদের ক্ষেত্রে অর্ডার-এর সঙ্গে পুরো টাকা অগ্রিম পাঠানো আবশ্যিক।
- এম.ও /ব্যাঙ্ক ড্রাফটে টাকা পাঠাতে হবে। আউটস্টেশন চেক নেওয়া হবে না। ভি.পি.পি.-তে বই পাঠানো হয় না।

এই সুযোগ পাওয়া যাবে
আমাদের নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র
(৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯-এর দ্বিতল) থেকে
এবং দক্ষিণ কলকাতার বিক্রয়কেন্দ্র
যোগাযোগ (দোকান নং ০২-৬৮,
গড়িয়াহাট মার্কেট কমপ্লেক্স, কলিকাতা-১৯)

প্রকাশিত হল

সাময়িকী

সম্পাদক প্রদীপ বসু
দাম ৩০০.০০

উনিশ শতকের বাংলা ও বাঙালির জীবন-সংস্কৃতির বহু মূল্যবান সম্পদ বিধৃত হয়ে আছে পুরনো পত্র-পত্রিকায়। সেকালের বাংলা সংবাদপত্রগুলিতে ওই শতকের বাঙালি-জীবনের যে-নিখুঁত চিত্র আমরা পাই, তা আর কোথাও লভ্য নয়। অথচ যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে এই সমস্ত সংবাদপত্র আজ ধ্বংসের মুখে। তখনকার বহু বিখ্যাত সাময়িকপত্রের অবস্থাও তেমনই জীর্ণ। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই অমূল্যসম্পদও হয়তো একদিন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
সেই সময়কার সাময়িকপত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার বিষয় ছিল নানাবিধ, এর মধ্যে উনিশ শতকের প্রথম দিকে ভূগোল, ভূতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, রসায়ন প্রভৃতিই বেশি আলোচিত হত। এ ছাড়া প্রাণিবিদ্যাচর্চার জন্য ছিল আলাদা পত্রিকা। এই নির্বাচিত রচনাসংগ্রহে একদিকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং অন্যদিকে দেশীয় জ্ঞান, জীবন, নিয়মরীতি, অভ্যাস এই দুয়ের সংযোগের পরিসর থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে-আলোচনার উদ্ভব হচ্ছে, সেই আলোচনাকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।
নির্বাচিত এই রচনাগুলির সময়কাল ১৮৫০ থেকে ১৯০১।
বস্তুত তখনকার বিজ্ঞানচর্চার ধারা স্পষ্টভাবে বুঝতে গেলে এই সংকলনটি অপরিহার্য।

নতুন মুদ্রণে

কবিতা সমগ্র

বিষ্ণু দে
প্রথম খণ্ড ৫০.০০
দ্বিতীয় খণ্ড ১০০.০০
তৃতীয় খণ্ড ৭৫.০০

পড়ামাত্রই ফুরিয়ে যান না বিষ্ণু দে। ফিরে-ফিরেই পড়তে হয় তাঁকে। বারবার এবং বহুবার। শুধু এককভাবে তাঁকে বুঝতেই নয়, আধুনিক বাংলা কবিতার সমগ্রতাকে অনুধাবন করতেও জরুরি বিষ্ণু দে-র কাব্যগ্রন্থাবলী। এ-যুগের প্রধান কবি বিষ্ণু দে-র যাবতীয় কবিতার এই তিন-খণ্ড সংগ্রহ সেই জরুরি প্রয়োজনের দাবি মেটাতেই পরিকল্পিত। স্বক্ষেত্রে সুখ্যাত নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও পবিত্র সরকারের পরিশ্রমী সম্পাদনা-ঋদ্ধ এই সংগ্রহ বিস্তৃত কাব্যপরিচয়, বিশিষ্ট শব্দের অর্থ ও ব্যক্তি-পরিচয়জ্ঞাপক তথ্যপঞ্জিতে সমৃদ্ধ।

আরও বিজ্ঞাপন
৮২ পাতায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন : ২৪১-৪৩৫২, ২৪১-৩৪১৭

সেরা লেখকের সেরা বই

দূরদর্শনের জনপ্রিয় কাহিনী

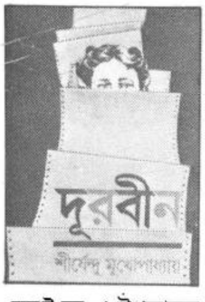

দূরবীন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
দাম ১০০.০০

শুধু তিন প্রজন্মের তিন প্রতিভূর অসামান্য কাহিনীর জন্যই নয়, এ-উপন্যাসের বিস্তৃত ও বর্ণাঢ্য প্রেক্ষাপটে আরও বহু বিচিত্র, কৌতূহলকর শাখা-কাহিনীর এবং এর চালচিত্রে স্বদেশী আন্দোলন, দেশভাগ ও স্বাধীনতা-পরবর্তী উত্তাল দিনরাত্রির এক তাৎপর্যমণ্ডিত উপস্থাপনার জন্যও 'দূরবীন' চিহ্নিত হবে অবিস্মরণীয় সৃষ্টিরূপে। দূরবীন শুধু দূরকেই কাছে আনে না, উলটো করে ধরলে কাছের জিনিসও দূরে দেখায়। নামে যেমন সূক্ষ্মতা, এ-উপন্যাসের রচনারীতিতেও তেমনই অভিনবত্ব এনেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। দ্বিস্তর এই উপন্যাসে সেকাল-একাল, অতীত-বর্তমান যেমন একদিকে অনন্য কৌশলে একাকার, অন্যদিকে চলমান শতাব্দীর দুইয়ের দশক থেকে আটের দশক পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময়ের প্রেক্ষাপটে সামাজিক জীবনের যাবতীয় পরিবর্তন এক আশ্চর্য দূরবীনের মধ্য দিয়ে ও এক দুর্নিবার আকর্ষণমণ্ডিত কাহিনীর ভিতর দিয়ে লক্ষ্যগোচর করে তুলেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর জোরালো, সংবেদনশীল কলমের জাদুতে।

বক্সার রতন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
দাম ৩০.০০

বক্সার রতন এক অসাধারণ কল্পবিজ্ঞান কাহিনী, যার সঙ্গে মিশেছে রহস্য-রোমাঞ্চ এবং মজা। গরিব পরিবারের সামান্য চাকুরে ছেলে রতন। বাবা ছিলেন নামকরা বৈজ্ঞানিক। পৃথিবীর কয়েকজন কুখ্যাত ধনী ব্যক্তির একটা দুষ্টচক্র রতনের বাবার আবিষ্কার হাত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, ওদিকে আরেকদল বিদেশি বিপ্লবীও সেই গবেষণার জন্যই ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই দুই দলের হাতে রতনের বাবা বাঞ্ছারাম ও রতনের টানাপোড়েন নিয়ে এক দারুণ উৎকণ্ঠা মেশানো কাহিনী 'বক্সার রতন'।

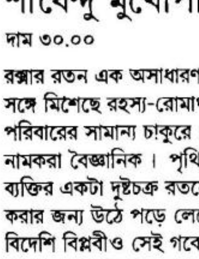

নবীগঞ্জের দৈত্য

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
দাম ৩০.০০

বেশ ছিল নবীগঞ্জের জীবনযাত্রা ছক-বাঁধা নিস্তরঙ্গ। হঠাৎই আবির্ভাব ঘটল বিশাল চেহারার এক দৈত্যের। পরনে ঝলমলে জরির পোশাক, হাতে একখানা বাক্স। শুরু হল বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানা কৌতুকময় নানান ঘটনার ঘনঘটা

> ‘বিলাতি সাহিত্যে রবীন্দ্রভরসা এখনও দীপ্তি হারায়নি’— শুধুমাত্র কিছু বইয়ের প্রকাশ থেকেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না। ‘দি মিরিয়াড-মাইন্ডেড ম্যান’ প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিলেতে তামাশা চলেছিল।

রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যে মোটেও শ্রদ্ধেয় নন

প্রসঙ্গ : ‘দেশ’ ২ মে ১৯৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধ সম্পর্কে পত্রাঘাত করেছেন রঞ্জিত সেনগুপ্ত। পত্রলেখক লক্ষ করেছেন জ্যোতিভূষণ চাকী এবং তাপস মজুমদারের প্রবন্ধে পরিবেশিত তথ্যে গোলমাল আছে। শ্রীসেনগুপ্ত সঠিক তথ্য তুলে ধরেছেন। তৃতীয় প্রবন্ধটিতে উল্লিখিত রবীন্দ্রবিষয়ক পাশ্চাত্য-আগ্রহ যে সশ্রদ্ধ আগ্রহ নয়, সেই সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এই পত্রসাহিত্যে।

‘দেশ’ পত্রিকায় (২ মে, ১৯৯৮) জ্যোতিভূষণ চাকী ‘রবীন্দ্র-আত্মার দুইটি বিহঙ্গ—উপনিষদ এবং হাফেজ’ প্রবন্ধে যে ভাবে “আবদাড়ি চাপদাড়ি” ছড়াটির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটিয়েছেন তাতে মনে হতে পারে ছড়াটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত। এ ছড়াটি সম্পর্কে অবনীন্দ্র-দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন—

“... একদিন সকালবেলা অরুদা এসে হঠাৎ বললেন—ওরে, লিখে নে, একটা ভালো ছড়া মনে পড়ে গেছে। তোদের ম্যাগাজিনের জন্য বেশ হবে। দাড়ির গান। আমি লিখে ফেললুম—

আব্ দাড়ি চাপ দাড়ি
বুলবুল চস্‌মেদার দাড়ি—
কুল পাক্কা এক কাঁচ্চা
সব্‌সে দাড়ি ওহি আচ্ছা
এক দাড়ি মান মনোহর
এক দাড়ি ভচ্চো
এক দাড়ি খালিফ ফজিহৎ
এক দাড়ি বচ্চো!
ইত্যাদি ইত্যাদি

দাদামশায় কাছেই বসেছিলেন। বললেন—দেখি দেখি নিয়ে আয় তো। অ্যাদ্দিনে অরুদার স্টক্ থেকে বেরল কিছু।

এই বলে অরুদার সেই দাড়ির গানকে অবলম্বন করে এক সুরসাল গল্প লিখে ফেললেন।” (দক্ষিণের বারান্দা—মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়—ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ—১ম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৮৮৯ শকাব্দ, পৃঃ ৪১-৪২)

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবরণ থেকে মনে হচ্ছে ছড়াটি অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, যাঁর ‘ফির্নি খাওয়ার গল্প’র সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। তাপস মজুমদার রচিত ‘শিক্ষার স্বপ্নে অসামঞ্জস্য ছিল কিন্তু বিরাটত্বও বিস্ময়কর’ প্রবন্ধে নর্মাল স্কুলের সেই প্রার্থনা সঙ্গীতটি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ গোলমেলে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। ‘জীবনস্মৃতি’তে রবীন্দ্রনাথ এর উল্লেখ করেছেন—“কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং” বলে, তাপসবাবুর ধারণা মতো “ফল্লোকি, ফুল্লোকি, সিঙ্গিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং” বলে নয়। ‘জীবনস্মৃতি’ লিখবার সময় রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন যে “পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং” আসলে হবে “Full of glee, Singing merrily, merrily, merrily” কিন্তু “কলোকী” যে আদতে কী ছিল তা তিনি তখনও ধরতে পারেননি। মূল গানখানি (A School Song) যে Eliza Lee Cabot Follen রচিত—

Follow me, full of glee, Singing merrily

—তার হদিস কিন্তু তাপসবাবুর ধারণা মতো অ্যান্ড্রু রবিনসনের সাম্প্রতিক গবেষণায় মিলেছে বলা যায় না। কারণ ১৯৫১ সালে প্রবোধচন্দ্র সেন “রবীন্দ্র প্রসঙ্গ” প্রবন্ধে (দেশ, ২১ বৈশাখ, ১৩৫৮), এ বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং কবিতার সমগ্র রূপটি আমাদের কাছে তুলে ধরেন (সূত্র : রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ—নবম খণ্ড—পৃঃ ৭১৯, এবং রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে [৩/৩/১৯৮৫] পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ‘কলোকী পুলোকী’)। আর ‘নর্মাল স্কুল’ ডেভিড হেয়ার স্থাপিত কিনা সন্দেহ হয়। কারণ ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থে ‘নর্মাল স্কুল’ পরিচ্ছেদে পাদটীকায় উল্লেখ আছে, স্কুলটি ইং ১৮৫৫, জুলাই মাসে ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে’ স্থাপিত হয়। (রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪২১) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে স্কুলটি ১৮৪৭ সালে স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু দু’বছর পর উঠে যায়। বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ১৮৫৫ সালের ১৭ জুলাই সংস্কৃত কলেজের বাটীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

‘বিলাতি সাহিত্যে রবীন্দ্রভরসা এখনও দীপ্তি হারায়নি’ প্রবন্ধে জ্যোতির্ময় দত্তর সিদ্ধান্ত গত চার বছরে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় রবীন্দ্রবিষয়ক চারটি বইয়ের প্রকাশই প্রমাণ করে যে “রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের চেতনা থেকে চিহ্নহীন মুছে তো যানইনি, বরং পাশ্চাত্যের মনীষীরা রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, তা এই প্রস্থানোদ্যত শতাব্দীর অন্য কোনও কবিকে দেননি।” শুধুমাত্র কিছু বইয়ের প্রকাশ থেকেই এত বড় সিদ্ধান্তে আসা বোধ হয় যায় না। শ্রীদত্ত উল্লিখিত The Myriad - Minded Man সহ চারটি বইয়ের তিনটির সঙ্গেই যুক্ত কৃষ্ণা দত্ত এবং Andrew Robinson, সম্পাদক অথবা রচনাকার হিসেবে। The Myriad-Minded Man প্রকাশিত হবার পর বিলেতে সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তামাশা চলেছিল। এই

'কবি, জননী, জন্মভূমি একাকার হয়ে যায়-
জয় গোস্বামী দেশ, ২৫ জানুয়ারি ১৯৯৭
গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা-সংকলন
বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বঙ্গ ইতিহাস ৪০.০০
পঞ্চাশের কবি পঞ্চকের কাব্যাস্বাদন
এক অক্ষৌহিণী বৃষ্টিরেখা ৫০.০০
পূর্ব প্রকাশিত কাব্যত্রয়ী
গৌরীচাঁপা নদী, চন্দরা ৩.০০
সপ্ত দিবানিশি কলকাতা ৪.০০
মীনাঙ্ক সোপান ৬.০০
ডঃ কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের বিপুল গবেষণাগ্রন্থ
বাউল-সুফী-শিখ মরমীয়াবাদের তুলনামূলক আলোচনা
The World of Mystics 150.00
গীতা চট্টোপাধ্যায়ের অসামান্য গবেষণা গ্রন্থ
ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য ১২৫.০০
পুনঃ প্রকাশিত
কয়েকটি অভিমত : "রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত পুরাণ—এই তিনখানি মহাগ্রন্থের আধারে বেদোত্তর কালের ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত। ...এই দিকে দৃষ্টি দিয়া শ্রীযুক্তা গীতা চট্টোপাধ্যায় (এম.এ, পি. এইচ.ডি) তাঁহার অতি উপাদেয় পুস্তক সার্থক গবেষণার ক্ষেত্র ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য প্রকাশ করিয়াছেন।"
আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
"আমি শ্রীপাদ সনাতনের শ্রীপদপ্রান্তে তোমার স্থান নির্দেশ করিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতের নূতন ব্যাখ্যাকর্ত্রী তুমি।"
ডক্টর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন
"The present thesis will remain as an immortal classic in this field". —ডক্টর শীতাংশু বাগচী, এম.এ, ডি.লিট, ডিরেক্টর মিথিলা ইনস্টিটিউট, দ্বারভাঙা।
"ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য বইখানির কথা জানতে পেরে আনাই বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার হতে। আজ শেষ করলাম। খুব ভাল লাগলো পড়ে— বেশ স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি থেকে লিখিত।" রবীন্দ্র-জীবনীকার
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
প্রাপ্তিস্থান : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী কলি-৬
চক্রবর্তী চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং লিঃ
১৫ কলেজ স্কোয়ার কলি-৭৩
ঋক্ প্রকাশন :
১৮ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৯

বইটির আলোচনা প্রসঙ্গে The Sunday Times-এর সমালোচক Humphrey Carpenter শিরোনাম দিয়েছিলেন 'Mystic or Mistake'. The Times এই বইয়েরই আলোচনা প্রসঙ্গে লিখলেন— 'The Wisest fool in Calcutta'। স্পষ্টতই গ্রন্থ-সমালোচকদের অপ্রাসঙ্গিক বিদ্রূপের লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ। আনন্দবাজারে (২২ মার্চ, ১৯৯৫) প্রকাশিত লন্ডন থেকে শ্রাবণী বসুর প্রতিবেদনে এটা স্পষ্ট পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথকে জোর করে অস্বীকার করার অসুস্থ প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু এহ বাহ্য। The Myriad-Minded Man-এর রচনাকারদ্বয়ের একজন Andrew Robinson এই পত্রলেখককে এক পত্রে জানিয়েছেন— "It is a myth that he (Tagore) is still revered in the West. The book therefore had to be written to generate new interest..." (পত্র, 3 Oct, 1995)। অর্থাৎ Andrew Robinson-এর ধারণায় রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যে মোটেই শ্রদ্ধেয় নন, এবং তাঁর সম্পর্কে ঔৎসুক্য জাগানোই ছিল The Myriad-Minded Man-এর উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কি হয়নি সে প্রশ্ন অন্য। কিন্তু The Myriad-Minded Man- এর প্রকাশ যে পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রভাবনার উজ্জ্বল উপস্থিতির দ্যোতক বলে বিবেচিত হতে পারে না তা গ্রন্থকারদ্বয়ের একজনের চিঠিতেই স্পষ্ট। রাদিচির রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সংগ্রহ শ্রীদত্তর হাতের কাছে নেই বলে তা তিনি আলোচনার পরিধিতে আনেননি, কিন্তু সে বইটির আবির্ভাবও তিনি গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করেন। সেই বইটির—অর্থাৎ Rabindranath Tagore—Selected Short Stories— 'Introduction' অংশে রাদিচি মন্তব্য করেছেন—

"Tagore's art is a vulnerable art. Nearly all his writings are vulnerable to criticism, philistinism or contempt, because of his willingness to wear his heart on his sleeve, to take on themes that other writers would find grandiose, sentimental or embarrassing and his refusal to cloak his utterances in cleverness, urbanity or double-talk... His short stories are his most vulnerable productions of all..." (pp. 25-26)। রাদিচির বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব রচনাই "Vulnerable", এমনকি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প "most vulnerable". বোঝা দুষ্কর রাদিচি কেন সেই ছোটগল্পের অনুবাদকর্মে সময় ব্যয় করেন। যাই হোক, অনূদিত ছোটগল্পের ভূমিকা অংশে রবীন্দ্ররচনার বিশ্লেষণে রাদিচির মন্তব্য শ্রীদত্তর ধারণাকে পুষ্ট করে না।

গাঁধী-রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে শ্রীদত্ত একটু শ্লেষের সঙ্গেই বলেন— "রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীর লেখা পাশাপাশি এনে সম্পাদকদ্বয় 'জাতির পিতা'র বিশেষ অপকার করেছেন।" অপকৃত হওয়া অবশ্য গাঁধীর কাছে নতুন কিছু নয়। তিনি নিজেই জানিয়েছেন— "I am used to misrepresentation all my life. It is the lot of every public worker... Life would be burdensome if every misrepresentation has to be answered and cleared" (Gandhi's life in his own words—p. 54)। শ্রীদত্ত মন্তব্য করেছেন "সব কাজে, তা চরকা কাটাই হোক, কিংবা অন্য কিছুই হোক স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁকে চালনা করেন, এই উক্তির মধ্যে যে চরম আত্মশ্লাঘা আছে, সে বোধ গাঁধীর ছিল না"। সে বোধ যখন তাঁর ছিল না তখন ধরে নেওয়া যায় তিনি সচেতনভাবে "চরম আত্মশ্লাঘার"র প্রকাশ ঘটাননি। ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং তার অনুভব ব্যাপারটি গাঁধীর কাছে খুব একটা অসাধারণ বলে মনে হয়নি, কারণ তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন— "I believe that we can all become messengers of God, if we cease to fear man and seek only God's Truth... I have no special revelation of God's will. My firm belief is that he reveals himself daily to every human being. but we shut our ears to the 'Still small voice'. We shut our eyes to the 'pillars of fire' in front of us" (All Men are Brothers. p. 88). যুক্তির বিচারে গাঁধীর বক্তব্য যদি বা অচল হয়, তা আত্মশ্লাঘার প্রকাশ এমন বলা বোধ হয় যায় না।

ডোনাল্ড রিচি ❑ আকিরা কুরোশাওয়ার চিত্রকর্ম ❑ ৩০
ধীমান দাশগুপ্ত ❑ বুনুয়েল! বুনুয়েল! ❑ ২৫
প্রলয় শূর ❑ হিচকক ❑ ৩০
মৃণাল সেন ❑ অন্তরীণ (চিত্রনাট্য) ❑ ৩০
ধীমান দাশগুপ্ত ❑ সিনেমার অ আ ক খ ❑ ১২৫
বীতশোক ভট্টাচার্য ❑ কবিতার অ আ ক খ ❑ ৮০
সুবিমল মিশ্র ❑ জুলপিয়া বাবুঘাট ❑ ৫০
প্রকাশনার পথে
অতনু পাল ❑ ফোটোগ্রাফি হ্যান্ডবুক ❑ ৫০
বিতর্ক ৭৭ বেনিয়াটোলা স্ট্রিট (শোভাবাজার) কলকাতা - ৫/ফোন : 530 8151

প্রাক-পূজা প্রকাশনা
কথাকার বীরেন্দ্র দত্তের ভিন্নস্বাদী প্রবন্ধ-গ্রন্থ
বাংলা কথাসাহিত্যের একাল
১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যবর্তী গল্প-উপন্যাসের মূল্যায়ন। ১০০ টাকা
প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী
পুস্তক বিপণি। ২৭ বেনিয়াটোলা লেন।
কলকাতা-৯ দূরভাষ : ২৪১-৬৯৮৯

বিহার ভূমিকম্প নিয়ে 'হরিজন' পত্রিকায় (16/2/1934) গাঁধী যা লিখেছিলেন তা থেকে একটি অনুচ্ছেদ পুরো উদ্ধৃত করা প্রয়োজন— "To me the earthquake was no caprice of God nor a result of a meeting of mere blind forces. We do not know all the laws of God nor their working. Knowledge of the tallest scientist or the greatest spiritualist is like a particle of dust. If God is not a personal being for me like my earthly father, He is infinitely more. He rules me in the tiniest detail of my life. I believe literally that not a leaf moves but by His will. Every breath I take depends upon His sufferance." এই অনুচ্ছেদটির মধ্যে শ্রীদত্ত পেয়েছেন গাঁধীর "প্রায় নবীর মতো দাবি" এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে তাঁর "ফতোয়া"। কিন্তু অনুচ্ছেদটির পূর্বাপর বাক্যগুলির সম্বন্ধ বিশ্লেষণ থেকে তা মনে হয় না, বরং মনে হয় সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের কাছে মানুষের জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধিও যে কতটা সীমাবদ্ধ গাঁধী এখানে তাই বলতে চেয়েছেন।

বিহার ভূমিকম্প প্রসঙ্গে গাঁধী আরও বলেছেন— "I admit my utter ignorance of the working of the laws of Nature ... I cannot prove the connection of the sin of untouchability with the Bihar visitation even though the connection is instinctively felt by me. If my belief turns out to be ill-founded, it will still have done good to me and those who believe with me." (Harijan, 16/2/1934, The Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol. 57, p. 165)। এর মধ্যেও কিন্তু গাঁধীর "প্রায় নবীর মতো দাবি" খুঁজে পাওয়া যায় না। এবং এর যৌক্তিক বিশ্লেষণ যে ধারণার জন্ম দেয় তা হল গাঁধী দৈব দুর্বিপাককে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন।

"পশ্চিমের সমগ্র সভ্যতা " গাঁধী "উড়িয়ে দেন এক ফুৎকারে" শ্রীদত্তর এই মন্তব্যও সংশয় জাগায়। কেননা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনায় গাঁধী বলেছেন— "It appears that Western civilization is destructive, Eastern civilization is constructive. Western civilization is centrifugal, Eastern civilization is centripetal. Western civilization, therefore, is naturally disruptive whereas Eastern civilization combines" (The Selected Works of Mahatma Gandhi, Vol. VI, p. 279) পাশ্চাত্য সভ্যতা কিন্তু তাঁর কাছে কর্মমুখিনও, এবং তা তিনি মেলাবার কথা বলেছেন প্রাচ্য সভ্যতার সঙ্গে — "I think Western civilization also represents tremendous activity, Eastern civilization represents contemplativeness, but it also sometimes represents lethargy ... It is necessary, that that (Eastern) civilization should come in contact with that of the West ..." (Ibid p. 279, 280). রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সংকট' এবং 'কালান্তর' অন্তর্গত কিছু প্রবন্ধ সাক্ষ্য দেবে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সভ্যতা বিষয়ে গাঁধী ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রভাবনার বিশেষ অমিল নেই।

সাহিত্য, দর্শন এবং বিজ্ঞানের প্রতিও কি গাঁধীর সত্যিই ছিল "তাচ্ছিল্যের ভাব"? মনে হয় না, কারণ তিনি বলেন— "I am not opposed to the progress of science as such. On the contrary the scientific spirit of the west commends my admiration" (Ibid— p. 319-320). গ্রিক দার্শনিক Socrates-এর গুণমুগ্ধ তিনি, তাঁর কাছে "he (Socrates) was beautiful because all his life was a striving after Truth" (Ibid, p.288) সাহিত্য তিনি বেশি পড়েননি। জানিয়েছেন সে কথা নিজেই (Gandhi's Life in His Own Words, p.66)। কিন্তু Dean Farrar-এর খ্রিস্টের জীবনী বিষয়ক গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে যখন তিনি বলেন— "It is not in Dr. johnson's style but in the easy style of Dickens" (Ibid, p.305), তখন মনে হয় Dr. Johnson এবং Dickens-এর রচনাশৈলীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল।

বুদ্ধদেব গুহ'র

জঙ্গল সম্ভার ১৫০

বনজঙ্গলের বিচিত্র মানুষের যেসব অনবদ্য ছবি বিগত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এঁকে বঙ্গসাহিত্যকে এক নতুন মর্যাদা দিয়েছেন সেইসব বিখ্যাত জার্নাল, গল্প-উপন্যাসের সংকলন। এতে আছে জঙ্গল মহল, বনবাসর, পারিধী, লবঙ্গীর জঙ্গলে এবং জঙ্গলের জার্নাল।

অদল বদল ৫০

মধ্যপ্রদেশের যেখানে 'অচানকমার অভয়ারণ্য যেখান দিয়ে অমরকণ্টকের দুর্গম পথ গেছে, তারই পটভূমিতে আনুমানিক পঞ্চাশ বছর আগের আদিবাসী মানুষের জীবনযাত্রার এক জীবন্ত ছবি।

ঋভু ১ম ৬০ ২য় ৬০ ৩য় ৬০

বিচিত্র অভিজ্ঞতাময় জীবনের রসসমৃদ্ধ সত্য উপাখ্যান। তাঁর দোষ-গুণ কৃতিত্ব-অকৃতিত্ব সহ তাঁর ঋজু ভণ্ডামিহীন লেখনীর গুণে নিজেকে ধরা দিয়েছেন।

ভাল লাগে না ৩৫

আসামের বরাক উপত্যকার শিলচরের পটভূমিতে এক ব্যতিক্রমী উপন্যাস।

অভিলাষ ৪০

নিজস্ব স্নিগ্ধ অভিলাষ বুকে নিয়েই অধিকাংশ যুবক-যুবতীকে শুধুমাত্র ম্যাগনোলিয়া, গ্রান্ডিফ্লোরার কুঁড়ির গন্ধ নিয়েই দিন কাটাতে হয় দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে।

চানঘরে গান ৩০

দুই বাংলার পাঠক-পাঠিকার নিজের বই—আপন বই।

লেখকের অন্যান্য বই

শালডুংরি ৩৫ অজগরের দেশে ২৫ পরদেশিয়া ৩০ ইলমোরাণদের দেশে ২০ কাঙ্গপোকপি ৩৫ সাজঘরে একা ২০ প্রেমের গল্প ৭০ শ্রেষ্ঠ গল্প ৮০ ধুলোবালি ৪৫ রিয়া ৩৫ পঞ্চপ্রদীপ ৫০ কোজাগর ৭৫ পলাশতলীর পড়শী ২৫ আলোকঝারি ৩০ নাজাই ৩৫ যাওয়া আসা ২৫ মহড়া ৩০ পারিধী ৩০ সোপর্দ ২৫ বনবাসর ২৫ প্রথম প্রবাস ৩০ পঞ্চম প্রবাস ৩০ চবুতরা ১৫ প্রথমাদের জন্য ২৫ স্বগতোক্তি ৩০ লবঙ্গীর জঙ্গলে ৩০ জলছবি, অনুমতির জন্যে ২০ আয়নার সামনে ২৫ জঙ্গল মহল ৩০ ঝাঁকিদর্শন ৩০ সুখের কাছে ৩৫ জঙ্গলের জার্নাল ৩০ দূরের দুপুর ৩০ দূরের ভোর ২৫ বাজা তোরা রাজা যায় ২০

দে'জ পাবলিশিং

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

ফোন : ২৪১-২৩৩০/২৪১-৯২৬৬

এবারেও সেরা

এফ. আই. পি-র পুরস্কারজয়ী এই সময়ের সেরা গ্রন্থ উজ্জ্বলকুমার দাস

টাইটানিক ৩০

বহুবর্ণে ঝলমলে ছাপা। অজস্র রঙিন ছবি

পাঠকের পুরস্কারে জয়জয়কার জমজমাট পুজোবার্ষিকী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত

ছুটির সাথী ৫০

নির্মল বুক এজেন্সী

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

ফোন : ২৪১-৯২৩৮/২৪১-৫৭২৮

আদিত্য সেনের ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস নিরন্ন-১/ ১০০

খাদ্য নিয়ে যে রাজনীতির খেলা দ্বিতীয় যুদ্ধের পটে নিরন্ন (প্রথম খণ্ড) তারই ইতিহাস। স্বাধীনতা আন্দোলন, সুভাষ বোস ও ফজলুল হকের মত ঐতিহাসিক চরিত্র যেমন আছে, তেমনি আমলাতন্ত্রের অন্দরমহলের কাহিনী। প্রাপ্তিস্থান : এন.পি. সেলস ২০৬ বিধান সরণী, কল-৬, দিল্লী : জে-১৮৬৯ সি আর পার্ক, নিদি-১৯, ৬৪৮-২৫৭০।

প্রকাশিত হল

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়-র

মানুষের হাহাকার ৬০

সত্তর দশকে পশ্চিমবাংলায় একটি অসংগঠিত বিপ্লবের চেষ্টা হয়েছিল। বহু তাজা প্রাণ সহ জোৎদার, পুলিশ খুনের যে ধারাবাহিকতা শুরু এবং অকালে শেষ—তারই কিছু সামাজিক বিশ্লেষণ এই উপন্যাসের বিষয়।

❑ **লেখকের অন্যান্য বই ঃ**

নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে (১/২) ১৩০

অলৌকিক জলযান (১/২) ১৫০

ঈশ্বরের বাগান (১-৪) ২৬০

মানুষের ঘরবাড়ী ৫০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

কুবেরের বিষয় আশয় ৪০, **হলদী নদীর সারেঙ** ৪০, **ক্ষমতার বারান্দা** ৪০, **কন্দর্পদর্পণ** ৪০

শক্তিপদ রাজগুরু

মণিবেগম ৭০, **আপনজন** ৪০, **অগ্নিযুগের পদাতিক** ৭৫, **দশচক্র** ৪০, **আবির্ভাব** ৪০

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

নদী মাটি অরণ্য (১ম পর্ব) ১০০, **চাঁদমারি** ৪০, **বিষ পিঁপড়ে** ৪০, **জীবনের সাত রং** ৫০

অমর মিত্র

কৃষ্ণগহ্বর ৫০, **সুবর্ণরেখা** ৪০, **নদীবসত** ৪০, **জনসমুদ্র** ৫০

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

পরিখা ৩০, **কালাধার** ৩৫

নলিনী বেরা

শবরচরিত ৫০, **যে আছে অপেক্ষা করে** ৫০

আফসার আমেদ

প্রেমে অপ্রেমে একটি বছর ২৫, **ঘরগেরস্থি** ৪০

করুণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন, কলি-৯, ফোন ঃ ২৪১-০২৫৬

কারান্তরালে থাকাকালীন তিনি পড়েছিলেন Carlyle-এর French Revolution (Ibid, p. 53) যাকে বোধহয় 'আত্মোন্নতি ও হিতসাধনকামী "how-to" জাতীয় ক্ষণখ্যাত মার্কিন বই' আখ্যা দেওয়া যাবে না। শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা অনেকের সঙ্গে না মিলতে পারে, কিন্তু তাতে "তাচ্ছিল্য" বোধ হয় নেই। তাঁর কাছে শিল্পের থেকে জীবন বড় (All Men are Brothers, p. 228)। তিনি চেয়েছেন গণসাহিত্য, যা জীবন থেকে নেওয়া— "I want them (our literary men) to go to villages, study them and give something life-giving ... I want art and literature that can speak to the millions." (The Selected Works of Mahatma Gandhi, Vol. VI, p. 305). শ্রীদত্ত লিখেছেন— "রবীন্দ্রনাথের গান - কবিতা - গল্প - শিক্ষাসংস্কার - গ্রামোন্নয়ন, সব কর্মই যে তাঁর নৈতিক মূল্যমানে তুচ্ছ, এটা গাঁধী কখনও গোপন করেননি।" তাহলে ধরে নেওয়া যায়, তা রবীন্দ্রনাথেরও অজানা ছিল না। তথাপি রবীন্দ্রনাথ গাঁধীর ওপরেই ন্যস্ত করেন বিশ্বভারতীর ভার। ১৯৪০ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ গাঁধীকে এক চিঠিতে লিখলেন— " ...And, now before you take your leave of Santiniketan I make my fervent appeal to you. Accept this institution under your protection, giving it an assurance of permanence if you consider it to be a national asset." গাঁধী প্রত্যুত্তরে তৎক্ষণাৎ জানালেন— "you may depend upon my doing all I can in the common endevour to assure its permanence."

সব মানুষের যেমন থাকে, গাঁধীরও ছিল অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি, হয়তো বা স্ববিরোধও। গাঁধী কিন্তু জানতেন তাঁর সামর্থ্যের সীমা, তাঁর ক্রটি-বিচ্যুতির কথা, সে কথা জানিয়েও গেছেন নানা ভাবে (Gandhi's Life in His Own Words— p. 53, 54)। তিনি 'মহাত্মা' হতে চাননি, চাননি Gandhi-র সঙ্গে `Ism' যোগ হোক (Gandhi's Life in His Own Words, p.1, 67, 68)। সত্য আর অহিংসা নিয়েও তিনি কৃতিত্ব দাবি করেন না— "I have nothing new to teach the world. Truth and non-violence are as old the hills."

অনেক বিষয়ে মতানৈক্য থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ঠিকই চিনে নিয়েছিলেন এই গাঁধীকে। তাঁর কথায়— "তাই আজ আমাদের জানতে হবে, যে মানুষ বিলেতে গিয়ে রাউন্ড টেব্‌ল কনফারেন্সে তর্কযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, যিনি খদ্দর চরকা প্রচার করেন, যিনি প্রচলিত চিকিৎসাশাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রপাতিতে বিশ্বাস করেন বা করেন না— এই-সব মতামত ও কর্মপ্রণালীর মধ্যে যেন এই মহাপুরুষকে সীমাবদ্ধ করে না দেখি।" (রবীন্দ্ররচনাবলী, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, চতুর্দশ খণ্ড, পৃঃ ২১০) গাঁধী এবং রবীন্দ্রনাথ— দুজনেই বিরাট, আজও রয়েছে দুজনেরই প্রাসঙ্গিকতা। দেশে কি বিদেশে, কেউ স্বীকার করুন বা না করুন।

রঞ্জিত সেনগুপ্ত

রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর

সক্রেটিসের আবির্ভাব প্রয়োজন

গত ৩০ মে সংখ্যাটি নিবেদিত হয়েছিল ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণ উপলক্ষে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনৈতিক ব্যবহারে শঙ্কিত দার্শনিক ও চিন্তাবিদ বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, 'ইমপ্যাক্ট অফ সায়েন্স অন সোসাইটি' গ্রন্থে "কী উপায় অবলম্বনে কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনো যাবে বিজ্ঞান মানুষকে সেই সন্ধান দিতে পারে মাত্র। যে কথা

পূজা উপলক্ষে বিশেষ ছাড়

সঙ্গীত জগতের কিংবদন্তী সুর ও সাধক

ভি. বালসারার আত্মজীবনী (রঙীন ছবি সহ)

জেগে থাকি সপ্তসুরে ~~১২০~~ ৮৫

লেখা প্রকাশনী

৫৭ডি, কলেজ স্ট্রীট, কলি-৭৩, ফোন ঃ ২৪১-৯৭১৮

রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থ

ডঃ তারকমোহন দাস - এর

পৃথিবী কি শুধু মানুষের জন্য ?

অজস্র ছবি সহযোগে। মূল্য ঃ ১০০.০০

জোনাকি (প্রা) লিমিটেড, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭৩

সুন্দর চুল চান
তো সঠিক কণ্ডিশনার লাগান।
LABORATOIRES GARNIER PARIS
Ultra DOUX
কণ্ডিশনার
বাড়তি চমক। বাড়তি কোমলতা। বাড়তি জীবনীশক্তি।
রোজকার রোদ-হাওয়ার প্রকোপ আর ঘনঘন আঁচড়ানোর ফলে আপনার চুলের ক্ষতি হয় । উলত্রা দ্যু এনরিচিং কণ্ডিশনার। প্রাকৃতিক বনস্পতি নির্যাস দিয়ে তৈরি এই কণ্ডিশনার আপনার চুলকে মসৃণ করে তোলে। ফলে আপনি পান এমন বাড়তি চমক, কোমলতা আর জীবনীশক্তি, যা কোনও কণ্ডিশনিং শ্যাম্পুর ধরাছোঁয়ার বাইরে।
ক্ষতিগ্রস্ত চুল
উলত্রা দ্যু দিয়ে কণ্ডিশনকরা চুল
শুষ্ক, স্বাভাবিক ও অল্পপুষ্ট চুলের জন্য আমাদের কণ্ডিশনার শ্রেণী থেকে আপনার পছন্দসইটি নিন।
GARNIER
Ultra DOUX
Enriching
CONDITIONER
for
DRY Hair
Natural extract of Wheatgerm
Extra Shine, Softness & Vitality
Ultra DOUX
যেখানে বিজ্ঞান প্রকৃতির বুকে
GUARANTEED BY LABORATOIRES
GARNIER PARIS

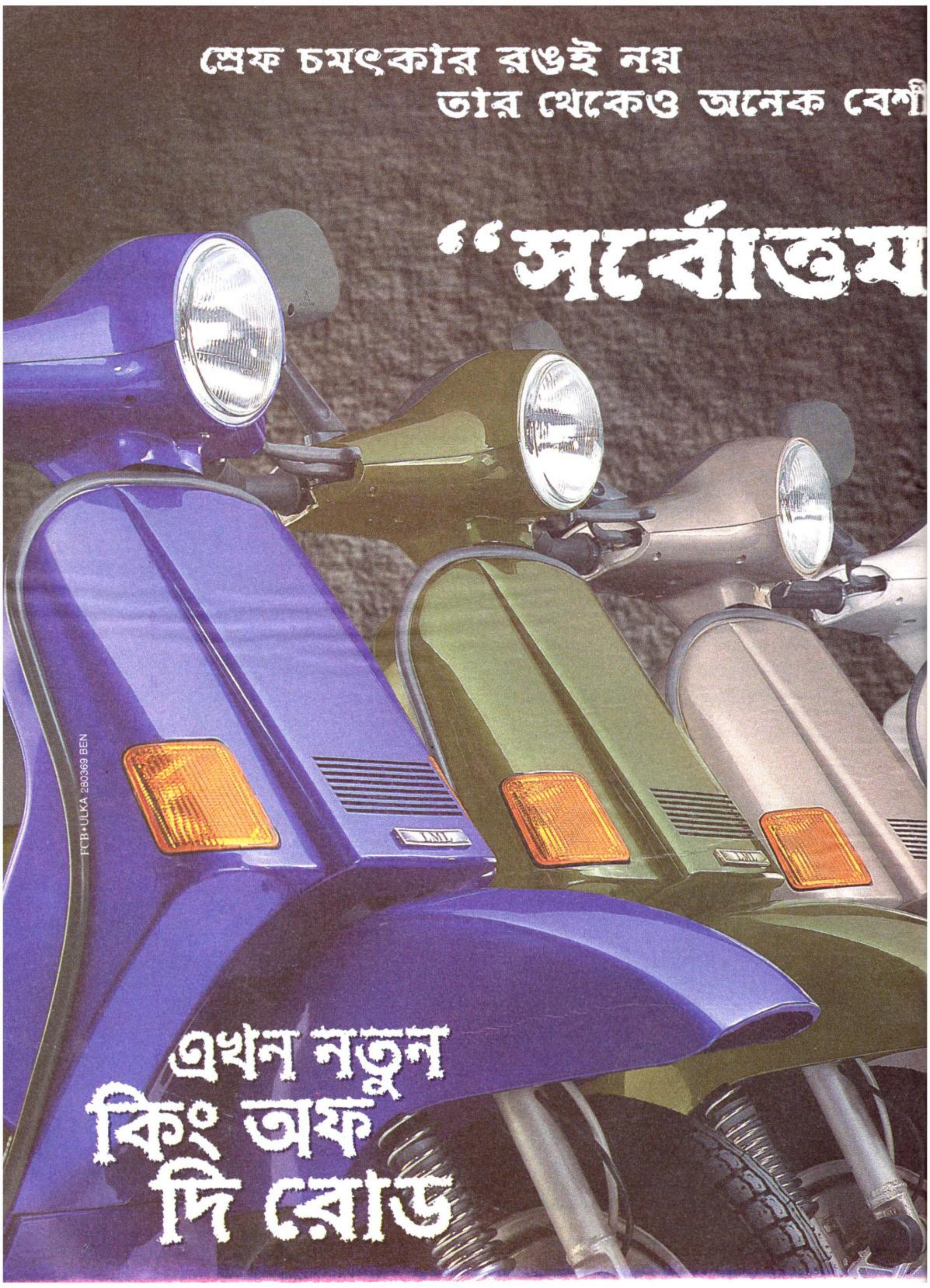
স্রেফ চমৎকার রঙই নয়
তার থেকেও অনেক বেশী
“সর্বোত্তম
এখন নতুন
কিং অফ
দি রোড
FCB•ULKA 280369 BEN

AOM
অটোমেটিক অয়েল মিক্সিং
2 বছরের
ইলেকট্রিক স্টার্ট
অনেক আগে।
সুপ্রীমো '94
*2-বছরের ওয়ার‍্যাণ্টি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ ডীলারের কাছ থেকে জেনে নিন।
টেকনলজির অভিনব নজীর।"
একথা কারোর অজানা নেই। কারণ সুপ্রীমোর সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য হ'লো, শুরু থেকেই এ রয়েছে এগিয়ে সবার চেয়ে। একে উত্তম থেকে সর্বোত্তম বানাতে আমরা সংযোজিত ক'রে চলেছি নিত্য নতুন বৈশিষ্ট্য আর কারিগরী উৎকর্ষতা যাতে সুপ্রীমো জাঁকিয়ে থাকতে পারে ভারতের রাস্তায় সবথেকে আধুনিক আর সবথেকে শ্রেষ্ঠ স্কুটার হিসেবে (নিজস্ব নব নব রঙের বৈচিত্র্যের সঙ্গে গড়ন সৌষ্ঠবের অসাধারণ জৌলুষ। এক কথায় রূপ, রঙ আর প্রযুক্তির এক দুর্লভ সমাহার)
সুপ্রীমো '98 ভারতে প্রথম এমন 150 সি সি স্কুটার যাতে আছে অটোমেটিক অয়েল মিক্সিং-এর (AOM) সুবিধা। ফলে ইঞ্জিনে মিশতে থাকে সঠিক সময়ে, সঠিক মাত্রায় টু-টী (2T) অয়েল। ইঞ্জিনের আয়ু এতে বাড়ে আর বাড়ে কর্মকুশলতা।
শুধু কি এই? সুপ্রীমোর ওপরে রয়েছে 2-বছরের এক অতুলনীয় ওয়ার‍্যাণ্টি* -- ভারতে এই শ্রেণীতে এই ধরণের ওয়ার‍্যাণ্টি এই প্রথম। সর্বোপরি এতে আছে ইলেকট্রিক স্টার্টের (ঐচ্ছিক) সুবিধা। বটনে চাপ দিন আর শুরু করুন আপনার রাজকীয় সফর।
আসুন আপনার কাছের এল এম এল শোরুমে আজই। আর নিয়ে যান অবিসংবাদিত এই নতুন কিং অফ দি রোড।
SUPREMO'98 FROM LML
নির্বাচিত শহরগুলিতেই শুধু পাওয়া যায়।

"এ তো মহা জ্বালা, জন্মভূমি দেখব না খাবার গরম করব ?"

কি আবার করবেন, জন্মভূমিই দেখবেন।

আর খাবার ?

রান্না যদি হয়ে গিয়ে থাকে সেলো হট্ পটে্ রেখে দিন। গরম থাকবে সাত ঘন্টা অবধি।

বাবা ! তাহলে তো বেঁচে যাই। রোজ রাঁধা অবধি পোষায়, তার উপর আবার বার বার গরম করা।

সেলোর হাতে ছেড়ে দিন না, খোদ জার্মান জিনিস।

দেখুন ঠিক বলছেন তো। আমার কর্তা কিন্তু খেতে বসে ঠান্ডা খাবার দেখলে ভীষণ চেঁচাবে।

শুধু সেলোতে আছে বিশেষ ধরনের জার্মান 'ইনসুলেশন,

তাই খাবার গরম থাকবে ঘন্টার পর ঘন্টা।

দেখেছেন ! আপনার সাথে কথা বলতে বলতে জন্মভূমি শুরু হয়ে গেল।

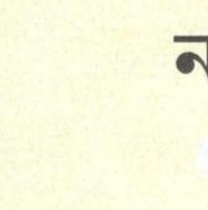

সেলো স্ট্যাকেবল

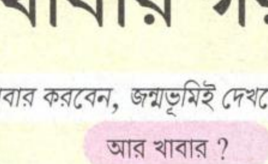

সেলো শেফ

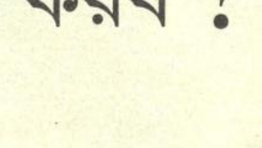

সেলো হট ম্যাক্স

cello HOTPOT

Better by Degrees

গরম খানা ফটাফট

৫০০ মিলি থেকে ১০ লিটার - সব সাইজে পাওয়া যাচ্ছে।

Situations/CT/9/98

সক্রেটিসের আবির্ভাব

বিজ্ঞান বলতে পারে না তা হল কেন একটি বিশেষ লক্ষ্যকে গ্রহণ করতে হবে অন্য আর একটিকে পরিহার করে।" রাসেলের মতে উপায় সম্বন্ধে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির যতই উন্মেষ ঘটছে লক্ষ্য সম্বন্ধে বুদ্ধির দীনতা ততই প্রকট হচ্ছে। উপায় এবং লক্ষ্য এ দুয়ের জ্ঞানের সমতা না এলে মানবসভ্যতা ধ্বংসের পথে চলবে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবি তাঁর সত্তরের দশকে প্রকাশিত 'সার্ভাইভিং দি ফিউচার' গ্রন্থে বললেন—"বিজ্ঞানের প্রয়োগে প্রযুক্তিবিদ্যা বিরাট শক্তিশালী ও কার্যকরী সব যন্ত্র তৈরি করছে। অথচ এই সমস্ত যন্ত্রকে ন্যায়সঙ্গত লক্ষ্যে ব্যবহার করবার জন্য যে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বা মানসিকতা বা সততার প্রয়োজন, তা আজও আমরা আহরণ করতে পারিনি। ফলে আমরা সঙ্গত কারণেই আজ শঙ্কিত হচ্ছি এই ভেবে যে, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সৃষ্ট এই সব যন্ত্রপাতি আমরা নিজেদের ধ্বংসের কাজেই হয়তো ব্যবহার করব। আজ মনুষ্যসমাজে একজন সক্রেটিসের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।"

আমাদের দুর্ভাগ্য, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিচালন ব্যবস্থা প্রধানত যাঁদের হস্তে অর্পিত সেই রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই খলনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সক্রেটিসের প্রজ্ঞায় তাঁদের আস্থা নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই অপব্যবহারে শঙ্কিত টয়েনবি আরও বললেন—দুশো বছর ধরে পাশ্চাত্যের দেশগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাধনা করে মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের মুখোমুখি করে দিয়েছে। আগামী দুশো বছর তারা বিজ্ঞান সাধনা স্থগিত রেখে প্রাচ্যের প্রজ্ঞাভিত্তিক জীবনদর্শনের চর্চায় আত্মনিয়োগ করুক, যাতে বিজ্ঞানের অবদানকে মানুষের ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ না করে তার সার্বিক কল্যাণে প্রয়োগ করতে পারে। হায়! টয়েনবি আজ বেঁচে থাকলে দেখতেন, প্রাচ্যবিদ্যার জনক যে ঋষিগণ একদিন বিশ্বের মানুষকে আহ্বান করে বলেছিলেন—হে বিশ্ববাসী শোনো, আমরা সবাই অমৃতের সন্তান, সেই ঋষিদের বংশধর আজ মস্তকে গেরুয়া উষ্ণীষ ধারণ করে সগর্বে ঘোষণা করছেন—বিশ্ববাসী শোনো, আমরাও এখন একটি পরমাণু অস্ত্রধর দেশ। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আমরা এই মৃত্যুর দেবতাকে আবাহন করতে দ্বিধা করব না।

জাতীয় প্রতিরক্ষার স্বার্থে এই পারমাণবিক বিস্ফোরণ এবং পরমাণু-অস্ত্রের 'ডেটারেন্ট' (দেশের অনুবাদ 'নিবৃত্তি-কৌশল') হিসাবে উপযোগিতা সন্দেহাতীত, শাসককুলের এই বহুল প্রচারে বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশ হয় বিভ্রান্ত নয়তো দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতায় ভুগছেন। সম্প্রতি এক বহুল প্রচারিত নামি মাসিক পত্রিকার বুদ্ধিজীবী মহলে সুপরিচিত সম্পাদক মহাশয় বিশেষ সম্পাদকীয় স্তম্ভে ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণকে কেবল সার্বিক অভিনন্দন জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী এই বিস্ফোরণের মধ্যে অতিজাতীয়তাবাদী অভিঃপ্রকাশ দেখতে পেয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তার কঠোর বাস্তবকে অগ্রাহ্য করার অভিযোগ তুলে 'তথাকথিত বুদ্ধিজীবী' আখ্যায় ভূষিত করতেও কুণ্ঠিত হননি। বুদ্ধপূর্ণিমার দিন পারমাণবিক বিস্ফোরণের মধ্যেও সম্পাদক মহাশয় কোনও দোষ দেখতে পাননি। মন্তব্য করেছেন—"বুদ্ধপূর্ণিমার দিন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়া ভারত বিশ্বকে আশ্বস্ত করিতে চাহিয়াছে যে, আমাদের প্রয়াস শান্তি ও মৈত্রীর বাতাবরণকে সুরক্ষিত করিবার জন্যই।" [উদ্বোধন, আষাঢ় ১৪০৫] এমন আশ্বাসের বাণী শাসককুলের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মুখে তিনি শুনেছেন সে কথা শ্রদ্ধেয় সম্পাদক পাঠকের জ্ঞাতার্থে বলেননি। দেশের সমস্ত মানুষের কাছে শাসককুলের প্রতিনিধিগণ পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কী বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন একটু স্মরণ করা যাক। মস্তকে গৈরিক উষ্ণীষ ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী যখন দলীয় কর্মীদের সভায় সদর্পে ঘোষণা করলেন—ভারত এখন পরমাণু-অস্ত্রধর দেশ, প্রয়োজনে আমরা এই অস্ত্রের প্রয়োগ করব, তবে তা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, তখন তাঁর প্রধান পারিষদ প্রতিবেশী বৈরী রাষ্ট্রকে সাবধান করলেন—এবার উপমহাদেশে ভৌগোলিক

ছোটোদের বইয়ের স্বপ্নরাজ্য
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড কল-৯

ঘনাদা-টেনিদা-ফেলুদার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র
মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা ১৫ ॥ ঘনাদা ও মৌকাসাবিস ১৫ ॥ ঘনাদা বিচিত্রা ৫০
বৃহৎ ঘনাদা সঙ্কলন ৭৫
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
সবার প্রিয় টেনিদা ২০ ॥ চারমূর্তি ২০
চারমূর্তির অভিযান ২০
ঝাউবাংলোর রহস্য ১৫
টেনিদার অভিযান ৫০
বৃহৎ টেনিদা সঙ্কলন ৭৫
রবীন বল সম্পাদিত
ঘনাদা-টেনিদা-ফেলুদার গল্প ২৫

রহস্য রোমাঞ্চ ভৌতিক গল্প

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার
সমুদ্রের হাতছানি ২০
হেমেন্দ্রকুমার রায়
ভৌতিক গল্প ২০
কিশোর অমনিবাস ৫০
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
হারানো কাকাতুয়া ২৫

১৩৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের
আত্মচরিত
আর্টপ্লেট সমৃদ্ধ হুবহু মূল সংস্করণ ॥ দাম ২০০ টাকা

ভ্রমণ-ইতিহাসের প্রামাণ্য গ্রন্থ
অবিভক্ত বঙ্গের সামাজিক দলিল
বাংলায় ভ্রমণ
১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে দাম ॥ ৩০০

ক্যুইজ বুকস
প্লাস
1000 + 100

অমরনাথ রায় ॥ নলেজ ক্যুইজ ॥ সায়েন্স ক্যুইজ ॥ কেমিস্ট্রী ক্যুইজ ■ অলক চক্রবর্তী ফিজিক্স ক্যুইজ ■ অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ গণিত ক্যুইজ ■ তারকমোহন দাস ও সীমা সেন ॥ লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ ■ দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ভূগোল ক্যুইজ ■ রমানাথ চক্রবর্তী ॥ ইতিহাস ক্যুইজ ॥ প্রতিটি ২০ টাকা

৬টি ক্যুইজ বই একত্রে ■ ক্যুইজ সেট ১০০

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ
কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান
পূজা বার্ষিকী ❑ 1998 প্রকাশিত হয়েছে

প্রকাশিত হল :
মহাভারতের কথা ও কাহিনী
গৌরচাঁদ কাষ্ঠ
কাশীরাম দাসের পয়ারছন্দে অনূদিত
কচ ও দেবযানী, দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা এই কাহিনী দুটিকে মহাভারতের সূত্রস্বরূপ ধরিয়া যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহন পর্যন্ত সমস্ত কাহিনীর প্রাঞ্জল বর্ণনা। দাম ১০০ টাকা
করুণা প্রকাশনী ১৮এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

দিল্লির পত্রিকা "উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস"-এর বার্ষিক বিশেষ সংখ্যা (বিষয় : উন্নয়ন, প্রশাসন ও ভবিষ্যৎ-ভাবনা) দেশের নামী জ্ঞানীগুণী বিশেষজ্ঞদের রচনা-সমৃদ্ধ হয়ে শীঘ্র বেরুচ্ছে। সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি প্রশাসনের ভবিষ্যৎ-ভাবনাবাহী অবশ্য সংগ্রাহ্য এক অমূল্য দলিল। ১৪০ পৃঃ দাম ১৫। এম-১৬৪ গ্রেটর কৈলাশ-II নঃদিঃ-৪৮। মূল সম্পাদক : বিকাশ বিশ্বাস, অতিথি সম্পাদক : বটকৃষ্ণ দে, কার্যাধ্যক্ষ : আদিত্য সেন।

কৌশলগত (Geo-strategic) পরিস্থিতি পালটেছে। অতএব ভারত-বৈরিতা ত্যাগ কর। নতুবা এর ফলাফলের জন্য তোমরা দায়ী হবে। আর এক পারিষদ আবার ক্রীড়াঙ্গনে মল্লযোদ্ধার ভঙ্গিতে তাল ঠুকে বললেন—ভারতের সঙ্গে চতুর্থবার যুদ্ধ করার বাসনা যদি থাকে তো, চলে এসো। আমরা প্রস্তুত। প্রধানমন্ত্রীর বৃহৎ এবং এই মুহূর্তে সুখী পরিবারের সরকারের বাইরে থাকা এক নেতা স্বরগ্রাম আর এক মাত্রা তুলে হুঙ্কার দিলেন—প্রয়োজনে আমরা পাকিস্তানের উপর হাইড্রোজেন বোমা ফেলব। বস্তুত শব্দের হুঙ্কারে একটি ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করা প্রাক-বিস্ফোরণ পর্বেই শুরু হয়েছিল। প্রতিরক্ষামন্ত্রী আকস্মিক চিনের বিরুদ্ধে অভিযোগের অঙ্গুলি তুলে বলতে শুরু করলেন, ভারতের নিরাপত্তার প্রধান শত্রু চিন। চিন ভারতের চতুর্দিকে—তিব্বত থেকে মায়ানমার পর্যন্ত তার আগ্রাসী জাল বিস্তার করে চলেছে। শব্দের হুঙ্কারের মাদকতায় কিছু বেফাঁস উক্তিও এসে পড়েছিল—যথা চিন ইতিমধ্যেই অরুণাচলে একটি হ্যালিপ্যাড তৈরি করে ফেলেছে (পরবর্তীকালে এটি ঠিক নয় বলে তিনি স্বীকার করেছিলেন, যেমন স্বীকার করেছিলেন তিব্বত সীমান্তে চিনের ক্ষেপণাস্ত্র অনেকদিন ধরেই আছে)। প্রাক্-বিস্ফোরণ এবং বিস্ফোরণ-পরবর্তী শাসককুলের এই শব্দের হুঙ্কারের মধ্যে শান্তির ললিতবাণী কোথাও ধ্বনিত হয়নি, যা শোনা গেছে তা কেবল উগ্র জাতীয়তাবাদী ঢক্কানিনাদ। এর পরেও যদি বলতে হয় পারমাণবিক বিস্ফোরণজনিত পরিমণ্ডলে কোথাও উগ্র জাতীয়তাবাদের কোনও প্রকাশ ছিল না এবং বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভারত বিশ্বের কাছে শান্তি ও মৈত্রীর বার্তা পৌঁছে দিয়েছে, তা হলে তা সত্যের অপলাপ হবে না কি?

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতের চতুর্দিকে পারমাণবিক অস্ত্রের বাতাবরণই তাঁকে এই বিস্ফোরণের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। ভারতের বিরুদ্ধে বৈরী ভাবাপন্ন বলে যদি চিন এবং পাকিস্তানকে চিহ্নিত করা হয়—তবে এই দুই দেশের কাছ থেকে নতুন করে ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক এমন কী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যাতে পারমাণবিক বিস্ফোরণ অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল, এমনকী শাসকগোষ্ঠীর ন্যাশনাল এজেন্ডায় প্রতিশ্রুত জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন এবং তৎকর্তৃক প্রতিরক্ষা স্ট্রাটেজি পর্যালোচনান্তে সুচিন্তিত অভিমতের জন্যও অপেক্ষা করা গেল না? [প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে কি দেশবাসী কি বিশ্ববাসীর কাছে আজ পর্যন্ত কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি।] পাকিস্তান ঘাউড়ি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছিল? ভারতও ইতিপূর্বে পৃথ্বী, অগ্নি ইত্যাদি ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ করেছিল। চিনের পাকিস্তানকে পরমাণু-অস্ত্র সংক্রান্ত কর্মসূচিতে সহায়তা দানও নতুন কোনও ঘটনা নয়। বরং ১৯৯৬ সালে জিয়াং জেমিনের ভারত-পাকিস্তান সফরান্তে চিন-ভারত সম্পর্ক যে নতুন মোড় নিয়েছিল তাতে ভবিষ্যতে এই সক্রিয় সহায়তায় ভাটার টানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়, ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে স্বয়ং অটলবিহারী বাজপেয়ী গত ১৮ মার্চ যে ন্যাশনাল এজেন্ডা ফর গভার্নেন্স ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রকাশ করেছিলেন, সেই এজেন্ডার অন্তর্ভুক্ত 'পারমাণবিক বিকল্প' সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির কথা বিস্ফোরণ অন্তে ২৫ মে-র প্রেস সাক্ষাৎকারে সরাসরি অস্বীকার করে মিথ্যাচারের আশ্রয় নিলেন। এর পরে পারমাণবিক বিস্ফোরণ জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এই মুহূর্তে অপরিহার্য ছিল এ কথা বলা চলে কি?

পারমাণবিক অস্ত্রের 'ডেটারেন্ট' অর্থাৎ

ডাক্তার, নার্স, কম্পাউন্ডার, ডি. এম. এস ও মেডিক্যাল ছাত্র-ছাত্রীদের অপরিহার্য গ্রন্থ

ডাঃ মানস ঘোষ **চোখের যত্ন** ৩০

শ্রীমতী মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায়ের **হাউস ওয়াইফ গাইড** ৮০

ডাঃ এ. কে. ঘোষালের

পশুপালন ও পশু চিকিৎসা ৯০ **আধুনিক মৎস্য চাষ পদ্ধতি** ৬০

সহজ পদ্ধতিতে শূকর পালন ৩০ **পোলট্রি বিজ্ঞান** ৫০ **ভেটেরিনারি ফারমাকো থেরাপিউটিক্স** ১৪০

ডাঃ অশোক রায়ের

টেক্সট বুক অব সার্জারী ৬০ **চাইল্ড কেয়ার অ্যান্ড মেডিসিন** ৫০

ডঃ সি. আর. মাইতির **ফুসফুসের রোগ ও প্রতিকার** ৩০

কবিরাজ ডি. কে. রায় **মডার্ণ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা** ৯০

ডাঃ সুবীর ভট্টাচার্য

কেন্টের মেটেরিয়া মেডিকা ১৫০ **হোমিও পারিবারিক চিকিৎসা** ৫০

ডায়াগনোসিস ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ৬০ **আধুনিক মেডিক্যাল ডিক্সনারী** ১৬০

টাকা ও ড্রাফট পাঠাবার একমাত্র ঠিকানা
আদিত্য প্রকাশালয়
২৮/১, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রো, কলিকাতা-৯ ফোন, ৩৫১-৩৭৯৯

পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন
অগ্রিম ব্যতিরেকে বই পাঠানো সম্ভব নহে।

স্টকিস্ট : বি.বি. বুক কনসার্ন
২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ ☎ 2417030

নিবৃত্তি-কৌশলের উপযোগিতা কতটুকু বোঝার চেষ্টা করা যাক। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী আশা করেছিলেন, আমেরিকার চাপে এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার ভয়ে পাকিস্তান হয়তো শেষ পর্যন্ত বিস্ফোরণ থেকে বিরত থাকবে। যে বাজপেয়ী পোখরান বিস্ফোরণ অন্তে স্বরমাত্রা উচ্চগ্রামে তুলে বলেছিলেন এর পরে ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হলে পাকিস্তানকেই উদ্যোগী হতে হবে, সেই বাজপেয়ীকেই পাকিস্তানি জবাবি বিস্ফোরণ এবং তজ্জনিত উভয় দেশের উপর আন্তর্জাতিক চাপের মুখে স্বরগ্রামকে নীচে নামিয়ে বলতে হল, দ্বিপাক্ষিক সমস্যার সমাধানে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যে কোনও জায়গায় আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। জবাবী বিস্ফোরণ ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর এই অবস্থান পরিবর্তনের আর একটি কারণ হল, ইতিমধ্যে কাশ্মীর সমস্যা পুনরায় আন্তর্জাতিকরণের আশংকা বাস্তব হয়ে উঠেছে। ভারত যতদিন তার বিশ্বমৈত্রীবোধ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও গোষ্ঠীনিরপেক্ষ বিদেশনীতির দৌলতে মর্যাদাপূর্ণ নৈতিকতার আসনে অবস্থান করছিল, ততদিন কাশ্মীর সমস্যার আন্তর্জাতিকরণে পাকিস্তানি প্রচেষ্টা সফল হয়নি। সিমলা চুক্তিকেই আন্তর্জাতিক মহল স্বীকার করে নিয়েছিল। আজ যখন বাজপেয়ী সরকারের ভ্রান্তনীতির ফলে ভারত তার মর্যাদাপূর্ণ নৈতিকতার আসন হারিয়ে এক উগ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, তখন পারস্পরিক বিবাদের মীমাংসায় পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় প্রবেশকারী ভারত ও পাকিস্তানের অবস্থান সমপর্যায়ভুক্ত ধরেই রাষ্ট্রসংঘ তথা নিরাপত্তা পরিষদ অগ্রসর হবে, বস্তুত পাকিস্তানি কূটনীতি এখন উঠে-পড়ে লেগেছে নিরাপত্তা পরিষদ তথা রাষ্ট্রসংঘ কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা মেনে নিক।

ভারতের পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ফলে কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানি জঙ্গি নীতি কি এতটুকুও বদলেছে? বরং বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহায়তায় উগ্রপন্থী তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভেবে দেখার মতো বিষয়, কাশ্মীর সীমান্তে (প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখাভিত্তিক) পাকিস্তানি উস্কানি যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, জবাবে ভারত সত্যিই কি পরমাণু বোমার হুমকি দিতে পারবে? যদি দেয়, তা হলে তাকে পাকিস্তানের কাছ থেকেও পাল্টা হুমকি শুনতে হবে। দুটি রাষ্ট্রই অতঃপর সর্বনাশা এক অগ্নিবলয়ের মধ্যে চরম সন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন গুজরান করবে। তাইই কি আমাদের কাম্য?

হিরোসিমা-নাগাসাকির পর কোনও পরমাণু অস্ত্রধর দেশই পরমাণু বোমা প্রয়োগ করার কথা ভাববে না, যক্ষের ভাণ্ডারের মতো পারমাণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডারের দ্বার রুদ্ধ করে পাহারা দিতে হবে। আর এই অস্ত্রাগার পরিচালন ও সংরক্ষণের বিপুল ব্যয়ভার বহন করে চলতে হয়। এক সাম্প্রতিক হিসাবে দেখছি আমেরিকা তার সঞ্চিত দশ হাজার পরমাণু অস্ত্রের সংরক্ষণের জন্য বছরে ২৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। এই অস্ত্রের কেবল একটি ব্যবহারই সম্ভব—কূটনৈতিক অথবা নিছক আর্থিক লাভের স্বার্থে অন্য কোনও রাষ্ট্রকে এই পারমাণবিক অস্ত্রবিদ্যার হস্তান্তর, এ যেন বৃহস্পতিপুত্র কচের দেবলোক থেকে দানবলোকে এসে দানবরাজের কাছে মহাসঞ্জীবনী বিদ্যার পাঠ সমাপনান্তে দেবলোকে প্রস্থানের প্রাক্কালে প্রেমে উপেক্ষিতা রাজকন্যা দেবযানীর বিদায় অভিশাপ—

তুমি শুধু তার (বিদ্যার)
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ;
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

[বিদায়-অভিশাপ—রবীন্দ্রনাথ]

পুজোর আগেই প্রকাশিত হচ্ছে : সর্ব ভারতীয় অনবদ্য প্রেমের গল্প সংকলন

মঙ্গলসূত্র সম্পাদনা ও অনুবাদ : অসিত সরকার ৮০

যে বই না পড়লে বাংলা সাহিত্য - পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যায়

বাংলা সাহিত্যের হারিয়ে যাওয়া অধ্যায়—৩৫ বছর পর প্রথম সংকলিত আত্মপ্রকাশ :

হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন সম্পাদক : সমীর চৌধুরী ১৫০
প্রচ্ছদ : ক্লদ পেল্যু

সমাজের সর্বস্তরে আলোড়ন তোলা অসামান্য সংকলন-গ্রন্থ

(১৯৪৭—১৯৯৭)
লিটল ম্যাগাজিনের শ্রেষ্ঠ গল্প সম্পাদক : সমীর চৌধুরী ১ম খণ্ড : ১৩০
ভূমিকা : পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ২য় খণ্ড : ১৪০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, ঋত্বিক ঘটক, মহাশ্বেতা দেবী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অমিয়ভূষণ মজুমদার, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায় সহ একশো জন প্রবীণ ও নবীন লেখকের অসামান্য ছোটগল্পের সংকলন।

উপন্যাস : বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়—ইতিহাসের দুই পুরুষ ৮০

ছোটগল্প : অসিত সরকার অনুদিত—গর্কির শ্রেষ্ঠ গল্প ৫০
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়—সোনালি ডানার ঈগল ৩০
সমীর চৌধুরী—শববাহক ৪০

কবিতা : শান্তি সিংহ সম্পাদিত—দুই বাংলার দেশপ্রেমের কবিতা ৬৫
শুভ দাশগুপ্ত—বলা খুব মুশকিল ৩০, (ক্যাসেট সহ) ৬০
অমিতেশ মাইতি—ধাত্রীর লেখে জাতক কাহিনী ৪০

ছোটদের বই : শ্রীমধুসূদন—অদ্ভুত কাহিনি আফ্রিকা রজনী ২৫
শৈলেন ঘোষ—গল্পের ভেলকি ২৫

** এখন স্কুল-কলেজের বইও পাওয়া যায় **

কথা ও কাহিনী (বুক সেলার্স) প্রাঃ লিঃ, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩, দূরভাষ : ২৪১ ৯০৭১

অভিজাত প্রকাশনীর

তপন সিংহের
আমার জীবন আমার ছবি - ৬৫
মানব চক্রবর্তীর সভ্যতার রথ - ৮০
বোধিবৃক্ষের ছায়া - ৩৫
শীলভদ্র -এর অবিচ্ছিন্ন-৩৫

৬/১বি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলি-৬৯
২৪৩-০৫৭৯ / ২৪৮-৪৭১৮

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

কবিতা-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি বিখ্যাত কবিতা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তি ত্রিপাঠী প্রমুখ কবি ও সমালোচক।

এ ছা ড়া : কবিতা লেখার নানা দিক নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর লিখেছেন: অমিয় চক্রবর্তী প্রেমেন্দ্র মিত্র বুদ্ধদেব বসু বিষ্ণু দে অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় অরুণকুমার সরকার সিদ্ধেশ্বর সেন শঙ্খ ঘোষ শক্তি চট্টোপাধ্যায় বিনয় মজুমদার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রমুখ ২০ জন কবি।

পরিবর্ধিত প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ। ১৫০ টাকা

প্র থ ম ভা র তী য় ভূ প র্য ট ক
বিমল মুখার্জির

দুচাকায় দুনিয়া

১২ বছর ধরে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটন করেছিলেন বিমল মুখার্জি (১৯০৩-১৯৮৭)। তাঁর সেই দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। বইটিকে বাঙালির জাতীয় সম্পদ বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না।

প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ। ১৫০ টাকা

পাগল করা ছন্দে দম বন্ধ করা ডাকাতের গল্প
হীরু ডাকাত
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত।
২০ টাকা

পাখির খাতা
পাখির ভাষা, পাখির গল্প।
১৮ টাকা

শাদা ঘোড়া
শাদা ঘোড়া, ঋষিকুমার—
দুটি আলাদা বই হিসাবে ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট কর্তৃক ১৫টি ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে।
বাংলায় দুটি কাহিনী একসঙ্গে পাতায় পাতায় দেবব্রত ঘোষের ছবি।
১৫ টাকা

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Calcutta-19
পরিবেশক : দে বুক স্টোর : ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলি-৭৩। পাত্র বুক হাউস : ৯, নবীন পাল লেন, কলি-৯

তা হলে কেন এই সর্বনাশা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে স্বার্থান্ধ রাজনীতিবিদের দল দেশকে সার্বিক ক্ষতির মুখে ঠেলে দিলেন? আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারত আজ প্রায় একঘরে। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে পারস্পরিক উত্তেজনা ও বৈরী ভাব ক্রমবর্ধমান। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চিন-ভারত সম্পর্ক যে নতুন মোড় নিতে চলেছিল, চিনের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক বক্তব্যে আজ তা তিক্ততার তলানিতে এসে ঠেকেছে। সোভিয়েত আমল থেকে ভারতবন্ধু বলে পরিচিত রাশিয়াকেও আজ পরমাণু-বোমা বিস্ফোরণকারী ভারতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রস্তাবে সায় দিতে হয়েছে। এর উপর আছে গোদের উপর বিসফোঁড়ার মতন আমেরিকা-সহ কয়েকটি ধনী দেশের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা। বি জে পি-র 'থিংক ট্যাঙ্কের' প্রবক্তাদের অভিমত ছিল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে আর্থিক সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু লগ্নিকারী বহুজাতিক শিল্পবাণিজ্য সংস্থা সেই সব দেশের পাট গুটিয়ে ভারতে চলে আসবে। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা সে আশা পূরণে যে নিশ্চিত অন্তরায় হয়ে উঠবে তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। মুদ্রাবাজারে টাকার অবমূল্যায়ন ঘটেছে, শেয়ার বাজার অধোগামী। নিষেধাজ্ঞা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় আর্থিক পরিকাঠামোয় এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। বাজপেয়ী সরকার দেশের সাধারণ মানুষকে অভুক্ত রেখেও যদি পারমাণবিক অস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তোলে তা হলেও ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক বিবাদের মীমাংসাই হোক অথবা চিন-ভারত সম্পর্কের উন্নতিবিধানই হোক—পন্থা একটিই—সদিচ্ছাপ্রসূত এবং বাস্তববোধসম্মত পারস্পরিক আলোচনা।

তা হলে শেষ পর্যন্ত পারমাণবিক বিকল্পের সপক্ষে যুক্তির বাকি রইল কি? হারাধনের দশটি ছেলের রইল বাকি একটি—পারমাণবিক-বোমা বিগ্রহ, যা দেখিয়ে এই সরকারের টিকে থাকার প্রচেষ্টা! তবে বোমা-বিগ্রহের আকর্ষণ যে বেশি দিন থাকবে না, বাজপেয়ী সরকার তা ভাল করেই জানেন। তাই তো সঙ্ঘপরিবার পরবর্তী আকর্ষণ নিয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হবার দ্রুত প্রস্তুতি নিচ্ছে—অযোধ্যায় বিতর্কিত মসজিদের ভগ্নসৌধের উপরে রাম-মন্দির নির্মাণ।

সুনীল সেনগুপ্ত
প্রাক্তন অতিথি-অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ইনতিজার হল প্রতীক্ষা, অভিসার নয়

"দেশ" ২ মে, ১৯৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় জ্যোতিভূষণ চাকীর গভীর আন্তরিক রচনায় ("রবীন্দ্র-আত্মার দুইটি বিহঙ্গ: উপনিষদ ও হাফেজ") মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের হাফেজ-প্রীতি এবং শান্তিনিকেতনে ইসলাম-চর্চা বিষয়ে একটি সুন্দর আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। সত্যই এককালে ভারতীয় মনীষীদের অন্তর্জীবনে ফারসি সুফি কাব্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। ব্রিটিশ দরবারে ভারতীয়দের পক্ষে রামমোহনের বিখ্যাত আবেদন হাফেজ-সা'দীর উদ্ধৃতিতে উজ্জ্বল ছিল। আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হাফেজ-প্রীতি তো প্রবাদবাক্যের মতো। সমগ্র "দিওয়ান-ই-হাফেজ" তাঁর মুখস্থ ছিল বলে তাঁকে "হাফেজ-ই-হাফেজ" বলা হত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতিদিন সকালবেলায় উপনিষদ এবং হাফেজ পাঠ করতেন। উপনিষদের প্রধানত বুদ্ধি-নির্ভর ঈশ্বর (intelleciual God বা অন্যভাবে বলা যায় transcendent God) মহর্ষিকে সম্পূর্ণ শান্তি দিতে পারেনি। সুফি কাব্যে যে প্রেমের ঈশ্বর (immanent God)-এর ধারণা বিবৃত রয়েছে সেটিই দেবেন্দ্রনাথকে মূলত ফারসি কাব্য, বিশেষ করে হাফেজ-পাঠে অনুপ্রাণিত

"বইটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ফেলি এবং মুগ্ধ হয়ে যাই। এই মুগ্ধতা এখনও রয়ে গেছে।..." ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্সী কলেজ
প্রশান্ত সান্যালের
চলতে চলতে ১ম পর্ব ৩০.০০
ভূমিকা : অরুণ মিত্র
প্রকাশিত হল চলতে চলতে ২য় পর্ব ৩৫.০০
ভূমিকা : সুভাষ মুখোপাধ্যায়
শতদল ১৭ পরাশর রোড : কলি- ২৯
প্রাপ্তিস্থান : দক্ষিণী দেশপ্রিয় পার্ক

সদ্য প্রকাশিত
অমলকুমার ঘোষের
রবীন্দ্রনাথের অন্য জগৎ :
ছোটগল্পে ও রূপকথামূলক রচনায়
দাম : ২০ টাকা
সুরজিৎ দাশগুপ্তর
দান্তে, গেটে রবীন্দ্রনাথ
২য় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে
ডি. এম. লাইব্রেরী/৪২ বিধান সরণী/কলকাতা-৬

করেছিল। হাফেজের এক বিখ্যাত গজল: "আ.লা ইয়া আইয়োহাস্ সাকী আদির কাসা ওয়া নাবিলহা" (কাজী নজরুল ইসলাম যার বাংলা অনুবাদ করেছিলেন এইভাবে: হ্যাঁ এয় সাকী শারাব ভর লাও, বোলাও পেয়ালি, চালাও হরদম ইত্যাদি), মহর্ষির খুব প্রিয় ছিল। এর অংশবিশেষ: "মরা দর মনজিলে জা নাঁ চে আমন ও ঈশ, চুঁ হরদম/জরস্ ফরিয়াদ মি দারদ কে ধরবনদীদ মহমলহা" দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পবিত্র ঘণ্টায় (devotional bell) উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। সেটি বিশ্বভারতীর সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। ডঃ এম. টি. মুকতাদেরী-কৃত ইংরাজি অনুবাদে এর অর্থ এইরকম দাঁড়ায়: "In my quest of theBeloved, what Peace or Rest can I have, since every time/The caravan bells warn us to be ready to move on."

আরও দুটি কারণে গজলটি বিখ্যাত হয়ে আছে। এক, এই গজলের প্রথম চরণটি কবি এজিদের (কারবালা-যুদ্ধের কুখ্যাত নায়ক এবং হজরত ইমাম হোসেনের মৃত্যুদণ্ডদাতা) কবিতার অন্তর্ভুক্ত। দুই, দেবেন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুশয্যায় এই গজলটিই পাঠ করতে অনুরোধ করেছিলেন। গজলটি শুনতে শুনতেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস অনন্তে বিলীন হয়ে গেল। (তথ্যসূত্রঃ Dr. M. T. Muqtaderi, "Dr Rabindranath Tagor and Iran", H. K. Sherwani Felicitation Volume, Govt. of Andhra Pradesh, 1975, P. 434.)

উল্লিখিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রকাব্যে হাফেজের সুরের অনুরণন বিষয়েও একটি স্পষ্ট ধারণা সৃষ্ট হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীচাকী মহাশয় সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সকলের কৃতজ্ঞতাভাজক হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের হাফেজ প্রীতি বিষয়ে একটি গল্প আছে। তাঁর "পারস্যে" গ্রন্থে এর উল্লেখও আছে। রবীন্দ্রনাথ শিরাজ নগরীতে গেছেন হাফেজের সমাধি পরিদর্শন করতে, সেসময় পারস্যবাসীদের বিশ্বাস ছিল, কারও মনে কোনও প্রশ্ন জাগলে হাফেজের "দিওয়ান" থেকে যে-কোনও পৃষ্ঠা খুললেই তার উত্তর পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন রাখতে অনুরোধ করা হল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, ভারতে কবে সাম্প্রদায়িক হানাহানি বন্ধ হবে। এবার তিনি বন্ধ "দিওয়ান" খুললেন। দেখা গেল সেখানে এই গজলটি লেখা আছে:"ইউসুফ গুম-গশ্তা বাজ আয়েদ ব-কানান গম মা-খোর" (নজরুল এর বাংলা করেছিলেন,—অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পারস্য-ভ্রমণের বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে—"দুঃখ কী ভাই হারানো ইউসুফ কিনানে আবার আসিবে ফিরে" ইত্যাদি)। উপস্থিত বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক পণ্ডিত ব্যক্তিরা চমৎকৃত হলেন। সেদিন হোটেলে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধক্রমে বাদ্যযন্ত্র সহকারে এই গজলটি গেয়ে শোনানো হল, শুনতে শুনতে তাঁর চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। (তথ্যসূত্র: প্রাগুক্ত) রবীন্দ্রনাথের পারস্য ভ্রমণ-সংক্রান্ত চিঠিপত্র এবং তাঁর একটি ইংরাজি প্রবন্ধ "The Renascent Persia"

রবীন্দ্রভবনে Persian File- এ রক্ষিত আছে। রবীন্দ্রভবনের তৎকালীন কিউরেটর ডঃ সনৎ বাগচী মহাশয়ের (তখন জীবিত) অনুমতিক্রমে এই পত্রগুলি বহরমপুর থেকে প্রকাশিত দূরবীক্ষণ পত্রিকায় (অক্টোবর--ডিসেম্বর, ১৯৯১) প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় শ্রীচাকী জিয়াউদ্দীন কৃত রবীন্দ্রকাব্যের উর্দু ও পঞ্জাবি অনুবাদের কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু জিয়াউদ্দীন বিভিন্ন গ্রন্থ (মানসী, সোনার তরী, উৎসর্গ, খেয়া, গীতাঞ্জলি, শিশু, প্রবাহিণী, পূরবী, সঞ্চয়িতা) থেকে একশোটি রবীন্দ্র-কবিতার ফারসি অনুবাদ করতে সাহায্য করেছিলেন এ-বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত ইব্রাহিম খান পুর-দাউদকে। পরে গ্রন্থটি জিয়াউদ্দীনের নামেই "সদ্‌বন্দ্-ই-তাগোর" রূপে (রবীন্দ্রনাথের একশোটি কবিতার সংকলন) আত্মপ্রকাশ করে (১৯৩৫)। এই অনুবাদ প্রচেষ্টায় অনেকগুলি কবিতার ক্ষেত্রে ফারসি কবিতার কিছু কিছু ইমেজ ফুটে উঠেছে,—বিশেষ করে ঈশ্বরকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের "সখা", "বন্ধু", "প্রেমিক" শব্দগুলি, "জানে মন", "আশেক", "দিওয়ানা", "মুরতাজ" ইত্যাদি বিভিন্ন রূপ লাভ করেছে। অনুবাদে ভাষাজনিত কিছু

'History of the Bengal Nagpur Railway working class Movements 1906-1947
—Shyamapada Bhowmik 250.00
খড়্গপুর : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১ম খণ্ড)
—শ্যামাপদ ভৌমিক ৬০.০০
অন্বেষণ : সৃষ্টিতে স্মৃতিতে
—(সম্পাদনা) প্রভাত মিত্র ৮০.০০
জীবনানন্দের কাব্যে আদি রূপকল্প
—তন্ময় চট্টোপাধ্যায় ৮০.০০
উপনিষদে বিপরীতের দ্বন্দ্ব—রাসবিহারী দত্ত ৪০.০০
ছবির পর্দায় দেশের ছবি—শতদ্রু চাকী ৩০.০০
শ্রেষ্ঠ কবিতা—জিয়াদ আলি ৫০.০০
ত্রাম্ভিক প্রকাশনী বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কল-৭৩

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পাদিত
তারাশঙ্কর : দেশ কাল সাহিত্য
জীবনকে দূর থেকে দেখেননি কখনও। জীবনের টানা পোড়েন, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে ধরে রেখেছেন বলিষ্ঠ অথচ মরমী কলমে। তাঁর জীবন ও সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকেরা। প্রখ্যাত সাহিত্য-আলোচকের সযত্ন সম্পাদনায় বইটি হয়ে উঠেছে তারাশঙ্কর-জিজ্ঞাসুদের কাছে অবশ্য সংগ্রহযোগ্য। ১০০ টাকা
উদয়চাঁদ দাস
কবি তারাশঙ্কর ও তারাশঙ্করের 'কবি'
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ লিখেছিলেন, 'বাংলা সাহিত্যের শেষ সার্বভৌম লেখক।' লাল মাটির দেশের মানুষ এবং প্রকৃতি উঠে এসেছে তাঁর বিভিন্ন লেখায়। 'কবি' তার অন্যতম। কবিয়াল তারাশঙ্করের অনন্য সৃষ্টির বিস্তৃত আলোচনা। ৫০ টাকা
পুস্তক বিপণি। ২৭ বেনিয়াটোলা লেন।
কলকাতা-৯ দূরভাষ : ২৪১-৬৯৮৯

পুজোর সেরা উপহার

সেরা সমগ্র
কিশোর ভারতী
১৩৭৫—১৪০৪
২য় সংস্করণ।।
১৫০.০০
"সুমুদ্রিত, সুচিত্রিত, সুসম্পাদিত"—আনন্দবাজার।।
বিপুল আয়োজন, অজস্র রথীমহারথী।।
ভারতী গল্পসম্ভার ৭৫.০০
নোবেলজয়ীর সেরা বারো ৩০.০০
দুরন্ত ঈগল (১৭ মুদ্রণ) ৮০.০০
হিকরি ডিকরি ডক রহস্য ৩৫.০০
পরশে আরোগ্য (রেইকি) ৭৫.০০
পত্র ভারতী ✆ ২৪১ ১১৭৫
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের
আমি রাইকিশোরী ৪০্ বুকের কথা ৫৫্
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের
নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ ৭৫্ অরণ্যদেবী ৩০্
অঞ্জলি প্রকাশনী
ই-৪০, কালাচাঁদ পাড়া, কামডহরি, গড়িয়া, কলি-৮৪ ✆ ৪১০-৪৬৬১

প্রকাশিত হল
কালিদাস চক্রবর্তী
অনূদিত
মেঘদূত
বোর্ডে বাঁধাই। ৩০ টাকা
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন,
কলি-৯

প্রকাশিত হলো
ভাগ্যধর হাজারীর
ছড়ার ছড়া
৭২ টি মজাদার ছড়ার
জনজমাট উৎসব
সঙ্গে রমাপ্রসাদ দত্তের
আঁকা ছবি। দাম ৩০
বিদ্যামন্দির
৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭৩

স্বাভাবিক দুর্বলতাও রয়েছে। যেমন গীতাঞ্জলির বিখ্যাত গান "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার/পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার" ফারসি অনুবাদে দাঁড়িয়েছে: "জানে মন,/দর ইঁ শব-ই তুফানীদর ইনতিজার-ই-তু নাশাসতা আম!" এখানে অভিসার শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে "ইনতিজার"। এটি অবশ্যই মূল ভাব থেকে বহু দূরে। "অভিসার" বলতে রাধার অভিসার বোঝায়: প্রিয়-মিলনের জন্য যে-যাত্রা—এ-ভাবনা একান্তই ভারতীয়। কিন্তু "ইনতিজার" হল প্রতীক্ষা: প্রেমিক বা প্রেমিকার জন্য প্রতীক্ষা। এ-ভাবনাও রবীন্দ্রনাথের গানে বহু স্থানে আছে। এবং এই "ইনতিজার" শব্দটিও কাব্যিক ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। কিন্তু "অভিসার"-এর ব্যঞ্জনা এর মধ্যে আসে না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও "সদ্‌বন্দ্‌-ই-তাগোর" গ্রন্থের সাংস্কৃতিক মূল্য অসীম।এর মধ্যে গীতাঞ্জলির ৩১টি কবিতার ফারসি অনুবাদ সন্নিবেশিত হয়েছে। তার মধ্যে পাঠক ফারসি সুফী কাব্যের নির্যাস লাভ করে ধন্য হবেন। রবীন্দ্রশতবর্ষে সমগ্র গীতাঞ্জলির ফারসি অনুবাদ করেন ডঃ এম. টি. মুকতাদেরী।

মীরজা খানের ফারসি আকর গ্রন্থ "তুহফাতুল হিন্দ" (ভারতবর্ষের উপহার)-এর অংশবিশেষ "গ্রামার অফ ব্রজ ভাখ" মৌলানা জিয়াউদ্দীনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। মীরজা খানের মূল প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক মূল আরও একটি কারণে নির্ধারণ করা যায়: স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্‌ "দ্য মিউজিক্যাল মোড্‌স অফ দ্য হিন্দুজ" এই মূল্যবান প্রবন্ধটি রচনার সময় ওই গ্রন্থের সঙ্গীত অধ্যায় (ভারতীয় ও পারসিক) থেকে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। জিয়াউদ্দীন সমগ্র "তুহফা"র সূচিপত্রটি তাঁর "গ্রামার"-এ সন্নিবেশিত করেছেন। এমন একটি গ্রন্থ আমাদের কাছে উপহার দিয়েও জিয়াউদ্দীন আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

এইসব কারণে শ্রদ্ধেয় জ্যোতিভূষণ চাকীর প্রবন্ধটি অত্যন্ত মূল্যবান। সাংস্কৃতিক সম্প্রীতির প্রসারে বিপুলভাবে সহায়ক।

আবুল হাসনাত

বহরমপুর

অনেকেই যা জানি না তা কি বিশ্বাসযোগ্য

অতুলকৃষ্ণ বিশ্বাস তাঁর পত্রে, ('দেশ', ৪-৪-১৯৮৮) কোহিনুর হীরক সম্পর্কে এক নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি বলেছেন, মহারাজ রঞ্জিত সিংহ পারস্য থেকে হীরকটি উদ্ধার করে আনেন এবং সেটি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে দান করে যান। পরে, জগন্নাথ মন্দিরের ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা হীরকটি ইংরেজ কর্মচারীদের হাতে তুলে দেন। উক্ত দানকর্মের প্রমাণ হিসাবে অতুলবাবু ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের একটি সরকারি দস্তাবেজ থেকে উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসে তো আমরা অন্য কাহিনী পড়েছি। মহারাজা রঞ্জিত সিংহ কস্মিন কালে পারস্য-অভিযান করেছিলেন, তেমন কথা কোনও ঐতিহাসিকই বলেননি। কোহিনুরের মালিকানা প্রসঙ্গে রঞ্জিত সিংহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ভারপ্রাপ্ত তৎকালীন ব্রিটিশ এজেন্ট Captain Claude Wadeকে বলেছিলেন- "''that Shah Suja (আফগানিস্তানের আমির) .was rescued because Kohinoor had been promised as the price''' (Ranjit Singh : N.K. Sinha),. কোহিনুরের হস্তান্তর পঞ্জাবে হয়েছিল, যখন রাজ্যচ্যুত আমির শাহ্‌ সুজা মহারাজা রঞ্জিত সিংহ-এর আশ্রয়ে ছিলেন।

কোহিনুর-এর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত : ''It adorned the crown of the Mughul emperors, but was taken away by Nadir Shah. On his death it passed to Ahmed Shah Abdali from whose descendant, Shah suja it passed to Maharaja Ranjit Singh from whose successor (মহারাজা দলীপ সিং) it was taken by the Indo-British Government which passed it on to Queen Victoria. It now adorns the crown of England.'' ('A Dictionary of Indian History',—Sachchidananda Bhattacharya)। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দলীপ সিং তাঁর রাজ্য সহ কোহিনুর হীরকটি হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। (সূত্রঃ 'History of the Sikhs'—Cunningham),.

অতএব, শ্রীবিশ্বাসের কোহিনুর হিরে সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্যের, যা "আমরা অনেকেই জানি না," বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে।

বিমলেন্দু ঘোষ

কলকাতা-৬০

বহির্বঙ্গে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব -- সংকটের আবহে একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস

উৎসব সংখ্যা সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হবে

দিগঙ্গন

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন ৩, হেইলী রোড, নতুন দিল্লি-১, ফোন ঃ ৩৩২ ৭৪৩১ ফ্যাক্স ঃ ৩৩৫ ৬৩১৫

প্রকাশিত হল :

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস প্রথম ভাগ ১০০ টাকা

বার্ট্রান্ড রাসেল ● ভাষান্তর : শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত/শর্মিষ্ঠা রায়

সভ্যতার ইতিহাসে এক আপন্নসত্ত্ব সময় খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী। ভারতে গৌতম বুদ্ধ, চীনে কনফুসিয়স এবং গ্রীসে থালেস—তিন দিকপাল চিন্তকের জন্মকাল। থালেস থেকে যে গ্রীক দর্শনের পত্তন—যা সময়ের সিঁড়ি বেয়ে ফলে-ফুলে পল্লবিত হয়ে পরিণত হয়েছে আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে। এই মহাগ্রন্থ বিস্তৃত থালেস → আনাক্সাগরস → পার্মেনিদেস → সক্রাতেস → হেলেনায়িত জগৎ → স্টোইকবাদ → নবপ্লাতনবাদ পর্যন্ত। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বিকাশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত চিন্তার ইতিহাস।

বাউলমন প্রকাশন ২৮ বালিগঞ্জ গার্ডেন্স কলিকাতা-১৯ ফোন : ৪৪০-২৭৫২

প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স, বুক ফ্রেন্ড, এন. বি. এ. কথা ও কাহিনী, রাষ্ট্রীয় সাহিত্য মন্দির (নৈহাটি স্টেশন)।

'দেশ' পত্রিকায় আগে কী ছিল

চিঠি লেখার কারণ এই যে, দেশ পত্রিকায় আগে প্রতি সংখ্যায় বিজ্ঞান বলে একটা বিভাগ থাকত এবং ভ্রমণের উপরেও একটা লেখা প্রতি সংখ্যায় প্রায়ই থাকত। কিন্তু কয়েক মাস যাবৎ উক্ত বিভাগগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। এর কারণ কি? এই বিভাগ দুটি কি পত্রিকার মান নামিয়ে দিচ্ছিল, নাকি উন্নতির পক্ষে বাধা সৃষ্টি করছিল? যদি বিশেষভাবে বিজ্ঞান বিভাগটি পুনরায় আরম্ভ করেন, তাহলে আমার মতো অনেক পাঠক উপকৃত হবে। শেষ পৃষ্ঠাটি খুব ভাল লাগে।

বিশ্বজিৎ মণ্ডল
পুরী

বিজ্ঞাপনের ভাষায় 'দেশ'-এর মুখ ঢেকে গেছে

'দেশ'-এর সাম্প্রতিক কিছু লক্ষণ সম্পর্কে এই চিঠি। দেশ-এর পাতায় ''ধারাবাহিক রচনা' নামের নিয়মিত বিভাগটি আপাতত স্থগিত না সম্পূর্ণ বন্ধ? সম্প্রতি 'প্রচ্ছদ নিবন্ধ' নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ না থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ "মমতা ম্যাডাম" নামাঙ্কিত সংখ্যাটি উল্লেখ্য। 'দেশে'র পৃষ্ঠা সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান বলেই কি এই ব্যবস্থা? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ষাট বর্ষ পদার্পণে, সাপ্তাহিক থেকে পাক্ষিকে রূপান্তরের সময় 'দেশ'-এর স্থবিরতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে পাঠকসমাজে। 'দেশ' প্রতিশ্রুতি দেয়, বিষয়বস্তু বিন্যাসে "একই দামে বেশি পাতার দেশ" পরিবেশন করার। তাহলে কী এ ধারণা করা যায়, বয়সের ভারে ন্যুব্জ 'দেশ' তার পরিশ্রম কমাতে চাইছে? বেশি পাতার মেদবহুল 'দেশ' তার মেদ কমাতে ভাষার চমকে 'ব্যায়াম কৌশল' শুরু করেছে! 'ধারাবাহিক রচনা'র পরিবর্তে 'কখন কোথায়' বিভাগটি নিয়মিত করে কী পাঠককে সান্ত্বনা উপহার দেওয়া হয়েছে? এ থেকে এ আশঙ্কা অমূলক হবে না যে, পরবর্তী পর্যায়ে দুটি 'ধারাবাহিক উপন্যাস' ও ছোটগল্পের একটি করে অবলুপ্তি ঘটবে।

'দেশে'র প্রচ্ছদ সবসময়ের জন্য অন্যান্য পত্রিকা থেকে স্বতন্ত্র। যা সংগ্রহযোগ্যও। সম্প্রতি প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে প্রচ্ছদের অঙ্কনশৈলী বিজ্ঞাপন ভাষায় মুখ ঢেকে দেয়।

জন্মশতবর্ষে নজরুল ইসলাম, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিকদের নিয়ে একটি পাতাও 'দেশ' খরচ করেনি। একটি সাহিত্য পত্রিকার এ আচরণে হতাশই হতে হয়।

উদয়চাঁদ দত্ত
মালম্বা, বর্ধমান

প্রবঞ্চনার অনুযোগ অমূলক

আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত মানস রায়চৌধুরীর 'নির্বাচিত কবিতা' ও 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' সম্পর্কিত আলোচনার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। কবির তেষট্টিতম জন্মদিনের প্রাকলগ্নে (২৪ মার্চ, ১৯৯৮) এই আলোচনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। পঞ্চাশের 'নির্জন' কবি জীবৎকালে প্রচারের আলোকবৃত্তের অন্তর্গত ছিলেন না, নিজেও বিশ্বাস করতেন 'আমার কবিতার মূল্যায়ন হয়তো তখন হবে যখন আমি থাকব না'। কিন্তু আলোচনার শেষাংশে শ্রীঘোষদস্তিদার যে 'প্রবঞ্চনা'র অনুযোগ এনেছেন, সে প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকার মধ্যেই উল্লেখ রয়েছে, এ গ্রন্থের পরিকল্পনা গৃহীত হয়, ১৯৯৪-৯৫তে। বিভিন্ন ব্যক্তিগত নৈরাশ্যে দীর্ঘ অসুস্থতার পর ১৬ মে, ১৯৯৬ কবি প্রয়াত হন। তাই এ বইয়ের সঙ্গে জড়িত রয়েছে একটি অন্তিম ইচ্ছার অনুষঙ্গ। আলোচক নিজেই স্বীকার করেছেন উক্ত 'বইটি তুলনায় অনেক বিস্তৃত'। 'নির্বাচিত কবিতা'র সংখ্যা ১১২, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় ১৩৬, এ ছাড়া মুদ্রণ, কাগজ, ছাপা, বাঁধাই-এও তারতম্য যে কোনও পাঠকের সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে। দুটিই প্রখ্যাত পুস্তক প্রকাশনালয়, পাঠক সহজেই দুটির মধ্যে কোনও একটিকে বেছে নিতে পারবেন, শ্রীযুক্ত ঘোষদস্তিদারের 'প্রবঞ্চিত বোধ' করার আশঙ্কা তাই নিতান্ত অমূলক।

সৌভিক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭০০০২৫

প্রকাশিত হ'ল ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র
শারদ সংকলন ॥ ১৪০৫ কালপ্রতিমা ৩০.০০
লিখেছেন : অরবিন্দ পোদ্দার, সত্যপ্রিয় ঘোষ, অশোকমোহন রায়, কৃষ্ণ ধর, তরুণ সান্যাল, সুধেন্দু মল্লিক, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র দত্ত, আলোক সরকার, তারাপদ রায়, কবিরুল ইসলাম, পরিমল চক্রবর্তী, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন চক্রবর্তী, রত্নেশ্বর হাজরা, সন্তোষ চক্রবর্তী, উত্তম দাশ, মঞ্জুভাষ মিত্র, দেবী রায়, অমিতাভ সমাজপতি, রানা চট্টোপাধ্যায়, মতি মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, কালীকৃষ্ণ গুহ, প্রদীপচন্দ্র বসু, দীপক হালদার, অমিতাভ দাশ, দীপক কর এবং আরো অনেকে।
সম্পাদক : নলিনীকুমার চক্রবর্তী বাসুদেব দেব
দপ্তর : পি ৭৯১ ব্লক পি, নিউ আলিপুর, কল· ৫৩ দূরভাষ :৪০০-২৮২০, ৫২১-৫৩৫১

তপন কর সম্পাদিত পূর্ণেন্দু পত্রী : এক বহুমুখী প্রতিভা

'বাঙালির শিল্প-সংসারে পূর্ণেন্দু পত্রীই সম্ভবত শেষ ব্যক্তি যিনি সেই সংসারের গোটা মানচিত্র জুড়ে খেলার স্পর্ধা দেখাতে পারলেন'— আনন্দবাজার পত্রিকা। পূর্ণেন্দু পত্রীকে নিয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুজন ও তাঁর পিতার লেখা জীবনী সহ এক বিপুল গ্রন্থ। ১০টি আর্ট প্লেটে ২৩টি দুর্লভ ছবি সহ দুই শতাধিক পৃষ্ঠার ডবল ডিমাই বোর্ড বাঁধাই বইটির দাম ৮০ টাকা।
পুস্তক বিপণি। ২৭ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা-৯
দূরভাষ : ২৪১-৬৯৮৯

লক্ষ পর্যটকের প্রশংসাধন্য
ভ্রমণসঙ্গী ১৯৯৮
ভারত ভ্রমণের অপরিহার্য গাইড বুক
সমগ্র ভারত ২৫০, ডিলাক্স ২৭৫
উইক এন্ড ট্যুর ৫০

বাঁচার জন্য খাওয়া—আর সেই খাওয়াকে সুস্বাদু মুখরোচক করতে দেশ-বিদেশের
হাজারো রান্নার অমনিবাস
সুব্রতা দে ১০০.০০

সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র
সেই সুন্দরের চাবিকাঠি
রূপচর্চা ৩০.০০
দেবযানী দাশগুপ্ত

বাংলার ঘরে ঘরে অপরিহার্য টোটকা চিকিৎসার
নতুন সংস্করণ
ঘরোয়া চিকিৎসা
৭০.০০

ইংরেজ শাসনে বাজেয়াপ্ত বই
দুই খণ্ডে
প্রতি খণ্ড ২৫০.০০

দুই বাংলার প্রেমের গল্প ও প্রেমের কবিতার নির্বাচিত সঙ্কলন
চিরকালীন ভালবাসা
গল্প ২২৫ ● কবিতা ১২৫

এশিয়া
এ-১৩২ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট
কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন : ২৪১-৪৬০৮/২৩৮৬

ভোরবেলার উপহার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভোরবেলার জানলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে
ঘুম ভাঙিয়ে কাছে ডাকে হাতছানি দিয়ে
তখন অন্ধকারে আলপনা আঁকছে সদ্য-ভূমিষ্ঠ এক বালিকার
আঙুল
আলপনার মধ্যে একটা চিরহরিৎ গাছ
তার প্রত্যেকটি পাতায় এক এক বিন্দু শিশির
একটা বিন্দু এই মাত্র খসে পড়তে পড়তে বলল, এসো
জানলা বলল, এই নাও, তোমার নতুন জন্মের উপহার
কাল রাত্তিরে আমি নরকে ডুবেছিলাম, আবার স্বর্গদর্শন হল।

মা ও আমার গল্প

বিবেকানন্দ মোদক

মা যখন গান গাইত ছাদের কার্নিসে ঝুঁকে এসে
রেলিংয়ে বুকের ভর, ভয় হত হঠাৎ নীচে না পড়ে যায়!
জার্কন পাথরদাগে তখন আকাশ লাল-হলুদ মায়ায়
গানজলে ভিজে সাদা করে দিত টবের টিউবরোজটিকে।
নিঃসাড় নিঃসঙ্গ খুলে ডর্মারউইন্ডোর দুই স্তন
শুনি অপলক ভয়ে, গান ওই আকাশের মুখে মুখে মার।
লেমেনের মতো ওই মেয়ে যেন আমাদের কেউ নয় আর—
মনে হত, তারও নাই কেউ, সেও আকাশেরই একান্ত স্বজন।

মা জানত খেলার রঙিন কাজ কত কিছু, কাঁথাস্টিচ্, উল
ভাবতাম মনে মনে, মার মতো হব ভবিষ্যতে।

অনতীতবাল্য আমি বাড়িনি এখনও তাই বাঁচার মাসুল
দিতে হয় আগুনকে বা মেঘভরা আগুনের স্রোতে।
পিঠের আকাশডানা নিয়ে বাঁচা ভাষাচিহ্নে, মেঘে নেই ঘর।
কি কষ্টের এ অবস্থা বুঝবে না নিজের না হলে কোনওজন।
আতসবাজির মতো মুখ থুবড়ানো, গানে আকাশেই মায়ের
কবর
মায়ের এতটা গল্প গাইতে গাইতে কাটালাম অর্ধেক জীবন।

দুটি কবিতা

শ্রীজাত

শর্তলিপি

যদি না দেখে রাখি পুরনো কৌশলে ফেরার পথ
যদি না মনে থাকে জলের নিচুদিকে ছুটির দিন
যদি না হাতে আসে তুলোর কথা ভরা সহজ গান
যদি না ভেবে নিই সুযোগসন্ধানী প্রেমের ছল
যদি না ছুঁয়ে দেখি গাছের বিদ্যুৎ, পায়ের ছাপ
যদি না ছেড়ে দিই বন্দি-রাজহাঁস, মুঠোর গম
যদি না চোখে পাই নিজের বাড়িঘর, তোমার গ্রাম...

তাহলে আমি আর মাটিকে মাটি ব'লে মানবো না

দেবদূত

দেবদূত ব'লে ঘেন্না কোরো না। আমরাও
একদিনে এই ছন্দ শিখিনি। তবে আজ
ভালমতো জানি, তাইতো এসেছি তোমাদের
দুয়ারে দুয়ারে, যত চাই আজি উৎসব...
তাইতো এসেছি সামান্য দু'টো ভাঙচুর
ক'রে দিয়ে যাবো, (তেমনই থাকবে দিনকাল)
শুধু তোমাদের খাপছাড়া ফাঁকা দরজায়
ঘনিয়ে উঠবে উড়োঝড়, উড়োঝঞ্ঝায়
দিকদিগন্তে অন্ধেরা হবে উজ্জ্বল...
বিশ্বাস নেই ? এখনো ঘেন্না ? তবে যাঃ !
দেখে আয় সব ছোট দিন, সব বড়দিন
আর মনমরা খোকা-খুকুদের আঙিনায়
দাঁড়া দু'দণ্ড, সামনে তাকিয়ে দেখে নে—
সাইকেল ক'রে মাঠে উড়ে যায় দেবদূত !

এই একটা দুপুর

জয় গোস্বামী

এই একটা দুপুর আমি ঘুমোইনি জেগে উঠিনি মরে যাইনি
বেঁচে থাকিনি এই একটা দুপুর...
এই দুপুরের সঙ্গে যুক্ত হল অনন্তকাল, চিরসময় ঢুকে এলো
জানালা দিয়ে, আমি
জানতাম না যে আমার হাত আমার এই কেঠো রোগা হাত
একটা বীণাযন্ত্র
কনুই থেকে মধ্যমা পর্যন্ত পুরো হাতটা তুমি ধরে রইলে
যেভাবে সেতার ধরে গুণী আর
তাকিয়ে রইলে যেন কী একটা আশ্চর্য জিনিস এই হাত, তুমি
মধ্যমার চূড়া থেকে
ঠোঁট ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে নামলে, মীড়ে ঘসিৎ-এ চমকে চমকে
উঠছে কোমল তীব্র সব পর্দা,
আমার হাতের পাতায় তুমি আবিষ্কার করেছ একটা লালশিরা
কী আশ্চর্য সেটা নাকি কাঁপে আমি জানতাম না
এই দুপুরের আগে আমি জল-স্থল-অন্তরীক্ষ জানতাম না এই
একটা দুপুর
আমি জেগে উঠলাম না ঘুমোলাম না মরে গেলাম না বেঁচে
রইলাম না কেবল
পাখি বসলো আমার মুখে মাটি ধসে পড়লো দিক পরিবর্তন
করলো নদীপথ আর
গাছ মানুষ চালাঘর ও চারণরত পশু সমেত পাহাড় থেকে
শিলাখণ্ডের মতো
ভূমিকম্পে খসে পড়লো গ্রাম
তারপর থেকে আমার বাড়ির জায়গায় একটা পার্বত্য জলধারা
আমি ডুবে মরিনি, ভেসে উঠিনি, উড়ে যাইনি
এই একটা
দুপুর আমি স্রোতের বেশি কেউ নই, আমাকে আঁজলায় ভ'রে
তুললে আমি উঠে যাই আর
তোমার মুখে ঝাপটা দেবার বেশি কোনও কাজ আমি
পারি না তোমার স্নান করবার
সময় হল, তুমি জলের নীচে মাথা ডুবিয়ে দমবন্ধ করে খুঁজে
পেলে আমার চোখ
ঠোঁট চেপে ধরলে বন্ধ চোখের ওপর আমি
দেখতে পেলাম আমার
নেকড়ের জীবন কাঁকড়াবিছের জীবন ময়ালসাপের জীবন,
বনে বনে নরহত্যা করে
বেড়ানোর আর বল্মীকের স্তূপের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে
থাকবার জীবন আমার
ভেসে উঠলো, ডুবে গেল অন্ধকার চূড়ায়
তোমার বৃন্ত দুটিকে
ঠোঁটে ধরবার অঙ্গীকার করেছিলাম একদিন আর তা পালন
করতেই
এতগুলো যুগ পেরিয়ে আজ এসে পড়লাম এই দুপুরে
এখন কেউ আসবে না এখানে শুধু আমার বুক ঘষে ঘষে
তোমার মাথা চলে আসবে আমার কোলে
আমরা পরস্পরকে খুঁজে বার করবো আবার তোমার
ওষ্ঠচাপের মধ্যে ধৃত এই দুপুরের প্রাণ এই দুপুর এক
প্রকাণ্ড নিথর জলাশয়, এর নীচে
আমরা শুয়ে থাকব আমরা ঘুমোব না জেগে উঠব না
মরে যাব না জন্ম নেব না একবারও
কেননা এই জলাশয়ের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে কাল—কেননা
আমরা এখন ভালবাসছি

শব্দমালা

দীপ্তেন্দু ঘোষ

শিঞ্জিত ঝরনার মতো নাচে হাহাকার
নাচে হাহাকার দেখ নদীর শরীরে
নদীর শরীরে জমে আমার নিশ্বাস
আমার নিশ্বাস নামে কান্নার আড়ালে

কান্নার শেষের কথা অদ্ভুত শোনায়,
স্তব্ধতার কোলাহল এতই জলজ !
স্পর্শের অতীত মায়া মানবিক বড় ।

সমস্ত না জানারও অন্তরাল আছে
আছে মায়া, আছে শোক গুপ্ত পথরেখা—
আড়াল পেরিয়ে যায় চোখের সন্ধান
তারপর সন্ধ্যা নামে বিজাতীয় পথে—

দূরদেশে মৃত্যুপাশ তখন আমার
খেলা করে চারপাশে । শালিকের শব্দ
আর আঁজলার জলে ভরে যায় বুক ;
শব্দমালা কী আমার শেষদিন দ্যাখে !

আমার শেষ ঘুম কখন আসবে

শম্ভু রক্ষিত

বন্দরে নিষ্ঠুর জল, রাত্রিশেষের একটা গর্বিত জাহাজ
পেশাদার নক্ষত্রগুলো নিবছে, জ্বলছে
পাগল হাওয়া আমার কঙ্কালকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে
যন্ত্রণার জমাট তুষারে
আমার পায়ের নীচে হাজার-আত্মার দীর্ঘনিঃশ্বাস
বুকের মধ্যে আকুল ক্ষমা প্রার্থনা
ওদিকে কুয়াশাচ্ছন্ন ঘরের দ্বীপের মতো ক্ষুদ্র এক আকাশ
আর ক্ষয়কাশ রুগির স্বপ্নের মতো
ক্ষীণ অন্ধকার ছড়িয়ে রয়েছে ওই দূর দিগন্ত পাহাড়ে
এখন আমার অসংখ্য মুহূর্ত পড়ে আছে, এখন আমার
বুকের পাথর কে সরাবে এই শূন্যের শ্মশানে।

এখন আমার গলার নলিটা দপ্‌দপ্‌ করে ঝাঁকি খেয়ে দুলে
উঠছে
দাঁতের পাটি সিরসির করে কেঁপে উঠছে
আমার চিবুক বেয়ে দরদর করে ঘাম নামছে এখন
হাজার হাজার ঘামের স্রোত আমার সারা দেহে
কর্কশ ও বর্ণহীন শুধু অস্থিসার কঙ্কালের মতো আমি পড়ে
আছি

কুষ্ঠরোগীর মতো নিঃশব্দে মৃত্যুর কাল গুনছি
গুনছি জীবনের পরমায়ু
আমি জেটির স্টিমারের হুইসেলের আওয়াজ শুনছি
যন্ত্রদানবদের উদ্দেশে পুরোহিতের মন্ত্রপাঠের মতো
যেন এক বিচিত্র অসাড়তা অথচ ভয়াবহ অমোঘ নির্মমতায়
আমার অস্তিত্বকে কারা কুরে কুরে খাচ্ছে
আমার এখন অসংখ্য মুহূর্ত পড়ে আছে, এখন আমার বুকের
পাথর
কে সরাবে ওই স্রোতের বিস্তারে—
শুধু কাল গুনব, কাল গুনব, কাল গুনব—
যেমন করে পুরনো বুড়ো বটগাছ কাল গোনে নিষ্কলুষ
চাতকের মতো
যেমন করে বালিয়াড়ি পথের নিঃশব্দে অপেক্ষা করে
দিগদিগন্তে ছড়ানো আকাশ
হাজার হাজার হৃদয়হীনের বিবরে ফিরে যাওয়া অবলা
প্রাণীদের কাতর আর্তনাদের জন্যে
আমি বসে থাকব সেই জলের প্রতীক্ষায়
সেই জলের আশায় অলৌকিক ভূমিকম্পের মতো আমার
রক্ত
কাঁপছে
আমি আর কয়েক মিনিট মাত্র বেঁচে আছি
এখন আমার অসংখ্য মুহূর্ত পড়ে আছে, এখন আমার
বুকের আগুন কে কালোপিচের ফ্রেমে সরাবে।

এখন নিঃসঙ্গ সমুদ্র— ঘণ্টাফটকের মতো জোড়াতালি দিয়ে
ধুঁকছে, ধুঁকছে—
তার ওপরে নীল আকাশের স্তব্ধ আচ্ছন্নে গোলা নদী, নিস্পন্দ
নিথর!
আমি এই ক্লান্ত, শ্রান্ত, তপ্ত খাঁচার ভেতর গুম হয়ে বসে
আছি
যেন সাঁই সাঁই করে হাপর চলছে আমার বুকের মাঝখানে
বাতাসের প্রহার যেন অসংখ্য বেত চালাচ্ছে আমার পিঠের
ওপর
যেন সব শেষ হয়ে গেছে
এই সমুদ্র আকাশ
জলজ্যান্ত তরঙ্গের স্থির অনুভূতি
যাকে ভাসিয়ে নেবে আকাশ পাতালের প্রবল হাহাকার আর
বন্যা
অথবা বাংলার ডামাডোলের মৃত্তিকায়
প্রশান্ত মহাসাগরের সেই অশ্বমেধ ঘোড়ার ছটফটানো কঙ্কাল
যার ওপর দিনের পর দিন আছড়ে পড়বে
শঠতা, প্রবঞ্চনা, জালিয়াতি, মিথ্যার বেসাতি
আর সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের সেই দারুণ প্রচণ্ড বিস্ফোরণ
আমার এখন বিষণ্ণ বিষাক্ত মুহূর্ত পড়ে আছে, আমার
শেষ ঘুম কখন আসবে
এই শূন্যের শ্মশানে।

তেঘরিয়া

এ ক রা ম আ লি

এই জমি নানা আকারের
চ্যাপ্টা লম্বা সরু চারকোনা
খোঁচা-মারা কোণ কোনোটার

বোরো ধান পেকে নুয়ে আছে
কাস্তের খিদের তলদেশে
রোদে-পোড়া নীলচে কুমড়ো
অপুষ্ট শিশুর মস্ত মাথা
মাটিতে গড়ায়। তারপর
মাইল মাইল শূন্য খেত—
ফাটা-ফাটা— খণ্ড হয়ে আছে
স্বপ্নে তিলে গণ্ডায় ছটাকে

যত দূর ছড়ানো প্রান্তর
তত দূর অঙ্কের প্রকাশ
এই সব অঙ্ক মৃত্যুহীন
প্রেতাত্মার চোখে জ্বলে-নেভে

সম্পূর্ণ নেভে না। আর শ্রম
পেশি আর রক্ত আর হাড়
কোদাল আর কোদালের কোপ
আকাশের গা ঘেঁষে থেমেছে

সেইখানে প্লেনের উদয়
আচমকা— সগর্জন— একা—
তারপর নীল ঘেঁটেঘুঁটে
ধীরে ধীরে নীলে মিশে যাওয়া

নীচে শুধু জমি আর জমি
নীচে শুধু চিন্তার শ্মশান

নেমে গেছে ঢাল। নামছে সে
শেষ ধাপে একটি কাঁদর
সরু আর বাঁকা তার জল
ভিজে পায়ে আবার উঠেছে
জল থেকে ঢেউ থেকে বালি
বালি থেকে আলেকজান্দ্রিয়া

প্রাসাদ সড়ক গ্রন্থাগার
প্রেম খুন চাপা প্রতিহিংসা
জ্যামিতির বিন্দু থেকে রক্ত
ফোঁটা-ফোঁটা ঝরে, সেই রক্তে
অবাধ্য কুটিল রেখা-সহ

জেগে ওঠে জ্যামিতির প্রেত—
ধানের ছুঁচলো নাড়া বিঁধে
শেয়ালের আত্মসংবরণ

হে পগার, বেঢপ পগার
পগারের ঢালু কিনারায়
পোকার মৃত্যুর মতো একা
এই গর্ত— আমার খোলস

শোনো, আমি এইখানে আছি
কথারা উড়ছে চারপাশে
শোনো, আমি বলতে চাইছি
আকাশের নিম্নতা বিষয়ে

পৌরাণিক

অ চ্যু ত ম ণ্ড ল

দ্যাখো ভিজে গেছি খুব, এই বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে স্রোতে
ডুবে যাচ্ছে ধানচারা—এই ধান এত কষ্টে বুনি—
ভেঙে যাচ্ছি, ভেসে যাচ্ছি—খুলে যাচ্ছে পরতে পরতে
রাতের অস্থির পর্দা, হাওয়া হাঁকছে, 'আরুণি আরুণি'।

মনে পড়ছে ওম আর ভাতের অস্ফুট গন্ধ মেখে
কে যেন এসেছে কাছে। কারা তবু সুখে নিদ্রা যায়;
কে শোনে বৃষ্টির শব্দ, কেউ কাঁদে ; যে লেখে—সে লেখে
মুমূর্ষু পাখির কান্না রাতের অন্তিম পাহারায়

এ কোন গুরুর বাক্যে কালরাত্রি জেগে বসে আছি—
কোদালে বর্ণের মাটি, বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে বারবার...
জলে ভিজে আসে চোখ, এ কোন করুণ কানামাছি
কেন যে, কিসের জন্যে আলপথে এসেছি আবার!

শুধু কি শস্যের জন্যে আল বাঁধে শব্দের চাষীরা?
যে স্রোত ভিতরে বইছে আল তারই ব্যক্তিগত শিরা!

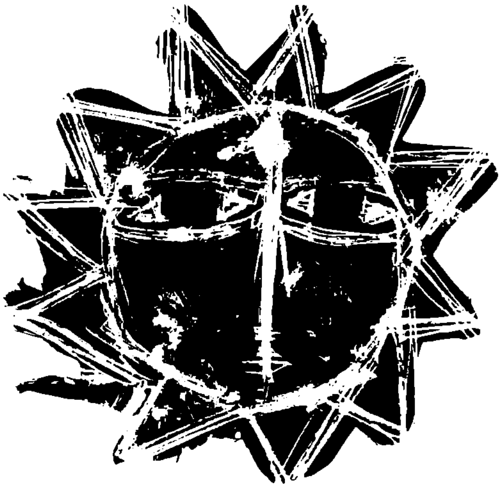

পরিভ্রমণ

অ নু রা ধা ম হা পা ত্র

তুমি কেন বার বার ডায়েরি লেখো মুক্তির?
তার চেয়ে হিন্দু কলেজের সিঁড়িতে বসে আছে
যে নির্জন প্রাচীন কাক
সূর্যালোক, অনন্ত সমুদ্রে তাকে দেখেছে কি?
কেবলই জটিল খাঁড়ির ভাষায়
লেখা হয় ছিন্নমস্তার মতো লেখা
ফ্রিয়ল দ্বীপ থেকে একদিন ভেসে পড়া ভূমধ্যসাগরে,
মানবেন্দ্রনাথ রায় অথবা রাঁচীর অরণ্য;
একদা বিপ্লবীর মাথায় প্রজাতিনিঃশেষ কোনও
পাখির পালক আর মুণ্ডিত মাথার আকাশ।
তুমি তবে চলে যাবে 'শান্ত সেবা ওল্ড হোমে'?
পাঁচ বছর ধর্মঘটী শ্রমিকের পিঠে বাঁধা পোস্টারের
ফুটো দিয়ে দেখা যায় প্রসবকাতর যেই
ফুটপাতের বিড়াল, তার শিহরিত লেজ
তার চেয়ে শিহরিত ট্রাম;
যাকে তুমি যৌবনের শুরু বলো, সংস্কৃত মন্ত্রের শেষ
পাগল যেভাবে জল ভালোবাসে, জলক্লেশ।
তুমি কেন লেখো এই ডায়েরি, লেখকের ভ্রান্তির দোষে?
ওই যে পাগলপ্রেমিক, ওই যে কবিতার প্রুফ,
ওই যে উচ্ছেদবিরোধী মিছিল,
ওই যে প্রাচীন কাক, ক্যানিং লোকাল,
গভীর হাঁপানি নিয়ে প্রাক্তন খেলোয়াড়,
সিঁড়ি দিয়ে ওঠে গ্যালারিতে;
এইসব দেখে যাও শুধু— লেখা নয়, দেখা।
চাঁদ ও আকাশের বিষণ্ণ হাস্যময় ফুটবল খেলা,
মাঝে মাঝে সেফেরিস, কমলকুমার,
মধুসূদন সমাধির পাশে ছেঁড়া জামা কাঁধে নিয়ে
বোবা ভাই, খুকুটির নেচে নেচে তীব্র করতালি।

শেষ বর্ষণ

বি শ্ব দে ব মু খো পা ধ্যা য়

এখনও বিস্মৃত হই নাই বঙ্গসন তেরশ চল্লিশ।
সময় আষাঢ় মাস, সন্ধ্যা কাল, সবিশেষ রবীন্দ্রনাথ
তদবধি সশরীরে। পুবের জানলা খুলে আকাশের
আনন্দধারাকে
দু হাতে আবাহন করছেন অবিশ্রাম কালস্রোতে ভেসে
কাগজের নৌকা যায়, ছইয়ের ভিতরে জড়সড়
হিঙুলে পুতুলগুলি ছোট ছোট মাটির কলস
অন্ধকারে স্তূপাকার হাঁড়িকুড়ি ভরা-মাঝ-গাঙে
এপারে কুমোরটুলি ওপারে অনন্ত জোড়াসাঁকো।

তখনও ভূমিষ্ঠ হই নাই। এই ঘর। অন্য ঘরে ডুমের আলোয়
চৌকির একপাশে পিতৃদেব, পিতৃব্য, কারা সব আত্মীয়স্বজন...
অধিক দেখি না আধো অন্ধকার ঝাপসা হয়ে আসে
এখনও আষাঢ় মাস। বৃষ্টি হয়। তথাপি বর্ষণ
মনে পড়ে শেষবার, সন্ধ্যাকাল, তেরশ চল্লিশ বঙ্গসন।

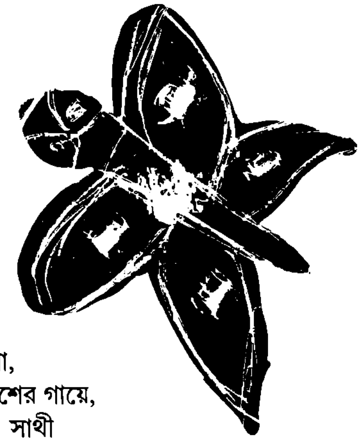

বাপের বাড়ি

অ দি তি ঘো ষ

বাইরে মাটির মুখে আলো,
উপরে দীঘল ছায়া আকাশের গায়ে,
জানলার এপাশে খেলার সাথী
দিনমানে খড়ি দিয়ে
গাদিকোর্ট চলেছে দাগিয়ে
রোদ্দুর, আহ্লাদে ঘুরঘুর
প্রজাপতি বাবার বাগানে,
শিকড়ের খুশি মেঠো ঘ্রাণে
ঘুম ভেঙে ওপাশে এক কোণে
একা খালি হয়ে আছে মার খাট
একমাথা সিঁদুর রজনীগন্ধায়
খালি করে চলে যাওয়া রাত
দুপুরবেলার ঝগড়া নেই
ঘরপালানো কাঁচা আম, পোড়া আম—
ঘুম ভেঙে ঝড় দেখে একলা আঁধারে
আজও ভয় ধরে, বাবা কি এখনও জেগে আছে
বাইরে মাটির সুখ, বাইরে মাটির মুখে আলো

কবিজন্ম
সাম্যব্রত জোয়ারদার

জন্মজন্মান্তর ধরে নদীজন্ম সার্থক লিখন,
গতজন্মে ফকির ছিলাম আরও কত যুগ বাতাস এগোয়
লোকালয়ে ঘোরে আর সৌধ সমাধির পরে কত জন্মে সন্ধ্যা
নেমে যায়
ফের সূর্যপ্রণামের আলো বিগত জন্মের শেষে এক মুঠি ঘাসে
এসে পড়ে
যেনবা শিশির ধরে তোমাকে পাঠায় কত সকালবেলার পাখি
তরণী ভাসায় দিকে দিকে,
জন্মজন্মান্তর ধরে ধূলিজন্ম সার্থক লিখন সব দুপায়ে লুটোয়...
দরবেশ সাধক ফেরে নদীর বাংলায় কত ভক্তকুল গৃহস্থ
মন্দিরে
সোনার খাঁচার টানে বৃথাজন্ম ফেলে রাখে মদনগঞ্জের ঘাটে
নৌকো এসে ভেড়ে.
বীজের ভিতরে বীজ জন্ম নেয় শস্য আর অগ্নিভুক পতঙ্গের
মুখে
শোনায় ফকিরি গান কর্ষিত মাটির নীচে পুরুষ প্রকৃতি
রাখে ধাতু,
আসমান দরিয়ায় মেশে অকূল কিনারা রাতি দূর থেকে
সংকেত পাঠায়

জন্মজন্মান্তর ধরে কবিজন্ম সার্থক লিখন সব জলে ভেসে
যায়...

বৃক্ষ
হিন্দোল ভট্টাচার্য

দেহাতী গাছের ডালে উড়ে আসে পাখিটির গান।
গাছের স্থাপত্য যেন নির্জনতালোভী; অতি দূরে
নর-নারী ছুটে যায়; তাদের গভীর কিছু প্রাণ
মিশে যায় আঁধারের কাছে—যেন বহুযুগ জুড়ে
ধীরে ধীরে রঙিন সেজেছে, গাঢ় মেঘ কাছে টেনে,
আরও কাছে, ভুলের আড়ালে, পাখির গানের মতো
হে শরীর, তাকিয়েছো তুমি, জেনেছো সফল ক্ষত—
এ এক অলীক আনাগোনা পৃথিবীর গোপন বাগানে

কোন্ বীজ জন্ম দেয়, কোন্ বীজে জল এসে থামে
এ খবর জানা নেই বলে এসো অকারণ বুঝি
কাহিনীর নীচে চিনে নাও তুমি শান্ত এক, ধীর
পরবর্তী মরা মাছ উঠে আসে গাণিতিক ভ্রমে
তার জন্যে বসে থাকি, এসো আজ একা তাকে খুঁজি
যে প্রকৃতি পূর্ণ চাঁদ, যে প্রকৃতি জলের গভীর....

তুমি হও
চন্দ্রিল ভট্টাচার্য

তুমি তবে হয়ে পড়ো আড়ষ্ট জিবের মতো নীল
আমি তবে ছোঁক ছোঁক কুকুরের বন্ধুতাবিলাসী
ফুঁসে ওঠো অহরহ সর্দিময় ফুসফুসের প্রায়
বাড়িটি চকমিলানো হাড়গোড়ে চত্বরে সভায়
শেষবেশ পড়ে থাকে কলাপাতাটাতা আর কপালে সন্দেশওলা
ছেলে

দাড়ি আছে গালের আড়ালে, বেঁটে চিবুকের আবডালে স্নেহ
এই ভাড়াগেহ, সেই ভারতীয় জলট্যাঙ্ক, পাশে তুমি হও
সমাসীন

ক্ষীণ হয়ে পড়ো দিকি বইচাপা পোকাটির মতো
নাছোড় ব্রণর ধাতে লেপে যাও গালে কঙ্কালে
চুলে থাক খসাচুন সিমেন্টেও ছড়ে যাক পিঠ
পাহাড়িয়া জোঁক হও শালীনতা চুষে ফুলে ঢোল
লবণে মরণ যার, আত্মাটি বিকোবে বলে রোজ
রবীন্দ্রনাথ মাপে, শোক যাপে, সাবান মাখায়
পাঁচিলে নিতম্ব রেখে লৌকিকতা মারে শনিবারে
শিশির লাগায় চোখে, বাথরুম ধীরেসুস্থে সারে।
চট করে হও সেই বাথরুমে বৌনি করা মেয়ে
মশলাবাটির লোভে অঝোর বালিকা হও তুমি
গলায় গামছা দিয়ে টেনে নাও ফ্যাকাশে প্রতিভা
ভিটভিটে সায়াহ্নে বুনোর চোয়ালভরা দাগ
পিঠের জমিনে নাও, অবিভক্ত দেহে মোরে পালো
বারো হাত চুম্বনে আড়ষ্ট করে ফেলো জিভ
বিষে নীল জিভে তুমি ছুঁচ মেরে, ভাঙা কাঁচ গিথে
চলে যাও রাতেভিতে আমি হব প্রকোষ্ঠমাফিক
যেখানে মাটিতে স্তূত নিখিলের ম্যাপ, ভাঙা তড়িৎসরঞ্জাম
পাশে

কোনায় মাদুরখড়, খড়খড়ে বিষ্ঠার বাতাসে
আটবার ডেকে ডেকে তক্ষক থামে কী আরামে
ঘুলঘুলিতে ঘট হয়ে বসে থাকি, কাঁকালে কনুই

গলি বেয়ে চলে যাও, আগে যায় স্তূপীকৃত বুক
তোর চুমুদাগ ক্রমে আমার নিকষ নাভি, আমার মুখের বায়ু
জ'মে তোর স্তূপীকৃত বুক।

নৌকায় তরুণী

অর্ণব সাহা

শিকড় হারাচ্ছি, কিন্তু যথাসাধ্য নৌকায় তরুণী
গলুইয়ে নিশ্চিত বৈঠা হাতে রাখছে....অন্যপিঠে আমি
ঘূর্ণাবর্তে অসহায়...আঁকড়ে ধরি সমস্ত অর্চনা !
—সকালে বেরিয়ে রাত্রে গোটা রাজ্য জয় করে ফিরি...

ক্যাম্পাস, খেলায় ধূর্ত ছেলেমেয়েরা এ.সি. ক্যান্টিনের
নৈতিকতা শিখে নিয়ে জল মেশায় আড্ডার ভিতরে ;
—এখনও বিড়ির ছাঁদে বাঁধা হয় ব্যর্থ নিকোটিন ;
যুবতী অর্জন করে টেবিলে টেবিলে তাঁবেদার....

আধঘন্টা আগেই ঢুকি ফ্যাকাল্টির লাগোয়া চত্বরে...
সুনসান লবিতে প্রায় কেউই নেই....বস্তির বাচ্চারা
অন্যমনে বল পেটায়, হল্লা করে ভুয়ো পার্টিজান ;
—ভয় হয়, কালকের মতো ভুল স্টপেজে নেমে পড়লে না
তো ?

দিনান্তে পৃথিবী ঘুরছে....আটটা পঁচিশের আগে-পরে
নির্ভুল বাড়িতে ফেরা—কলমে দু'পঙক্তি আচমন ;
জীবন গণ্ডূষমাত্র, তবুও নেপথ্যে ধ'রে রাখি
ওপড়ানো শিকড়ে যার আজন্মের স্বত্ব লেখা—নৌকায়
তরুণী...

অঙ্কন : সুব্রত চৌধুরী

স্বগত ভাষণ

তৃষ্ণা ভট্টাচার্য

১

বিশ্বাসের চক্র ভেঙে ঢুকে পড়ে অচেনা সময়
এতদিন ডাক ছিল, ফেরা ছিল নিজের আলোতে
এতদিন বিপর্যয়ে ছিল তার নির্বসন ছুটি
এখন লাইটমিটার বলে দেয় উইকেট গোটাও

এটা কোনও মৃত্যু নয়, সে তো হবে পরের বয়সে
আপাতত কথা হচ্ছে আস্তিনে পায়রা লুকিয়ে
কিছু একটা লাগবেই, অরুময়ও সেদিন বলছিল
সেসব মাথায় রেখে আপাতত চলে যেতে হবে।

দুদ্দাড় পালিয়ে যাই, ঘর থেকে, রান্নাঘর থেকে
চাবি ঝোলে দেরাজের, সারা রাত জ্বালা থাকে আলো
ছাদের কার্নিস ভেঙে, নিমগাছ আমূল মুড়িয়ে
একবেলার জন্যেও ওর ভাত ঢেকে বেরোতে পারি না?

২

তোকে কাব্য লিখে দেব, তোকে কাব্য লিখে দেব ঠিক
কি এমন হাতিঘোড়া, যদিও সামান্য পদাতিক
বেসিক পাঁচশ ষাট, যেদিকে তাকাও বাঁশঝাড়
বারবার ফস্কে গেছে মরালীর ঈর্ষণীয় ঘাড়
তোকে কাব্য লিখে দেব, তার আগে বার কর জিভ
চাট্ আঙুলের ক্ষত, এইখানে ঢুকে গেছে নিব
দেখা তোর নাড়িভুঁড়ি, দেখা তোর ঈশ্বরপ্রতিম
শব্দরূপ, ধাতুরূপ, দেখা তোর পূর্ব ও পশ্চিম
দেখব, দেখিয়ে দেব, ফুলে এসে বসবে সরস্বতী
তোকে কাব্য লিখে দেব, পাই যদি স্বামীর সম্মতি।

অগ্নিরথ

সমরেশ মজুমদার

৩৩

ভানুপ্রসাদ কখনও কলকাতায় যায়নি। দার্জিলিং মেলের থ্রিটিয়ারে বসে সে একটু উদাস হয়েই প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়েছিল। নামেই নিউ জলপাইগুড়ি কিন্তু শিলিগুড়ি শহরটা এই স্টেশনকে চারপাশ থেকে চেপে রয়েছে। আর শিলিগুড়ি মানে জেলা দার্জিলিং। শিলিগুড়িতে এসে পাহাড়ের মানুষের কোনও অসুবিধা হয় না। দু'পা হাঁটলেই একজন স্বজাতিকে দেখা যায়।

ট্রেনে চাপলেই অদ্ভুত উত্তেজনা হয় সায়নের। বিশেষ করে রাতের ট্রেনে। হু হু করে ট্রেন ছুটছে অন্ধকার চিরে, মাঝে মাঝে হুইসল বাজছে, জানলার বাইরে চোখ রেখে যখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না তখন ইচ্ছেমতো কল্পনা করে নাও। যা খুশি। সেই কল্পনাটাই উত্তেজনা বাড়ায়।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল, মন কেমন করছে!'

ভানুপ্রসাদ হাসল, 'নাঃ। আমি ডাকতার সাহেবের কথা ভাবছিলাম। সত্যি সত্যি যদি উনি নিরাময় বন্ধ করে চলে যান তাহলে তো তুমি আর ওখানে ফিরে যাবে না। আচ্ছা, কলকাতা তো শুনেছি খুব বড় শহর, ওখানে তোমার চিকিৎসা হয় না কেন?'

'হবে না কেন? কত লোকের হচ্ছে। কিন্তু পাহাড়ের আবহাওয়ায় ডাক্তার আঙ্কেলের কাছে থেকে আমার বেশি উপকার হয়েছে। কিন্তু যা ভয় পাচ্ছ তা ঠিক না। ডাক্তার আঙ্কল নিরাময় বন্ধ করে চলে যাবেন না।' সায়ন খুব আস্থা নিয়ে কথাগুলো বলল।

ওদের উল্টোদিকে একটি পরিবার বসেছিল। তারা যে মন দিয়ে কথা শুনছে তা বুঝতে পারেনি সায়ন। পরিবারের যিনি কর্তা তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কী টি বি হয়েছিল ভাই?'

'টি বি?' হকচকিয়ে গেল সায়ন।

'পাহাড়ে আর সমুদ্রের ধারে লোকে টি বি সারাতে যায়। কী বন্ধ হয়ে গেলে আর ফিরে যাবে না বলল, তোমার অসুখ কি সারেনি?' শেয়ালের মতো মুখের গঠন, ভদ্রলোকের চোখে সন্দেহ।

সায়ন বলল, 'আপনি ভুল করছেন, আমার টি বি হয়নি।'

'অ। তা বোম্বে-টোম্বে গিয়েছিলে নাকি এই বয়সে? কী এমন রোগ যা কলকাতায় না সারিয়ে পাহাড়ে গিয়েছ চিকিৎসার জন্যে?

'বোম্বে গেলে কী রোগ হয়?'

'ওই যে কাগজে পড়েছি, সোনার দোকানে কাজ করতে গিয়ে বাঙালি ছেলেরা মৃত্যুরোগ নিয়ে ফিরে আসছে।'

'অদ্ভুত!' সায়ন জানলার দিকে তাকাতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। ভানুপ্রসাদ বাংলা বোঝে তবে শক্ত শব্দ না। মৃত্যুরোগ বুঝতে না পেরে সে নেপালিতে সায়নকে মানে জিজ্ঞাসা করল। এই কয় মাসে নেপালি ভাষার অনেকটাই আয়ত্তে এসে গিয়েছিল সায়নের। সে অর্থ এবং ইঙ্গিত বুঝিয়ে বলতেই ভানুপ্রসাদ হাসতে লাগল। তাই দেখে কর্তা তাঁর পরিবারের সদস্যদের চাপা গলায় নির্দেশ দিলেন।

ট্রেনটা ভালই চলছিল। টয়লেটে যাওয়ার সময় সায়নের চোখে পড়েছিল অনেক বার্থ ফাঁকা। অথচ টিকিটঘরে গিয়ে টিকিট চাইলেই বলা হয় রিজার্ভেশন ফুল, ওয়েটিং-এ নাম লেখাতে হবে। যদি ট্রেনে জায়গা থাকে তাহলে কি ইচ্ছে করে ওসব বলে? কি লাভ?

ঘণ্টাখানেক যাওয়ার পর একটা ছোট স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই হই হই করে কয়েকটা ছেলে উঠে এল। উঠেই টয়লেটগুলোয় দখল নিয়ে নিল ওরা। একজন চেঁচিয়ে বলল, 'দাদারা দিদিরা দয়া করে আধঘণ্টা আপনাদের সবকিছু চেপে রাখুন। আধঘণ্টা পরে টয়লেটে গিয়ে খালাস করবেন।' একেবারে যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে পেটি উঠতে লাগল। দশ মিনিটের মধ্যে সেগুলো চোখের আড়ালে চলে গেল। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে ইতিমধ্যে। এবার ছেলেগুলো মাঝখানের প্যাসেজে এসে দাঁড়াল। প্রত্যেকের হাতে এক একটা প্যাকেট। একজন সায়নদের কাছে এসে তাকাল। তারপর উল্টোদিকের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন দাদু?'

'বর্ধমান।'

'বাঃ। আপনার সিটের নীচে এটা রাখছি। বর্ধমান পর্যন্ত এটা আপনার সম্পত্তি। কেউ জিজ্ঞাসা করলে সে কথাই বলবেন।' প্যাকেটটা

ভদ্রলোকের দুপায়ের ফাঁক দিয়ে নীচে ঢুকিয়ে দিল ছেলেটা।

'কি আছে এতে?' ভদ্রলোক রেগে গেলেন।

'যাই থাক, আমরা দুটো পয়সা পাব যদি আপনি সঙ্গে নিয়ে যান। গরিব বেকার ছেলে, বুঝতেই পারছেন।'

'কিন্তু যেটা আমার নয় সেটা আমি—।'

'যা বললাম তাই করবেন। ঝামেলা করতে চাইলে বিপদে পড়বেন। দিদিমা, একটু বুঝিয়ে দিন দাদুকে।' ছেলেটি সরে গেল।

সায়ন দেখল কম্পার্টমেন্টের কেউ কিছু বলছে না। হঠাৎ আশ্চর্যরকমের শান্ত হয়ে গেছে ভেতরের পরিবেশ। ট্রেনের ছুটন্ত চাকার আওয়াজ ছাড়া কোনও শব্দ নেই। নীরবতাই যেন বর্ম হয়ে গেছে যাত্রীদের।

এইসময় ওদের নেতা চিৎকার করল, ' আরে! সবাই বোবা হয়ে হয়ে গেলেন নাকি? কথা বলুন, বি নর্মাল। এতক্ষণ যেরকম গল্প করছিলেন তাই করুন।' বলতে বলতে সে এগিয়ে এল সায়নদের কাছে। ভানুপ্রসাদকে দেখে নেপালিতে জিজ্ঞাসা করল কোথায় যাচ্ছে সে। ভানুপ্রসাদ জবাব দিতেই জানতে চাইল কলকাতায় চাকরি করে কি না! ভানুপ্রসাদ মাথা নেড়ে না বলে জানাল তার চাকরি নেই, বেকার।

ছেলেটা সিগারেট ধরাল। তারপর প্যাকেটটা ভানুপ্রসাদের সামনে ধরল। ভানুপ্রসাদ মাথা নাড়ল, সে সিগারেট খাবে না।

ছেলেটা বলল, 'আগে চারমিনার খেতাম, এখন উইলস খাই। যখন বেকার ছিলাম তখন কেউ চাকরি দেয়নি। শেষপর্যন্ত বাঁচার জন্যে আমরা এই লাইনে এলাম। এসে দেখলাম সব শালা চোর।' ছেলেটা হাসল।

সায়ন চুপচাপ শুনল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কী করছেন?'

'কিছু না। আমরা ক্যারিয়ার। স্মাগলারদের মাল ক্যারি করে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছি। তার জন্যে ভাল টাকা পাই।' ছেলেটা তাকাল, 'তুমি বোধহয় ট্রেনে যাওয়া-আসা করো না। যারা করে তারা জানে, জিজ্ঞাসা করে না।'

'কিন্তু এটা তো অন্যায়, বেআইনি ব্যাপার।'

'হ্যাঁ শালা, কে ন্যায় করছে বে?' হঠাৎ ক্ষেপে গেল ছেলেটা, 'কোন হারামি আইনের পথে চলছে? এই যে মালগুলো ট্রেনে তুললাম স্টেশনের পুলিশকে পাঁচশো খাওয়াতে হল। ট্রেন থামলে দেখবে পুলিশের সার্চ পার্টি মাল চাইবে। মালদাতে আসবে আবার একদল । রেলের স্টাফদের মাল দিতে হচ্ছে। এরা সবাই সরকারি স্টাফ, জনগণের দেওয়া ট্যাক্স থেকে মাইনে পায়। মাইনে পেয়ে ছোঁক ছোঁক করে ঘুষ খাওয়ার জন্যে। এদের কাছে গিয়ে অন্যায় বেআইনি শব্দগুলো বলছ না কেন?'

'তাই যদি হয়, চোখের সামনে না রেখে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ জন্মায়, তাই না। কয়েকজন জেনুইন অফিসার আছে এ লাইনে। গোটা চারেক। তারা উঠলে লাইফ হেল করে ছাড়ে। তাই তাদের ভয়ে লুকোতে হয়। অবশ্য লুকোবার জায়গা ওরা জানে। কিন্তু দামি জিনিসগুলো আমরা প্যাসেঞ্জারদের হাতে ধরিয়ে দিই। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে বাপ-দাদুর জমানো টাকা আছে। বেকার হয়ে আমাদের মতো না খেয়ে মর, তাহলে জ্বালা বুঝবে চাঁদু।'

বুড়ো কর্তা ফ্যাসফ্যাসে গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আমার সিটের তলায় যেটা রেখে গেল সেটায় কি আছে?

ছেলেটা চোখ বড় করল, 'কিছু নেই। দেখুন দাদু, আমরা আপনাদের সঙ্গে একবারও খারাপ ব্যবহার করিনি। করেছি? তাহলে খারাপ ব্যবহার করতে বাধ্য করবেন না। শালা দেশের প্রধানমন্ত্রী চুরি করছে, মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে মাল বানাচ্ছে, পার্টির দাদারা ভিখিরি থেকে রাজা হয়ে গেল তার বেলায় দোষ নেই। আরে ভাই, ইন্ডিয়া একটা ভিখিরি দেশের নাম। কিস্যু দেওয়ার ক্ষমতা নেই এই দেশের। ভবিষ্যৎ যেখানে অন্ধকার তখন যে যেমন পারে লুটে নিলে কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারবে।'

ট্রেনের গতি কমে আসতেই ছেলেটা সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর চিৎকার করে বলল, 'পার্টনার নাম্বার টু, একশো টাকার নোট দিবি। বেশি ঝামেলা করলে আর একটা। তার বেশি নয়।'

ট্রেন থামল। জায়গাটা বিহার। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিকে। এর মধ্যে দরজায় শব্দ হল। বেশ জোরে জোরে। ছেলেটা চেঁচাল, 'কেউ দরজা খুলবেন না। যা করার আমরাই করব। পার্টনার টু—!'

সায়ন শুনল বাইরে থেকে ধমক দেওয়া হচ্ছে দরজা খুলে দেওয়ার জন্যে। সে উঠে এগিয়ে গেল দেখতে। কম্পার্টমেন্টের অন্য যাত্রীদের চেহারা এখন পুতুলের মতো। বাতিল পুতুল।

সায়ন দেখল আর একটি ছেলে দরজার জানলা খুলে কথা বলার চেষ্টা করছে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, 'পার্টনার সর্বনাশ। পাণ্ডে হারামিটা দাঁড়িয়ে আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে দৌড়োনো শুরু হয়ে গেল। উল্টোদিকের দরজা খুলে দুদ্দাড় করে নেমে গেল সবাই। যাওয়ার আগে শাসিয়ে গেল কেউ যেন পুলিশের কাছে মুখ না খোলে।

দরজা প্রায় ভেঙে ফেলার জোগাড়। একজন ভদ্রমহিলা উঠে দরজাটা খুলে দিতেই তাতার দস্যুদের মতো পুলিশ বাহিনী ঢুকে পড়ল কম্পার্টমেন্টে। ওদের সামনে যে অফিসারটা রিভলবার উঁচিয়ে প্রথমে উঠল সে হিন্দিতে চিৎকার করল, 'এতক্ষণ দরজা খোলেননি কেন? জবাব দিন?'

কেউ জবাব দিল না। লোকটা গালাগাল দিল, 'সবকটা হিজড়ে। কারও সাহস নেই প্রতিবাদ করার। খুঁজে দ্যাখ।'

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বাহিনী সক্রিয় হল। পুরো কম্পার্টমেন্ট খুঁজে এসে তারা জানাল আসামিরা পালিয়েছে।'

'পালিয়ে কোথায় যাবে। এই ট্রেনেই উঠেছে। মাল সার্চ করো।'

পুলিশরা আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল। যাত্রীদের স্যুটকেস, ব্যাগ নিয়ে টানাটানি করতে লাগল। এই সময় সেই ভদ্রমহিলা, যিনি দরজা খুলে দিয়েছিলেন, পুলিশ অফিসারের সামনে গিয়ে বললেন, 'আপনারা কী অন্ধ না অন্ধ সেজে থাকতে পছন্দ করেন এটা আমি বুঝতে পারছি না।'

'কী বলতে চাইছেন?'

'যেসব জিনিসের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন সেগুলো কোথায় আছে তা আপনারা জানেন না? নিরীহ মানুষদের মালপত্র নিয়ে টানাটানি করছেন?'

'কোথায় আছে?'

'আশ্চর্য। আপনি জেনেশুনেও ন্যাকামো করলে আমার কিছু বলার নেই।'

'আপনি আমার সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলতে পারেন না।'

'আপনারা যা করছেন তাতে অন্য কোনও ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

'ঠিক আছে, আপনি আমাকে হেল্প করুন। কোথায় লুকিয়েছে মালগুলো?'

ঠিক সে-সময় একজন সেপাই বলল, 'টয়লেটগুলো খুলতে হবে স্যার। সাধারণত ওখানেই ওরা লুকিয়ে রাখে।'

অফিসারের নির্দেশে টয়লেটগুলোর সম্ভাব্য লুকোনো জায়গা দেখা হল। পুলিশ কিছুই পেল না।

নেমে যাওয়ার আগে অফিসার মহিলার সামনে এলেন, 'আমরা খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না। আপনি হেল্প করলে পাওয়া যেত।'

'ওরা মালপত্র নিয়ে টয়লেটে ঢুকেছিল।'

'আচ্ছা। ট্রেনের নিচে সার্চ করো।' চিৎকার করে উঠলেন অফিসার। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন চলতে শুরু করল। যেভাবে ওরা উঠেছিল সেভাবেই নেমে গেল পুলিশগুলো। সম্ভবত ওদের ডিউটি এই স্টেশনেই সীমাবদ্ধ।

ট্রেন চলছে। দেখা গেল ওপাশের দরজায় শব্দ হচ্ছে। সায়ন দেখল চলন্ত ট্রেনের দরজার বাইরে থেকে সেই ছেলেটির গলা ভেসে আসছে। ছুটন্ত ট্রেনে যখন ওরা ঝুলে আছে তখন নিশ্চয়ই অন্য কম্পার্টমেন্টে ওঠেনি। এই সময় একটি বাদামওয়ালা দরজা খুলে দিল। পরপর ঢুকল ছেলেগুলো। ওদের চেহারা দেখে আঁতকে উঠল সায়ন। ঝড়ে বিধ্বস্ত গাছেরাও এদের থেকে বিন্যস্ত থাকে। কম্পার্টমেন্টে ঢুকেই ওরা দৌড়ে গেল টয়লেটে। নিজেদের মধ্যে চিৎকার করে বলাবলি করতে লাগল মালগুলো ঠিক আছে। পুলিশ খুঁজে পায়নি। ওদের মুখেচোখে একটু স্বস্তি ফিরে এল।

যে ছেলেটি নেতা সে পুরো করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'আপনাদের কাছে যেসব জিনিস আমরা জমা রেখেছিলাম সেগুলো ঠিক না থাকলে বলুন। পুলিশ কী কারও কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছে?'

কেউ জবাব দিল না। ছেলেটি বলল, 'তাহলে ধরে নিচ্ছি মালগুলো ঠিক আছে। আমরা যে স্টেশনে এই ট্রেনে উঠেছি সেই স্টেশনে এই কম্পার্টমেন্টের টি টি নেমে অন্য জায়গায় উঠেছে। সামনের স্টেশনে সে আবার ফিরে আসবে। মনে রাখবেন ওই লোকটা ডিউটিতে থাকার সময় কানে শুনতে পায় না। অতএব ওকে কিছু বললে, আপনাদের কোনও লাভ হবে না। আমি এবার দিদিমণির সঙ্গে কথা বলব।'

ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সেই মহিলার সামনে যিনি খুব উত্তেজিত হয়েছিলেন পুলিশের সামনে। সায়ন ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতেই অন্য ছেলেগুলোর একটা ধমকে উঠল, 'অ্যাই? কোথায় যাচ্ছ?'

'দেখব।' সায়ন স্পষ্ট জবাব দিল।

'আর দেখতে হবে না। বেশি দেখতে চাইলে বাবার বিয়ে দেখিয়ে দেব। শালা যেন সিনেমা দেখতে যাচ্ছে।' ছেলেটা হাত তুলল।

'তুমি এর চেয়ে ভালভাবে কথা বলতে পার না?' সায়ন জিজ্ঞাসা করল। ওর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে ছেলেটা হাত নামাল। মুখ ফিরিয়ে নিল। সায়ন দেখল ভানুপ্রসাদ তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। নেতা তখন ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করছে, 'আমি উঠেই বলেছি আমরা বেকার ছেলে। বেঁচে থাকার জন্যে রোজগারে নেমেছি। আমরা না করলে অনাহারে মরতাম, কিন্তু অন্য কেউ করত। সেটা আপনার ভাল লাগেনি। আপনি পুলিশের কাছে চুকলি কেটেছেন।'

'কে বলল চুকলি কেটেছি?' ভদ্রমহিলা খুব ঘাবড়ে গেলেন। আপনার জন্য পাণ্ডে পরের স্টেশনে খবর পাঠাবে ট্রেনের তলা সার্চ করতে। এর জন্যে আপনাকে শাস্তি পেতে হবে।'

'তার মানে?'

'এই কম্পার্টমেন্টের কেউ পুলিশের সঙ্গে কথা বলেনি। একমাত্র আপনিই বারেবারে বলেছেন। আপনার কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ টয়লেট সার্চ করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে আপানার সঙ্গে কথা বলে ওরা উত্তেজিত হয়েছিল কিন্তু মাল বের করার সময় পায়নি। এই মাল ধরা পড়লে মালিক আমাদের কাছে ক্ষতিপূরণ আদায় করে। সেক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা কী হয় ভাবতে পারেন? আপনাকে আমি জানলা দিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। কী শাস্তি চান?'

ভদ্রমহিলা দু হাতে মুখ ঢাকলেন। তাঁর শরীর কাঁপছিল।

'আপনি উঠুন। আমরা কেউ আপনার শরীরে হাত দেব না। আপনি নিজের শাড়ি জামা খুলুন।' ছেলেটি গম্ভীর মুখে বলল।

'না!' ভদ্রমহিলা চিৎকার করে উঠলেন।

'হ্যাঁ। আমরা আপনার গায়ে হাত দিতে চাই না। খুলুন।'

'আমি খুলব না।' ডুকরে কেঁদে উঠলেন ভদ্রমহিলা।

'তাহলে কথা রাখতে পারছি না। আমরা হাত বাড়ালে আপনি আরও বেইজ্জত হবেন। এই কম্পার্টমেন্টের কোনও ভেড়ুয়া আপনাকে বাঁচাতে আসবে না। বড্ড তেল হয়েছে আপনার।' খপ করে হাত ধরল ছেলেটি। ধরে এক ঝটকায় দাঁড় করিয়ে দিল।

সায়ন খুব ধীরে সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'ছেড়ে দাও।'

'অ্যাই! মাস্তানি মারাবি না। ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব।'

'তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু ওঁকে ছেড়ে দাও।'

ছেলেটি কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। হাত সরিয়ে নিয়ে অদ্ভুত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাক দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে কেন?'

সায়ন হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নাকের নিচটা মুছতেই সেখানে রক্ত লেগে গেল। ভানুপ্রসাদ ছুটে এল। সায়নকে বলল, 'তুমি শোবে চল। আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছ তুমি।'

ওরা কেউ কিছু বলল না। ভানুপ্রসাদ সায়নকে ওদের বার্থে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল। রক্ত বের হচ্ছে বিন্দু বিন্দু। সায়ন তার ওষুধের ব্যাগটা বের করতে বলল নিচু গলায়। সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে তার। ওষুধগুলো থেকে বিশেষ ক্যাপসুলটা দেখিয়ে দিতেই ভানুপ্রসাদ সেটা খাইয়ে দিল।

ছেলেগুলো ওদিকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল টয়লেটের নিচ থেকে তাদের মালগুলো তুলে যাত্রীদের সিটের নীচে রাখতে। নেতা এসে দাঁড়াল সামনে, 'ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে কেন?'

ভানুপ্রসাদ তাকাল, 'ওর অসুখ আছে। লিউকোমিয়া।'

'মাই গড।' ছেলেটা চমকে উঠল। কয়ের মুহূর্ত চুপচাপ থেকে বলল, 'ডাক্তার দরকার? দাঁড়াও।' সে চিৎকার করল, 'এই কম্পার্টমেন্টে কেউ ডাক্তার আছেন? প্লিজ উঠে আসুন।'

কেউ এলেন না। সায়ন হাত নাড়ল, দরকার নেই।

ট্রেনটা পরের স্টেশনে থামতেই কয়েকজন পুলিশ উঠে এলেন কামরায়। সঙ্গে টি টি। পুলিশ অফিসার বলবেন, 'কী যে করো তোমরা। আমার ওপর অর্ডার এসেছে টয়লেটের নিচটা দেখতে। ওখানে চোরাই মাল আছে থাকলে নিয়ে যেতে আমি বাধ্য।'

নেতা বলল, 'খুঁজে দেখুন।'

ওরা খুঁজল। কিছু পেল না। নেতা বলল, 'পাননি এটা জানিয়ে দেবেন।' সে দুটো একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিল।

'আরও তিনটে দাও।' অফিসার বললেন।

ছেলেটি আর একটা যোগ করল। কোনও কথা বলল না।

অফিসার তিনটে নোট নিয়ে নিঃশব্দে নেমে গেলেন। ওঁরা নেমে গেলে টি টি লিস্ট বের করলেন। নেতা তাঁর পকেটে আর একটা একশো টাকা ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'একজন ডাক্তার দরকার।'

'কেউ উন্ডেড হয়েছে?'

'না। নেমে গিয়ে জানিয়ে দিন মালদায় ফোন করে দিতে।'

'টিকিট চেক করতে হবে যে।'

'যা বলছি তাই করুন।'

টি টি নেমে গেলেন। ছেলেটি ঘুরে দাড়িয়ে বলল, 'পার্টনাররা, তোমরা কোনও প্যাসেঞ্জারকে বিরক্ত করো না। সবাই দুদিকের দরজার সামনে চলে যাও।' ট্রেন ছাড়ল।

সায়ন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভানুপ্রসাদ তার মাথার পাশে বসেছিল।

উল্টো দিকের বেঞ্চিতে বসা পরিবার অদ্ভুত চোখে সায়নকে দেখছে। ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী অসুখের নাম বলল?'

'লিউকোমিয়া।' বৃদ্ধ জবাব দিলেন।

'খুব খারাপ রোগ? ছোঁয়াচে?'

'বুঝতে পারছি না। শুনেছি এক ধরনের ক্যান্সার।'

'তাহলে বাঁচবে না। তোমার ছোটকাকা তো ক্যান্সারে মরেছেন।'

'চুপ করো। কার মুখ দেখে এবার বেরিয়েছিলাম!'

ট্রেন চলছে। রাত এখন প্রায় দশটা। যাত্রীরা যে যার খাবার প্রায় নিঃশব্দে খেয়ে নিয়েছে। ভানুপ্রসাদ কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। সে লক্ষ রাখছিল, রক্ত বের হচ্ছে না অনেকক্ষণ আগে থেকে। হঠাৎ সে দেখতে পেল সেই ভদ্রমহিলা পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভানুপ্রসাদ কী করবে বুঝতে না পেরে হাসল।

'কেমন আছেন উনি?' ভদ্রমহিলা নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

ভানুপ্রসাদ ভাঙা বাংলায় বলল, 'ঘুম দিচ্ছে।'

'আমি একটু বসতে পারি?'

ভানুপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। ভদ্রমহিলা সায়নের মাথার পাশে বসলেন। ঝুঁকে ওর নাক দেখলেন। ভানুপ্রসাদ দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, 'ঘুম দিলে ঠিক হো যায়েগা।'

'কী হয়েছে ওঁর?' ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন।

ওপাশের কর্তা জবাব দিলেন, 'লিউকোমিয়া, ডেঞ্জারাস ডিজিজ। বেশিদিন বাঁচে না। ইনফেকসাস কিনা জানি না।' বৃদ্ধ বললেন।

ভদ্রমহিলা চাপা গলায় ফোঁস করে উঠলেন, 'আপনি কি শিক্ষিত?'

ভদ্রলোকের মুখ দুমড়ে গেল। অন্য দিকে তাকালেন।

ভদ্রমহিলা ভানুপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরকম কী প্রায়ই হয়? এইভাবে রক্ত বেরিয়ে আসে?'

ভানুপ্রসাদ একটু চিন্তা করল। সায়নের দৈনন্দিন সমস্যার কথা সে জানে না। কিন্তু কিছুদিন ধরেই তো ওকে সুস্থ দেখছে সে। তাই বলল, 'নেহি। ডেইলি হয় না।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আপনি আপনার বার্থে শুয়ে পড়ুন। আমি ওঁর পাশে আছি।'

যে মহিলাকে বাঁচাতে গিয়ে সায়ন অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাঁর এই ব্যবহারে খুশি হল ভানুপ্রসাদ। কিন্তু তার খিদে পেয়ে গিয়েছিল। নিরাময় থেকে নিয়ে আসা খাবারের প্যাকেট ব্যাগে রয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা বের করে খেতে অস্বস্তি লাগল তার। সে দ্বিতীয় বাঙ্ক টেনে চেন লাগিয়ে উঠে পড়ল। ভদ্রমহিলা একটু কুঁজো হয়ে নীচে বসে রইলেন।

মালদা স্টেশনে ট্রেন থামার পর নেতা একজন ডাক্তারকে নিয়ে ওদের সামনে এলেন। ডাক্তার ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি ঠিক জানি না। তবে শুনলাম ইনি লিউকোমিয়া পেশেন্ট। ব্লিড করছিল। অনেকক্ষণ ঘুমোচ্ছেন।'

'এখন রক্ত পড়ছে?'

'না।'

'তাহলে ঘুমোক।এসব পেশেন্ট আমার আওতার বাইরে। আন্দাজে ওষুধ দেওয়া ঠিক হবে না। ঘুমই বেস্ট মেডিসিন।' ডাক্তার চলে গেলেন।

নেতা ছেলেটি গেল না। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল। ভদ্রমহিলা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কিছু বলবেন?'

মাথা নাড়ল ছেলেটা। তারপর চলে গেল।

সারা রাত ধরে যে স্টেশনেই ট্রেন থেমেছে সেই স্টেশনে হয় রেলের লোক নয় পুলিশ এসে হাত পেতেছে আর ছেলেগুলো টাকা দিয়ে গিয়েছে। যাত্রীদের মধ্যে যারা অত্যন্ত ঘুমকাতুরে তারা ছাড়া সবাই তটস্থ হয়ে সেসব দৃশ্য দেখেছে।

বোলপুর স্টেশনে যখন ট্রেন ঢুকল তখন ভোর হচ্ছে। ভদ্রমহিলা কুঁজো হয়ে বসে হেলান দিয়েছিলেন। তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ অস্বস্তি হতেই তাকালেন। দেখলেন, সায়ন উঠে বসার চেষ্টা করছে। কিন্তু মাথার ওপর মধ্যের বাঙ্কটা থাকায় সে সোজা হতে পারছে না।

ভদ্রমহিলা দ্রুত বললেন, 'উঠবেন না ভাই, শুয়ে থাকুন।'

'কেন?' সায়নের ব্যাপারটা দুর্বোধ্য লাগল।

'আপনি অসুস্থ।'

সায়ন এবার মাঝখানের জায়গাটায় সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'না, আমি এখন ঠিক আছি। আপনি এখানে?'

'আমার জন্যে আপনি অসুস্থ হয়েছিলেন।'

'আপনার জন্যে হইনি। আমি অসুস্থতা সঙ্গে নিয়ে বেঁচে আছি। কিন্তু ওরা কোথায়? ওরা আপনার কোনও ক্ষতি করেনি তো?'

'না। আপনার মুখে রক্ত দেখে ওরা অদ্ভুতভাবে পাল্টে গেল। নইলে তখন আমার যে কী হত ভাবলেই শরীর হিম হয়ে যাচ্ছে।'

'অদ্ভুত তো।' কথাটা বলে সায়ন ভানুপ্রসাদের দিকে তাকাল। সে তখন আরামে ঘুমাচ্ছে। গতরাতে খাওয়া হয়নি, এখন খিদে পাচ্ছে। সে ভানুপ্রসাদকে ডাকতেই সাড়া পেল।

সায়ন জিজ্ঞাসা করল নেপালিতে, 'কাল রাত্রে খেয়েছিলে?'

ভানুপ্রসাদ হাসল, 'আমরা কেউই খাইনি। উনিও না।' জবাবটা নেপালিতেই দিল সে।

এই সময় প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো হকার দুটো চায়ের ভাঁড় জানলায় রেখে আর একটা আনতে আনতে বলল, 'দিদিমণি, চা নিন। গরম গরম চা। খেলে প্রাণ জুড়িয়ে যাবে।'

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনটে চায়ের দাম কত?'

হকার জিভ বের করল, 'দাম বললে দাদা আমার জিভ উপড়ে দেবে। আপনারা খেয়ে নিন দিদি।'

'তোমার দাদাটি কে?'

ছেলেটি তিনটে চায়ের ভাঁড় জানলার ওপরে রেখে সরে গেল উত্তর না দিয়ে। সায়ন বলল, 'আমি চা খাই না।'

'আমি খাই কিন্তু এই চা খেতে পারব না।'

'কেন?'

'আমার মনে হচ্ছে কাল রাত্রে যে ছেলেটি আমাকে অপমান করেছিল সে-ই এই হকারের দাদা।' ভদ্রমহিলা বললেন।

সায়ন হাত বাড়িয়ে একটা ভাঁড় ভানুপ্রসাদকে দিতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। চলন্ত ট্রেনের ঝাঁকুনিতে জানলায় রাখা ভাঁড় থেকে চা চলকে পড়ল। ভদ্রমহিলা সেই ভাঁড় দুটো জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

ভদ্রমহিলা গজগজ করলেন, 'একে বলে জুতো মেরে গরু দান। যাক গে, আপনার শরীর এখন কেমন আছে?'

'ভাল। কোন প্রব্লেম নেই।'

'উত্তেজিত হলেই কী আপনার রক্তপাত হয়?'

'কখনওসখনও।'

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। এই শরীর নিয়ে অমন সাহসী হলেন কী করে?'

সায়ন হাসল, 'মনে হয়েছিল প্রতিবাদ করা প্রয়োজন, তাই।'

'আপনার নাম জানা হয়নি।'

'সায়ন রায়।'

'আমি নন্দিতা। স্কুলে পড়াই। যাই, কাল সারারাত সিট ছেড়ে থেকেছি। জিনিসপত্রগুলো ঠিক আছে কিনা দেখি।' নন্দিতা চলে

গেলেন।

সায়ন টয়লেটে গিয়ে দেখল দেওয়াল, প্যান ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। কোনওমতে পরিষ্কার হয়ে ফিরে এল সে। ভানুপ্রসাদের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'অসুখ বাড়েনি তো?'

মাথা নাড়ল সায়ন, 'না। এর আগে যতবার রক্ত বেরিয়েছে ততবারই শরীরে রক্ত দিতে হয়েছে। মনে হচ্ছে এবার তার প্রয়োজন হবে না।'

হঠাৎ ট্রেনটা গতি কমাল। এবার রাতের সেই ছেলেগুলো তৎপর হল। সিটের নিচ থেকে মালগুলো বের করে দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করল জায়গার জন্যে। ট্রেন তখন চলতে হয় বলে চলছে। ঝপ ঝপ করে বান্ডিলগুলো ফেলতে লাগল ওরা। সেগুলো ফেলে দেওয়ার পর ওরা যাত্রীদের কাছে এল কাল রাতে গচ্ছিত রাখা দামি জিনিস গুলো ফেরত নিতে। ট্রেন তখন হুইসল দিচ্ছে।

নেতা ছেলেটি সায়নের সামনে এল, 'এখন কেমন আছেন?'

'ঠিক আছি।'

'এসব করতে আমাদের ভাল লাগে না কিন্তু না করেও উপায় নেই। আমাদের যদি ক্রিমিন্যাল বলা হয় তাহলে সেটা হতে কে বাধ্য করছে তা নিয়ে কেউ ভাবে না।'

'আপনি এত কৈফিয়ত দিচ্ছেন কেন?'

ছেলেটি হাসল, 'ঠিক। বোকার মতো ব্যাপার। চলি, দিদিমণির কাছে ক্ষমা চেয়ে এসেছি। উনি অবশ্য ক্ষমা করতে পারেন না।' ছেলেটি নেমে যাওয়া মাত্র যাত্রীরা সরব হল। ট্রেন তখন পূর্ণ গতিতে চলতে শুরু করেছে। রেল পুলিশ এবং কর্মচারীদের সঙ্গে চোরাকারবারিদের বন্দোবস্ত আছে, এ কথা সবাই সোচ্চারে বলাবলি করছিল। নইলে ট্রেনের ড্রাইভার ঠিক ওদের নেমে যাওয়ার জায়গায় গাড়ির গতি কমিয়ে দেবে কেন?

সায়ন শুনল নন্দিতা চিৎকার করে বললেন, 'আপনারা দয়া করে চুপ করবেন? ওরা যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ তো ভিজে বেড়ালের মতো বসেছিলেন। এখন গলা ফাটিয়ে বীরত্ব দেখিয়ে কী লাভ?'

শেয়ালদা স্টেশনে নেমে নন্দিতা একটা কাগজের টুকরো এগিয়ে দিলেন, 'সায়ন, এখানে আমার ঠিকানা ফোন নাম্বার লেখা আছে। তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট বলে তুমি বলছি। যদি ফোন করো তাহলে ভাল লাগবে। তুমি যা করেছ তা আমি সারা জীবন মনে রাখব।'

সায়ন হাসল। ভানুপ্রসাদ কুলি নিতে দিল না। অজস্র মানুষের ভিড়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সায়নের অস্বস্তি শুরু হল। এত মানুষ, কেউ কারও জন্যে না ভেবে ছুটে চলেছে ট্যাক্সি বা বাস ধরতে। সায়ন বলল, 'দাঁড়াও, সবাই বেরিয়ে যাক, তারপর যাব।'

প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা হয়ে গেলে ভানুপ্রসাদ বলল, 'বাপ্‌স্। কী বড় স্টেশন।' স্টেশনটাই যদি এত বড় হয় তাহলে শহরটা না জানি কত বড় হবে!'

সায়ন কথা বলল না।

ট্যাক্সি নিয়ে ওরা যখন রায়বাড়ির সামনে পৌঁছাল তখন দুপুর। এতদিন পাহাড়ের নির্জনতায় থেকে কলকাতার ভিড়, জ্যাম, গরম কাহিল করে দিয়েছিল সায়নকে। এই ট্যাক্সিটা পেতেও বাড়তি টাকা দিতে হয়েছে। ভানুপ্রসাদের কৌতূহল এত প্রবল ছিল যে কষ্টবোধ ছিল না।

বাড়ির সামনে পৌঁছে অবাক হয়ে গেল সায়ন। পরিগুলো নেই। সেই জায়গায় মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করছে কিছু লোক। সে ভানুপ্রসাদকে বলল, 'এই আমাদের বাড়ি।'

এই সময় পাঁড়েজি কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এল। ট্যাক্সি থেকে নেমে আসা সায়নকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল বৃদ্ধ, 'ও সানুবাবা, সব খতম হো গিয়া, বিলকুল খতম। ও মেরা গোপাল, তুম কাঁহা থা!'

সেই চিৎকার শুনে ওপরের জানলায় এসে উঁকি দিতেই নন্দিনীর শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে গেল। তাঁর মনে হল পাঁড়েজি এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে।

অঙ্কন : কৃষ্ণেন্দু চাকী

(ক্রমশ)

ছোটগল্প

প্রাগৈতিহাসিক

অ ঞ্জ ন ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

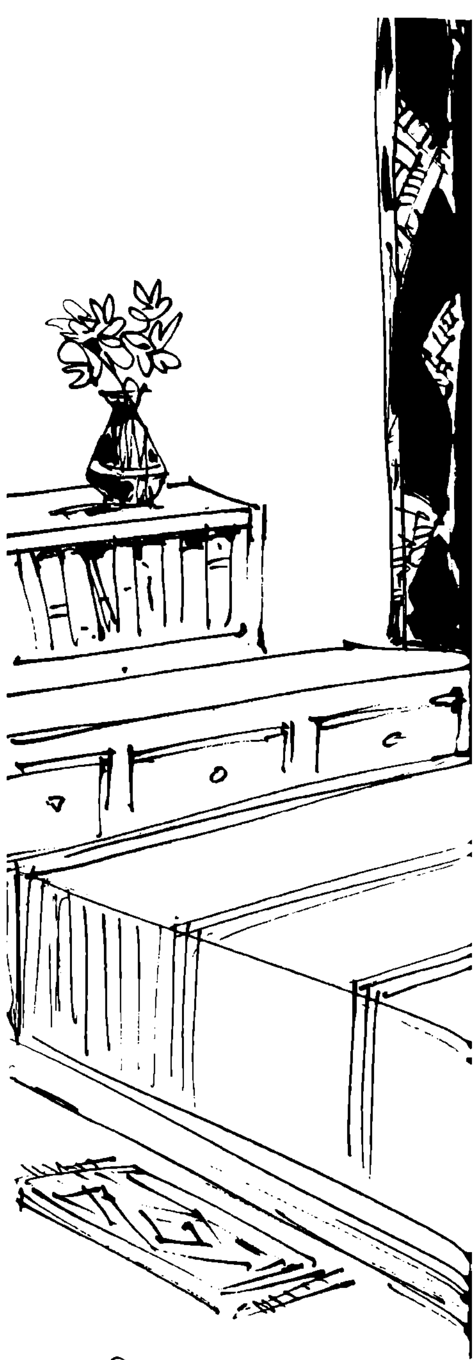

খুব সকালবেলা হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে প্রথমেই যা মনে আসে তা কি সত্যি হয়? অনেকে বলে, হয়। দীপ্তি অনেককেই বলতে শুনেছে, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই একটা খারাপ ব্যাপার চোখে ভেসে উঠল, এখন দিনটা ঠিকমতো কাটলে হয়। নিজে ঠিক সেভাবে কোনওদিন ভাবেনি, আসলে অতটা গুরুত্ব আরোপ করেনি মনগড়া এইসব ভালমন্দে, তাই অন্য যে কেউ বললে সে মুখ ফিরিয়ে থেকেছিল, উত্তর দেয়নি কিছু। কিন্তু আজ খুব ভোরবেলা থেকে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল, শীত চলে যাওয়ার আগে শেষ ঠাণ্ডা জাঁকিয়ে নেমেছিল হঠাৎই ওই বারিপাতে। কম্বলের আড়ালে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে দীপ্তির ঘুম ভেঙে গেল। হুড়মুড় করে বিছানায় উঠে বসতে বসতে অনেক কথা একসঙ্গে মনে হতে লাগল যে, জানলা বন্ধ না থাকায় ঘরে হয়তো জল ঢুকছে, পাশের ঘরে জানলার ওপরে কোনও সান্‌-শেড্‌ নেই বলে যেমনই বৃষ্টি হোক ঘরের মেঝেতে জল জমে যায়, মনে হয়েছিল ঘড়িতে যাই বাজুক না এখন, আর শোবে না বিছানায়, সামনে পড়ে থাকা দিনটাকে দীর্ঘ করে তুলতে এখনই বিছানা থেকে নেমে একবার বাথরুমে যাবে ও, তারপর রান্নাঘরে গিয়ে এক কাপ চা বানিয়ে জানলার পাশে বসে তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দেবে আর বৃষ্টি দেখবে। অভ্যাসমতো পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিল শুভ এখনও ঘুমিয়ে রয়েছে, শেষ রাতের এক ন্যালাখ্যাপা ঘুম, তার মুখ দিয়ে নাল পড়ছে, তার দু'কষে নাল জমে সাদা সুতোর মতো দাগ তৈরি হয়েছে, আর সহসা ঠিক এই সময়েই হাড়-হিম-করা এক দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল দীপ্তি। দেখতে পেয়েছিল, জীবনের শেষ দিনে পৌঁছে গেছে শুভ। আজ শুভ মারা যাবে। হ্যাঁ, আজই।

অবশ্য এই মৃত্যু এমন কিছু অনভিপ্রেত নয়। রবারের মতো বেশ কয়েকটা বছর শুভর জীবনটাকে টেনে টেনে বড় করেছে দীপ্তি। একমাত্র সে-ই পেরেছে, শেষ অবস্থা থেকে বারেবারে শুভকে ফিরিয়ে এনেছে নিজের আপ্রাণ চেষ্টায়। কষ্টও তাকে কিছু কম করতে হয়নি। কষ্ট যে কতদূর ডালপালা ছড়াতে পারে, দীপ্তি এখন নিজের হাতের দুই তালু দেখে বোঝে, দেখতে পায় আঙুলের মাথাগুলো থেবড়ানো, নখগুলোর কয়েকটা অত্যধিক পরিশ্রমে ফাটা ফাটা ও দু' হাতের তালু হয়ে পড়েছে খসখসে। আগের মতো সেই পেলবতা, সেই নারীত্ব আর নেই হাত দুটোয়। দীপ্তি এখন বুঝতে পারে, শুধুমাত্র পরিশ্রম নয়, একের পর এক পায়ের নীচের মাটি যখন সরতে থাকে তখন সারা শরীর এইভাবে শ্রী হারায়, মলিন ও রুক্ষ হয়ে ওঠে।

অনর্গল বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, তবু দিন ফুটছে তারই মধ্যে, এক আবছা রঙের সাদা ও বেগুনি মেশা আলো যেন ক্রমশ ডানা মেলছে পারিপার্শ্বিক জুড়ে। জানলার বাইরে এখন যতদূর চোখ যায়, সবটাই ধূসর, তবু হঠাৎই সেই সিল্যুট পারিপার্শ্বিকে এই বিছানায় বসেই দীপ্তি দেখতে পেল ছাতুবাবু দৌড়চ্ছে। প্রতিদিনই এইভাবে দৌড়ে গিয়ে ফার্স্ট বাস ধরে খিদিরপুরের কাছাকাছি কোনও একটা মিলের ডিউটিতে যায় ছাতুবাবু। ঘড়ি না দেখেও দীপ্তি বুঝতে পারল প্রায় পাঁচটা বাজতে চলল।

বিছানা থেকে উঠতে উঠতে আর একবার দেখেছিল শুভকে। বেশ ভাল আছে শুভ। অকাতরে ঘুমোচ্ছে। গত পরশু তিন নম্বর কেমোটা ভালভাবেই নিতে পেরেছে। শরীরের যন্ত্রণা এখন নিঃসন্দেহে অনেকটা কম তা না হলে এমন ঘুমতে পারত না। বাথরুমে গিয়ে নাইটি ছেড়ে শাড়ি জামা পরে মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে হঠাৎই মনে আসা দুঃস্বপ্নটাকে হটিয়ে দিতে চাইল দীপ্তি। একটু ভেবে বুঝতে পারল এমনই হয়, যেটা কেউ মনে মনে একান্তই না চাইছে, সেই স্বপ্নই বেশি দেখে মানুষ। কই, এতদিন ধরে তমালের সঙ্গে আলাপ সত্ত্বেও তো সে কোনওদিন তমালকে স্বপ্নে দেখেনি। আজ ভোরবেলায় এমনও তো সে দেখতে পারত যে নিয়মমাফিক ঘটে গেছে যা যা ঘটার, বড়দা, মেজদা ও মেজবউদি, ছোটন, সবাইকে সাক্ষী করে শিয়ালদায় সেই ম্যারেজ রেজিস্ট্রার রমণীবাবুর সামনে সে ও তমাল একসঙ্গে, বিশাল খাতায়, নিজেদের স্বামী ও স্ত্রী মেনে পাশাপাশি সই করছে। কালই অফিসে টেলিফোন করেছিল মেজবউদি, মনে পড়ল এখন, হ্যাঁ রে দীপু, শুভ কেমন আছে?

ওই একইরকম। থার্ড কেমোটা নিয়েছে। অনেকক্ষণ ঘুমনোর পর আজ সকাল থেকে একটু ছটফট করছে। খেতে চাইছে, তাই টোস্ট্‌ করে দিয়েছিলাম কড়া করে, খেলো, তারপর

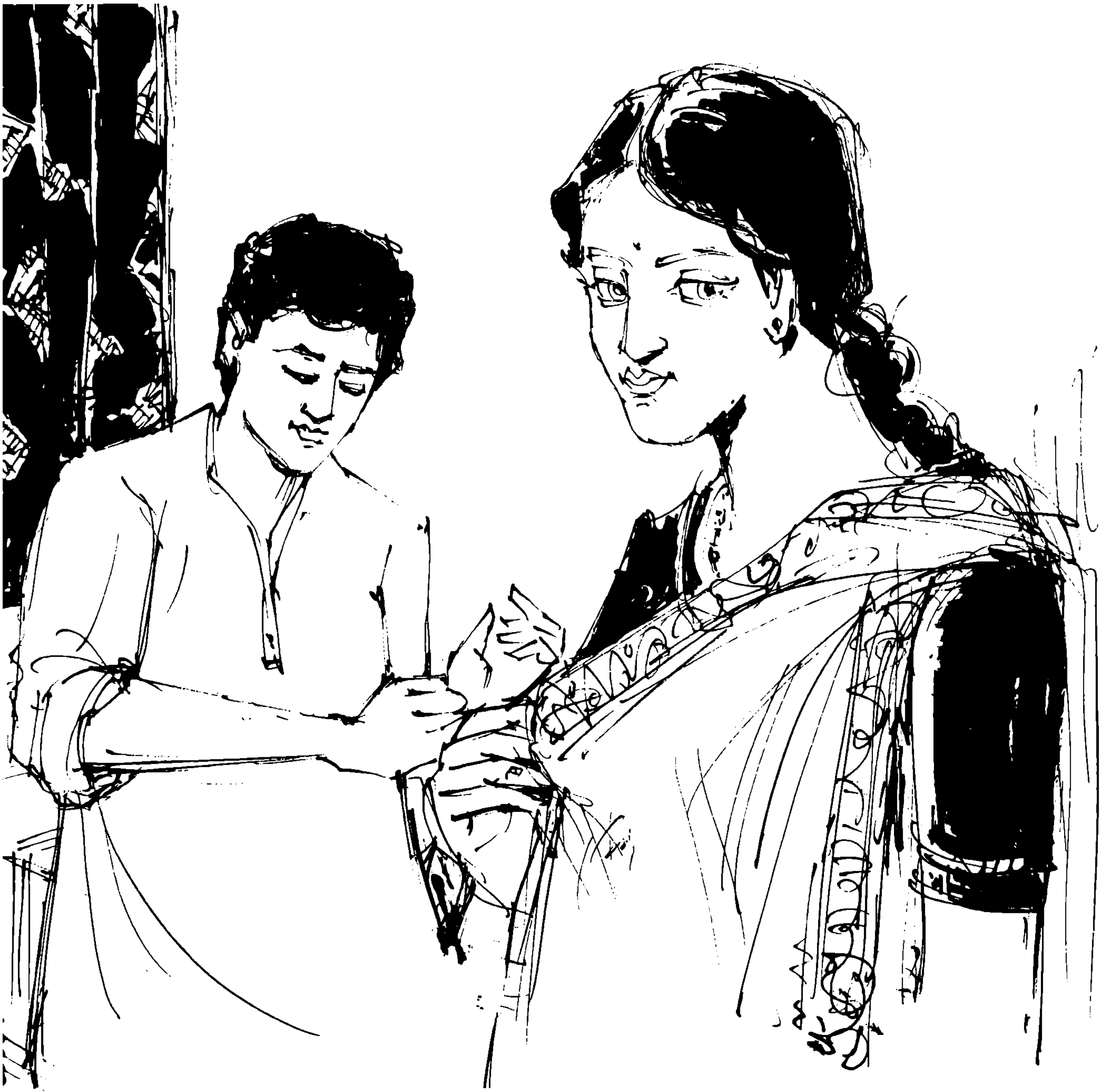

আমি বেরিয়ে আসবার আগে সবটা আবার বমি করে ফেলল। ছায়ার মা এসে গেল বলে ওর হাতে ছেড়ে আমি অফিসে আসতে পারলাম। বলেছি ভাত আর মাছের ঝোল খাইয়ে দিতে। যদি একেবারে না খেতে চায় তাহলে বারেবারে চেষ্টা করতে।

—ইস্‌, কী কষ্ট রে! তুই একা এতসব সহ্য করিস কী করে?

—সহ্য করতে করতে অভ্যেস হয়ে গেছে, বউদি, এখন আর তেমন কিছুই নতুন নয়।

—কিন্তু আর কতদিন এমন করে টানবি তুই?

দীপ্তি কিছুটা চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করেছিল, কেন, তুমি কি তমালের কথা বলতে চাইছ?

আমতা আমতা করে উত্তর দিয়েছিল মেজবউদি, তা ঠিক নয়। তবে ওকেও আর কতদিন বসে থাকতে হবে কে জানে! ওরও তো একটা কষ্ট, একটা সাফারিং, বুঝতে পারছিস দীপু, আসলে তমালও তো তোকে ভালবাসে বলেই না...।

দীপ্তি বলেছিল, কেন যে ভালবাস্‌লো, কে জানে। আর যদি বেসেই থাকে তাহলে কষ্ট পাক। শুভ থাকতে আমার অন্য কিছু সম্ভব নয়। মনে মনে আমি হয়তো তমালকে ভয়ঙ্কর চাই কিন্তু তাই বলে তো আর তাকে এই অবস্থায়, এই সময়ে, ভয়ঙ্করভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। আমাকে দুর্বল করে তুলো না বউদি। প্লিজ... রাখছি এখন।

এখন রান্নাঘরে গিয়ে চা বানালো দীপ্তি। পরিপাটি করে বানানো এক কাপ চা নিয়ে বাইরের ঘরে বসে জানলার বাইরে ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে আসা সকাল ও আকাশের ওই ঘন, ম্যাড়মেড়ে মেঘভার, একমনে দেখতে লাগল।

চা খেতে খেতে বাধ্যতই তার আবার মনে পড়তে লাগল শুভর কথা। যদি আজই ওই শেষ দিন হয়, আজই? একটু পরে সে দরজা

খুলে, ছাতা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। কাছেই একটা টেলিফোন বুথ আছে। খুব সকালে খোলে। টেলিফোনে তমালের নম্বর ঘুরিয়ে একবার ভেবেছিল যদি রং নাম্বার হয় তবেই ভাল। তা না হলে তমাল ছাড়া অন্য কেউ ধরলে সে লাইন কেটে দেবে। কিন্তু তমালই ধরেছিল টেলিফোনটা। ঘুম জড়ানো গলা। এখনও তাকে 'দীপ্তিদি' বলে তমাল, কারণ অনেকটা বয়সের দিক থেকে ছোট সে। এ এক বিষম সম্পর্ক, যা মেজবউদি অনেক চেষ্টা করে মানিয়ে নিতে রাজি করেছে সবাইকে।

ঘুমন্ত গলায় তমাল জিজ্ঞেস করেছিল, কে?

দীপ্তি বলেছিল, আমি বলছি, দীপ্তি...।

—বলো দীপ্তিদি, এত সকালে ফোন করছ কেন? কী হয়েছে?

দীপ্তি বলল, কিছু হয়নি তমাল। শুধু নার্ভাস লাগছে। মনে হচ্ছে যেন সব কিছু শেষ হতে চলল। মনে হচ্ছে আজই, বুঝলি তো?

তমাল বলল, এখনই যাচ্ছি আমি। ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। শুভদাকে চলে যেতে কে দিচ্ছে?

তখন দীপ্তি বলেছিল, তেমন কিছু নয়। তোকে অমন তাড়াহুড়ো করতে হবে না। অফিস যাব, বিকেলে একবার দেখা করিস। আর মনে আছে তো? আমাদের কিন্তু সেই ব্যাপারটা এখনও বাকি।

হঠাৎ চমকে উঠে তমাল বলল, কোন্ ব্যাপারটা?

দীপ্তি বলেছিল, ভুলে গেছিস? ওই যে বলেছিলাম, শেষ মুহূর্তে আমরা দু'জনেই ওর কাছে থাকব। জিজ্ঞেস করব ওর কোনও আপত্তি আছে কি না।

তমাল বলল, রাখছি তা হলে। বলে রেখে দিয়েছিল টেলিফোন কিন্তু ওর মুখেচোখে এক বিড়ম্বনা ফুটে উঠেছিল যেটা দীপ্তি দেখতে পায়নি। এমনও কি হয়? শুভদা মানুষ না মহাভারতের লোক? এমন কি সম্ভব যে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সে বলবে, ঠিক আছে, তোমাদের সব কিছুতেই আমি অনুমতি দিলাম? কী যে বলে দীপ্তিদি...।

কিন্তু তবুও তমাল ঠিক সন্ধে সাড়ে ছ'টা নাগাদ পৌঁছে গিয়েছিল দীপ্তির কাছে। কেন কে জানে, তমালের মনে হয়েছিল সামনের রাতটুকু তার বিনিদ্র কাটবে।

দুই

একটু বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি সরে গিয়ে রোদ উঠল। দীপ্তি অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর ছায়ার মা শুভকে চান করাচ্ছিল। পুরো শরীরটা ছায়ার মায়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে শুয়ে আছে শুভ। এই সময়টা শুভকে প্রথম দিকে একটা ইজের পরিয়ে রাখত ছায়ার মা। কিন্তু সেটা এক অনর্থ। টানতে টানতে শোওয়ার ঘরে নিয়ে যেতে হবে। তারপর ভিজে ইজের খুলিয়ে দিয়ে শুকনো পাজামা পরানো। এখন ছায়ার মা'র সামনে শুভর লজ্জা কেটে গেছে। তাই সে একদম উলঙ্গ শুয়ে রয়েছে মাদুরে। কেমন যেন নীলচে খড়িওঠা গায়ের চামড়া হয়ে পড়েছে শুভর। মাথার চুল সব উঠে গিয়ে এক জীর্ণ মস্তিষ্কের ওপর পাতলা একটা চামড়া লাগানো মনে হয় মাথাটাকে। পাশে রাখা বাটি থেকে তেল নিয়ে ওই কঙ্কালসার শরীরের ঘোলাটে চামড়া ও প্রতিটি রোমবিন্দুতে চেপে চেপে মালিশ করছিল ছায়ার মা। কোমর, নাভি ও তলপেট, হাত চালাচ্ছিল খুব দ্রুত। একটু পরে শুভকে সে মাদুরের ওপর শুইয়ে রেখে রান্নাঘরে গেল গরম জল আনতে।

যেদিন থেকে কেমোথেরাপি শুরু হয়েছে, সে প্রায় মাসখানেক হতে চলল, কেমন একটা আচ্ছন্নের মতো ঘোরের মধ্যে শুভর দিন কাটছিল। কিন্তু আজ, কেটলি করে গরম জল নিয়ে এসে ছায়ার মা দেখতে পেল পিট্ পিট্ করে চোখ মেলছে শুভ। তার মুখের ওপর হঠাৎ দু ফাঁক হয়ে যাওয়া মেঘের আড়াল থেকে ছড়িয়ে পড়েছে তীব্র সূর্যালোক। ছায়ার মায়ের ভাল লাগল। সে শুভর গায়ে জল ঢেলে চান করিয়ে দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কথা বলতে শুরু করল শুভর সঙ্গে।

—কী, দাদাবাবু, জল ঠিক আছে তো? ঠাণ্ডা লাগছে না তো? ঠাণ্ডা লাগলে হাত নেড়ে বলো বাপু। আমি আবার এই সমস্ত বুঝতে পারি না ঠিকঠাক।

ছায়ার মা দেখতে পেল, এই ক'মাস যা কখনও করেনি শুভ, দু' হাতের তালু কোনও মতে একত্র করে চেপে ধরেছে তার নাভির তলার অংশ। অত সব বোঝে না বলেই হাসি পেল ছায়ার মায়ের। বলল, দাদাবাবুর কি অস্বোয়াস্তি হচ্ছে? তাহলে ইজের পরিয়ে দিই, বলো।

শুভ কিছু বলল না দেখে, ধুঁধুলের ছাল দিয়ে ঘসে ঘসে শরীর থেকে তেল ও ময়লা তুলে, মগে করে জল নিয়ে হু হু করে ধুইয়ে দিল প্রতিটি অঙ্গ।

মস্ত বড় টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে যখন তাকে গভীর যত্নে শুকনো করে তুলেছিল ছায়ার মা, শুভর গলায় জড়ানো অনেক কথা আসতে লাগল। এমন হওয়ার কোনও কারণই নেই, ছায়ার মা ছাড়া অন্য সবাই জানে শুভর লাঙস্ থেকে গলার ভোক্যাল কর্ড পর্যন্ত ক্যানসার স্প্রেড্ করেছে। কিন্তু অসুখ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকায় ছায়ার মা তাকে জিজ্ঞেস করল, কী বলছ, দাদাবাবু? বউদি? তা বউদি তো অফিসে গেল।

পাজামা পরানোর সময় নিজের অনুভূতি-বলে বাঁদিকের কোমর অল্প উঁচু করে ধরল শুভ, ফলত ছায়ার মাকে অন্যান্য দিনের মতো টানাহ্যাঁচড়া করতে হল না। অবলীলায় পাজামা গলিয়ে গিঁট বাঁধতে বাঁধতে ছায়ার মা বলল, বাঃ দাদাবাবু, তুমি তো বেশ ভাল হয়ে উঠছ। মনে হচ্ছে বউদিকে গিয়ে এক্ষুনি বলি, যে দেখে যাও, কে বলেছে দাদাবাবু আর ভাল হবে না কোনওদিন? সেদিন যে অমন ডুকরে ডুকরে কাঁদলে আমার কাছে, তা সে কি আর শোনেননি ভগবান?

এতদিন এমন অনেক জীবন ও জীবনবিমুখ কথাবার্তা শুনে এসেছে শুভ। তার নিজের কথা ও হাত-পা থেমে গেছে বলে একমাত্র কান দুটো হয়ে পড়েছে সজাগ। অনেক কথা শুনেও তার মুখের কোনও অভিব্যক্তি জাগত না। কিন্তু আজ উল্টো হতে শুরু করেছে সবকিছু। ছায়ার মায়ের কথা শুনে হাসি পেল শুভর আর তার রংবিহীন মুখেও সেই হাসি জেগে উঠল। শুভর মুখের দিকে তাকিয়ে আচম্বিতে বেশ কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে রইল ছায়ার মা। একসময় বলেছিল, কী দাদাবাবু, কোথায় কষ্ট হচ্ছে বলো? খেয়ে নাও একটু, তারপর ঘুমের ওষুধ দেব।

এমন একটা আলোআঁধারির মাঝে পড়ে শুভ এখন তার মুখ হাঁ করে দিয়েছিল, টকটকে লাল জিভ, অল্প-স্বল্প নড়ছে, ঠোঁট চাটছে, তাই দেখে ছায়ার মা সেদ্ধ মাছ ও ভাত চটকে নিয়ে এসেছিল। তার বমি পায়নি অন্য দিনের মতো। সে কয়েক গ্রাস খেয়ে নিয়েছিল বাধ্য ছেলের মতো এবং ছায়ার মা যখন তাকে বেডপ্যান নিতে বলল, শুভ ইশারায় জানিয়েছিল, সে বাথরুমে যাবে, সে হাঁটতে চায়।

কিন্তু হাঁটতে চাইলেই তো শুধু নয়, তারপরে যদি কেউ দৌড়তে চায়, বেঁচে উঠতে চায় পুরোদস্তুর অথবা তার পুরনো দিন ফিরে পেতে চায়, যদি ভালবাসতে চায়? তাহলে? এত সব কিছু না বুঝেই ছায়ার মা বলেছিল, দাদাবাবু, যদি পড়ে যাও আমি তোমাকে সামলাতে পারব না। তার চাইতে বরং অন্য দিনের মতো বেডপ্যান নাও। হাঁটবে, তুমি নিশ্চয়ই হাঁটবে, তবে সামনের রবিবার, যখন বউদি থাকবে, আমরা দু'জনে তোমাকে হাঁটাব।

যখন বেডপ্যান নিয়ে এসেছিল ছায়ার মা, এক লুপ্ত স্মৃতি দু আঙুলে তুলে বেডপ্যানে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার আগে দেখেছিল, আজ শুভ যে কারণেই হোক, একটু বাজারছাড়া।

তার অঙ্গ কাঠিন্য পাচ্ছে। মুখ টিপে হেসেছিল ছায়ার মা। বলেছিল, কাল থেকে বউদিকে বলব তোমার কাছে শুতে, বুঝেছ, এখন সব কাজ শেষ করো দেখি। ঘুমিয়ে পড়ো। তুমি ঘুমলে আমার আবার বাসন মাজা রয়েছে।

তিন

কেন কে জানে বৃষ্টি তার সঙ্গে লেগে আছে। শীত শেষ হওয়ার এই হাড়কাঁপানো বারিপাত সকালের পরে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল। অফিস থেকে ফেরবার মুখে বাস থেকে নামতেই আবার সহসা হাজির। ছাতা নিয়ে না যাওয়ায় বেশ খানিকটা ভিজে গেল দীপ্তি। সারাদিন তার মনে কী যেন একটা বিস্বাদ জমে আছে। দুদিন না চাঁছা জিভের মতো। কেমন ঘোলাটে, এক রুটির মতো সর জমেছে। অফিসে বসে সকালে দেখা ওই দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছিল দীপ্তি। বেশ কয়েকবার বাথরুমে গিয়ে মুখে মাথায় জল দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করেছিল যেমন চলছে জীবন তেমনই চলবে তার। যাই ঘটুক, যা কিছুই ভবিতব্য হোক তার, আজ, এ ভাবে আগে থেকে জানান দিয়ে কখনও ঘটতে পারে না সেইসব। কিন্তু একবার অনুপ্রবেশ করে যাওয়া দুঃস্বপ্ন কখনও কী অত সহজে যায়? এখন বৃষ্টিতে ভিজে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আর আবার সে ওই দৃশ্য দেখতে পেল। যা কিছু ক্রিয়াকর্ম শেষ করে শুভকে আলাদা খাটে তুলে কোলাহল ছাড়াই অন্য কোনও ঠিকানায় নিয়ে যাচ্ছে একদল মানুষ। সে নিজে ভেঙে পড়তে যাচ্ছে কান্নায়, হঠাৎই তমাল তার মাথাটা নিজের কাঁধে টেনে নিল, বলল, দীপ্তিদি, পাঁচ বছর টেনে আসছ, পাঁচটা বছর মন শক্ত করে কাটিয়েছ আর আজকের দিনটা পারবে না?

যতই সাদামাটা হোক মানুষের বেঁচে থাকা, কয়েকটা নাটকীয় ঘটনা সেই পারিপার্শ্বিকেও থাকতে বাধ্য। যে কারণে ঠিক বাড়িতে ঢোকার মুখে, সপসপে শাড়িতে বিব্রত হয়ে দীপ্তি দেখল তমাল বেশ কিছুটা দূর থেকে দৌড়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল। তমালেরও মাথার চুলে জল আর গায়ের জামা ভিজে জড়িয়ে গেছে সর্বাঙ্গে। তমাল হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, বাবাঃ, যা একটা কাণ্ড করো, দীপ্তিদি, আমি সারাটা দিন শুধু অপেক্ষা করে আছি কখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে। একবার ভাবলাম একলা এসেই শুভদাকে দেখে যাই। কিন্তু আমি ওর অসুখের ভালমন্দ কীই বা বুঝব? এখন সন্ধের মুখে, তোমার বাড়ি ফেরবার সময়টা আন্দাজ করে বাইরে বেরিয়েই দেখি বৃষ্টি। পুরো ভিজে গেছি। পাজামা পাঞ্জাবি দেবে তো?

দীপ্তি ইয়ার্কি করে বলল, আর যদি কিছুই না দিই?

তমালের কপালভর্তি জলভরা চুলের রাশি, মাথা ঝাঁকালে গুঁড়ো গুঁড়ো জলকণা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে, বলল, দীপ্তিদি, তুমি কিন্তু আমাকে প্রভোক্ করছ। এমন বললে আমি কিন্তু যা খুশি তাই করতে শুরু করব।

দীপ্তি গম্ভীর হয়ে গেল। নিজে একটু এগিয়ে বাগানের গেট খুলল। তারপর বারান্দার ছাউনিতে পৌঁছে ব্যাগের মধ্যে চাবি হাতড়াতে হাতড়াতে বলল, আয় তমাল, তোর সঙ্গে আমার অনেক জরুরি কথা আছে।

বাইরের ঘরের সঙ্গে লাগোয়া একটা বাথরুম আছে। তমালকে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে গিয়ে আলমারি থেকে শুভর একটা পুরনো পাঞ্জাবি পাজামা আর একটা শুকনো তোয়ালে নিয়ে এল দীপ্তি, বলল, বাথরুমে গিয়ে জামাপ্যান্টটা বদলে নে, আমি চা নিয়ে আসছি, শুধু বিস্কুট হলেই চলবে না কি অন্য কিছু বানাব?

তমাল বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে বলল, মুড়ি আছে? সঙ্গে আচারের তেল?

অল্প হেসে দীপ্তি বলল, আছে, মেখে আনছি।

রান্নাঘরে যাওয়ার আগে নিজেও একবার ভেতরের বাথরুমে গেল দীপ্তি, চুল মুছে পিঠের ওপর এলিয়ে দিল কেশরাশি, কী মনে হতে ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে অনেকদিন পরে লিপস্টিকের কৌটোটা তুলে নিতে গিয়েও রেখে দিল আবার, শেষে আলনা থেকে যে শাড়িটা বেছে নিয়েছিল, সেটার রং সাদা, সরু একটা কটকির পাড় আছে কিন্তু বেশ নরম কাপড়টা বলে পরলে আরাম হয়।

ইতিমধ্যে যে শুভর কাছে যায়নি তা নয়। শোওয়ার ঘরে ঢুকে দেখতে পেয়েছিল অন্য দিনের মতোই বালিশের ওপর মাথা এলিয়ে শুয়ে রয়েছে শুভ, চোখ দুটো খোলা, দৃষ্টির কোনও সঠিক নিশানা নেই, ডান হাতটা বুকের ওপর আর বাঁ হাতটা এলিয়ে পড়ে আছে বিছানায়। ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠেছিল দীপ্তি, কই, এখনও তুমি সকালের সেই ডোরাকাটা শার্টটাই পরে আছ? ছায়ার মা বদলে দেয়নি জামা?

কথা বলতে বলতে শুভর কাছে এসে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে চোখের সঙ্গে চোখ মেলাবার চেষ্টা করেছিল দীপ্তি। যেমন রোজই করে। আজ দেখতে পেল শুভর চোখ দুটো কেমন যেন জলে ভরে আছে। দীপ্তি তার গায়ে অল্প ঠেলা দিয়ে বলেছিল, চোখের পাতা পিট্ পিট করতে পারো অথচ করোনি কেন? কী এমন দেখছ ছাতের দিকে তাকিয়ে যে চোখের পাতা বন্ধ করতেও ভুলে গেছ? আমি বলছি, কই, শুনতে পাচ্ছ? কেমন আছ তুমি?

উত্তরে দীপ্তি দেখতে পেল শুভ দু চোখ একবার বন্ধ করে রইল অনেকক্ষণ আবার কিছুটা পরে খুলে দিল। যেটুকু জল জমেছিল আঁচল টেনে মুছিয়ে দিয়েছিল দীপ্তি তারপর শুভকে টেনে বালিশের ওপর ঠিক করে শুইয়ে দিতে দিতে বলল, ঘুমিয়ে পড়ো না, এখন সন্ধে মাত্র সাড়ে ছ'টা, তোমাকে দুধ-রুটি দেব ঠিক আটটায়। তারপরে ঘুমবে, বুঝেছ?

তমাল যে এসেছে সে কথা বলতে গিয়েও সাহস হয়নি দীপ্তির। আর একবার তাকে সাহস সঞ্চয় করে তমালকে সঙ্গে নিয়ে এই ঘরে আসতে হবে।

এখন এক হাতে মুড়ির বাটি আর অন্য হাতে চায়ের ট্রে নিয়ে বাইরের ঘরে এসেছিল দীপ্তি। টেবিলে রেখে বলেছিল, খেতে শুরু কর তমাল, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তমাল একরোখার মতো শুভর পাজামা পাঞ্জাবি পরে দীপ্তির দিকে তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ, তারপর বলেছিল, মার্ভেলাস্ লাগছে তোমাকে দীপ্তিদি, সাদা শাড়ি পরলে তোমাকে এত ভাল লাগে জানতাম না তো?

দীপ্তি ওই প্রগলভতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়নি। নিজের কাপটা থেকে একটা চুমুক দিয়ে, একমুঠো মুড়ি নিয়ে চিবোতে চিবোতে বলেছিল, দেখ তমাল, তুই আমাকে কী ভাবিস আমি ঠিক জানি না তবে আমার কাছে তুই এখনও কিন্তু মেজবউদির ভাই হয়েই রয়ে গেছিস। আমাদের অন্য যে সম্পর্কটার চেষ্টা এখন বড়দা, মেজদা, মেজবউদি, সবাই মিলে করতে চাইছে সেটার সম্পর্কে তুই কতটা সিরিয়াস্ আমি আজ জানতে চাই।

তমাল এক গাল মুড়ি নিয়ে জড়ানো গলায় বলল, বাবাঃ, দীপ্তিদি, এত কঠিন আলোচনা করতে হবে জানলে আমি তো বইটই পড়ে আসতাম।

উল্টোদিকের একটা বেতের চেয়ারে বসে রয়েছে তমাল। দীপ্তি দেখতে পেল কথা বলতে বলতে কেমন একটা হাসছে আর তমালের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে একমুঠো আশ্বাস, যা গহন থেকে যে কোনও নারীকে টানে। শিউরে উঠল দীপ্তি। কিন্তু সে মন শক্ত করেছিল। বলল, ইয়ার্কি করিস না তমাল, তোর কাছ থেকে আমি আজ তোর মনটা জানতে চাই।

তমাল সোজা ও টানটান বসে বলল, কী জানতে চাও ঠিক ঠিক বলো। বছর দুয়েক আগে দিদি প্রথম তোমার কথা আমাকে বলে। এক জাহাজ ছেড়ে অন্য জাহাজ ধরবার আগে ছ মাসের ছুটি নিয়ে দেশে ফিরেছিলাম। বাড়ির

সকলের ধারণা ছিল যারা জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার বা ক্যাপ্টেন হয়ে দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ায় তারা কখনও সংসার করতে পারে না। তা ছাড়া আমারও কোনওদিন সে ভাবে ঠিক ঘোমটা টানা মেয়ে পছন্দ ছিল না। দিদি বলেছিল, একজন আছে, খুব কষ্ট করছে, লড়াই করছে একটা অসুখের সঙ্গে, কিন্তু পারবে না জেনেই সেই যুদ্ধ এখনও করে যাচ্ছে। তাকে একবার দেখবি? দিদিটা পাগল আমি জানি, তাই বলেছিলাম, কেন দেখব? যে লড়াই করছে সে কি কোনও চিড়িয়াখানার হোয়াইট টাইগার? যাকে দেখতে হলে টিকিট কাটতে হয়?

দিদি বলেছিল, আজকেই চল। শুভ, মানে আমার দেওর, ক্যান্সার হাসপাতালে আছে। ওখানে চল, তাহলে দীপ্তিকে দেখতে পাবি।

তা সেই তোমাকে দেখলাম দীপ্তিদি। তারপরে তো সবই তুমি জানো। এখন শুধু অপেক্ষা করে আছি।

তা আমাকে দেখে কী বুঝেছিলি তুই? বলতে বলতে বেসামাল হয়ে পড়ছিল দীপ্তি কিন্তু তার নিজস্ব খোলস ছেড়ে সে বেরোতে চাইল না, তাই কঠোর হয়ে রইল।

আর সেই সুযোগে তমাল বলল, তোমাকে সেই প্রথমদিন দেখে কী বুঝেছিলাম জানো? বুঝেছিলাম এই দীর্ঘ দশ/বারোটা বছর মার্চেন্ট নেভিতে কাজ করে হাজার হাজার সোনারুপো কামিয়েও আমি একেবারে কপর্দকশূন্য, একদম একটা নাঙ্গা ভিখিরি।

তমালের কথায় কান মাথা লাল হয়ে গেলেও কোনও কিছু প্রকাশ না করে দীপ্তি বলল, রেখে দে তোর ছেলেমানুষি, তোর শুভদা আজ আছে, কাল নেই। আজ সকালে একটা দুঃস্বপ্ন মনে হয়েছিল, যদি মৃত্যু কখনও ওইভাবে জানান দিয়ে আসে, যদি, তাই তোকে ডেকেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে শুভ ভাল আছে। বা হয়তো একইরকম আছে। সত্যি বলছি তমাল, তুই আমার জন্যে অমন হ্যাংলা হয়ে থাকিস না। শুভ থাকুক বা না থাকুক, আমার পক্ষে ওর ছায়া না মাড়িয়ে অন্য দিকে যাওয়া অসম্ভব।

চা আর মুড়ি অনেকটা খেয়ে তমাল এখন উঠে দাঁড়াল বেতের চেয়ার ছেড়ে। দীপ্তির দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, জোর করে একটা শুকনো জীবন আর কতদিন বয়ে চলবি দীপ্তিদি? আমি তোর করুণাধারা, তুই আমার হাতটা ধর।

দীপ্তি ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, তোর হাত ধরলে আমার হবেটা কী? কোথায় যাব আমরা?

তমাল উত্তর দিল, শুভদার কাছে।

তমালের হাতে হাত দিয়ে দীপ্তি যখন শুভর সামনে এসে দাঁড়াল, তখন দেখতে পেল, অকাতরে ঘুমিয়ে রয়েছে শুভ।

—এই ওঠো। ওঠো বলছি। কে এসেছে দেখো। দেখবে তো না কী? বলতে বলতে দীপ্তি মরিয়া হয়ে ঠেলে দিচ্ছিল শুভকে। কিন্তু চোখ মেলে তাকাল না শুভ। দীপ্তি বলল, দেখেছিস, কষ্ট পেয়ে পেয়ে কী যেন হয়ে গেছে লোকটা? আগে একমাথা ঘন চুল ছিল, তুই তো দেখেছিস, আর এখন দেখ, সারা মাথাটা জুড়ে কেমন নীলচে হয়ে আসা এক অসময়, এক অসুন্দর, আমি এসব দেখতে দেখতে কেমন যেন পাগল হয়ে যাই, বুঝলি, তোর জীবনের সঙ্গে যদি আমার জীবন কোনওদিনও জোড়ে তাহলে তুই কিন্তু আমাকে এত কষ্ট দিস না কোনওদিন।

তমাল কিছু না বুঝে বলেছিল, ওই তো ঘুম ভেঙে গেছে শুভদার। দীপ্তিদি, তুই যা বলবি ওকে বল, দেখ যদি শোনে।

সত্যিই চোখ মেলে তাকিয়েছিল শুভ। আর দীপ্তি অনেক সাহসে বলেছিল, এই হল তমাল, চিনতে পারছ তো?

শুভ কোনও উত্তর দিচ্ছে না দেখে আবার দীপ্তি বলল, তমালকে ভুলে গেলে? মেজবউদির ভাই, সেই যে মার্চেন্ট নেভিতে চাকরি করত। মনে পড়ছে?

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শুভ। তখন তমালের দিকে তাকিয়ে দীপ্তি বলেছিল, কেন আজ সকালে অমন মনে হয়েছিল এখন বুঝতে পারছিস তো? আমি আর পারছি না। পাঁচ বছরের বেশি হল টেনে আসছি এইভাবে। আর কী পারা যায়, তুই বল্? এই লোকটা শুনতে পায়, জানিস্ তুই? সব শোনে, কিন্তু ফ্যাল ফ্যাল করে এমন চেয়ে থাকে। হয় এর মাথায় কিছু নেয় না আর তা না হলে এ সব কিছু বুঝেও অমন বোকা হয়ে থাকার ভান করে।

তমাল বলেছিল, আঃ দীপ্তিদি, একটা অসুস্থ মানুষের সামনে তুমি এভাবে ভেঙে পড়ছ কেন? আমি তো জানতাম, এমনই হবে।

—না, এমন হবে কেন? আমি তো আমার দিক থেকে কোনও অসততা করিনি কোনওদিন। আজ তো এর কাছেই আমি একটা ভিক্ষে চাইতে এসেছি। একেবারে নিঃস্ব হয়ে, যাকে জীবনের সব দিয়েছি, তার কাছে দু হাত বাড়িয়ে দিলে, সে কেন এতটা কৃপণ হবে? বল্ তমাল, তুই বল্?

শুভর ওই মরণোত্তর চেয়ে থাকার সামনেই এখন দীপ্তিকে প্রায় জড়িয়ে ধরে অন্য ঘরে নিয়ে গেল তমাল। বাইরে আবার বৃষ্টি জেঁকে এসেছিল। পাশের ঘরে আলো জ্বলছে, এটা তাদের বসবার ঘর নয়, এ ঘরে একটা ছোট খাট পাতা, বেশি আসবাব নেই, এককোণে একটা চেয়ার পড়ে আছে। হঠাৎই তমালের হাত ছাড়িয়ে দীপ্তি দৌড়ে গিয়ে ওই ছোট খাটে শুয়ে পড়েছিল। দু চোখের ওপর ডান হাতটা চাপিয়ে বলল, তমাল, তুই আলোটা নিবিয়ে দে, আমার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে।

আলো নিবিয়ে দিয়েছিল তমাল। তারপর ঘরের কোণে রাখা চেয়ারটা টানতে যাবে, দীপ্তি বলল, ওই চেয়ারটা নিস না, ওটার পায়া ভাঙা, তুই এখানে আয়, আমার পাশে বসে থাক্। বাইরে যা বৃষ্টি, এখন আর বাড়ি যাবি কী করে?

তমাল বিছানায় দীপ্তির পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করল, আমার বাড়ি যাওয়ার কথা ছাড়ো, এখন কিন্তু প্রায় আটটা বাজে, শুভদাকে তুমি খাওয়াবে না?

দু হাত শূন্যে তুলে আড়মোড়া ভাঙল দীপ্তি। তারপর অন্য কথা বলেছিল। তোকে মিছিমিছি ডাকলাম, তমাল, সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই মানুষ যা দেখবে তা যে সব সত্যি হবে তার কোনও মানে নেই।

তখন তমাল বলল, এসব তুমি কী ধরনের কথা বলছ দীপ্তিদি। যা তুমি ভেবেছিলে, বা যা তুমি আজ সকালে দেখেছিলে, সব যে সত্যি হবে, এটা কি তুমি নিজেই চেয়েছিলে?

তমালের কথায় বিছানার ওপর ছিটকে উঠে বসেছিল দীপ্তি। তারপরে এক বেসামাল কাণ্ড করেছিল। তার মুখের কাছেই তমালের মুখ, অন্ধকারে তার ঠোঁটের কাছেই তমালের ঠোঁট, তবু ওই সমস্ত ভাষার দহনে না ডুবে নিজেকে সে প্রতারিত করেছিল। দীপ্তি দু হাতে তমালের বুকের কাছের পাঞ্জাবিটা খামচে ধরে ছিঁড়ে ফেলতে ফেলতে কেমন এক আচ্ছন্নের মতো মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে জিজ্ঞেস করেছিল, দেখেছিস তো কেন এই বেশ কয়েকটা বছর নিজেকে এমন কোণঠাসা করে তুলেছি? তুইও, এমন কী তুইও, কী অমন দেখলি আমার মধ্যে যে তুই আমাকে ভুল বুঝলি। আমার মধ্যে কোনও বিরক্তি থাকতে নেই, কোনও রাগ থাকতে নেই, বল্, তাই তো?

হয়তো অনেক দিন নখ কাটতে ভুলে গেছে দীপ্তি তাই আঁচড় লেগে তমালের বুকটা ছড়ে গেল। অনেক দিন, অনেক মাস ক্রমাগত লোনা জলে ধাক্কা খেতে খেতে বন্দর পাওয়ার চেষ্টায় উন্মুখ হয়ে, দীপ্তিকে দেখে তমালের তেমনই কোনও একটা জাহাজের কথা মনে হল। দেখতে পেল আবার বিছানায় ধপ্ করে শুয়ে পড়ল দীপ্তি। এখন একেবারে অন্য এক কোণে। বালিশে তার মাথা রইল না। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি, তবুও রাস্তার ল্যাম্প পোস্টের আলো জানলায় লাগানো গ্রিলের ফাঁক দিয়ে দীপ্তির মুখে এসে পড়েছে। তমাল দেখতে পেল জালের মতো সেই আলো অ্যারাবেস্ক-ধর্মী।

এবং সেই জালের ওপর বৃষ্টির জলের ছায়া এক অনন্ত-প্রবাহ তৈরি করেছে। বেশ কিছুটা দূর থেকে দীপ্তির দিকে তাকিয়ে রইল তমাল। অনেকটা পরে মনে হয়েছিল হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে পূর্ণিমা রাতে সে যেন জাহাজের ফোক্‌সাল্‌ দিয়ে ধুধু সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। আবছা নীল জল কখনও চিক্‌ চিক্‌ করে উঠছে জ্যোৎস্নায় আবার কখনও বা এক জমাট আন্ধেরা সেই জলে। এতদিন জলের ওই গহনের কথা জেনে এসেছে তমাল। এখন সে দীপ্তির পাশে ফাঁকা জায়গাটাতেও আড় হয়ে শুয়ে পড়ল। দীপ্তির পিঠে আলতো করে নিজের ডান হাতের তালু রাখল। একবার মনে হল দীপ্তিকে বলে, আমি একটা আন্‌পড়, একদম আনাড়ি, বুঝলে, আমি জলের মাপজোক নিয়ে অঙ্ক কষি কিন্তু মানুষের মন বা তার ভাঙচুর নিয়ে একটাও অঙ্ক কষবার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু এসব বলবার অবকাশ পাওয়ার আগেই পাশ ফিরে দীপ্তি তাকে বলেছিল, তোকে একটা ভুল দিনে আমি ডেকে এনেছি, তমাল, তুই আমাকে ক্ষমা কর। মানুষের দুঃস্বপ্ন ওভাবে কখনও সত্যি হয় না।

হঠাৎ মনে পড়ায় তমাল বলেছিল, তুমি শুভদাকে এখন দুধ-রুটি দেবে না?

দীপ্তি তাকে আচমকা জড়িয়ে ধরে বলল, আর ভাল লাগছে না। একরাত না খেলে কী আর হয়? মানুষ মরে যায় না।

চার

আক্রান্ত সময় বড় দ্রুত কাটে। হিসেবের বাইরে আজ রাত তিনটেয় উঠে বসল দীপ্তি। বাথরুম যেতে হবে। তমালকে কাটিয়ে কোনওমতে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বারান্দায় এসে পৌঁছল আর তখনই বুঝল গত রাতের মাদকতায় লবির জানলার শার্সিটা টানেনি সে। তাই জলে ভরে আছে বারান্দাটা। তার পা জলে সপ্‌সপ্‌ করতে লাগল। আর ঠিক বাথরুমের দরজার কাছে এসে সে দেখতে পেল অন্ধকারে কী যেন একটা লম্বা হয়ে মাটিতে পড়ে। আন্দাজে আবার পিছনে ফিরেছিল দীপ্তি। ডাইনিং টেবিলের পাশে এসে লবির আলো জ্বালিয়েছিল। আর তখনই সে দূর থেকে দেখতে পেল শুভকে, বাথরুমের দরজার কাছে জল ভর্তি মেঝেয় মুখ গুঁজে শুয়ে রয়েছে, খালি গা, ডোরাকাটা জামাটা তার গায়ে নেই। কে যেন খুলে নিয়েছে সেটা।

এত জোরে চিৎকার করে উঠেছিল দীপ্তি যে তমাল ছুটে এসেছিল বারান্দায়। জাহাজের ইঞ্জিনিয়র বলে তার মাথায় এক অন্তিম প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কাজ করেছিল। বারান্দার এককোণে হাঁটুতে মাথা গুঁজে, দীপ্তি জমে থাকা বৃষ্টির জলের ওপর বসে। তমাল কোনও কথা না বলে শুভর কাছে গিয়ে তাকে সোজা করে শুইয়েছিল। তারপর পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েছিল দু হাতে। বারান্দা পেরিয়ে শুভকে তার নিজের বিছানায় এনে শুইয়ে দেওয়ার সময় তমাল বুঝতে পেরেছিল শরীরটা শক্ত হয়ে আছে। আর কোনও সেবা ও পরিচর্যার প্রয়োজন নেই। তমালের ঘড়িতে প্রায় চারটে বাজতে চলল। হয়তো আলো ফুটবে এবার। বিছানায় শুভর মাথায় একটা বালিশ দিয়ে দিল তমাল। সে নিজে কোনও ডাক্তার না হলেও শুভর দেহটার এমন শক্ত ও শীতল হয়ে যাওয়া দেখে বুঝল অন্তত ঘণ্টা দুয়েক আগে মারা গেছে শুভ, কিংবা হয়তো আরও আগে, কে বলতে পারে?

পাঁচ

বাড়ির কাছের টেলিফোন বুথটা, প্রায় সকাল ছ'টা হতে চলল, এখনও খোলেনি। ইতিমধ্যে দুবার গিয়ে ফিরে এসেছিল তমাল। অনেক কষ্টে বারান্দা থেকে দীপ্তিকে তুলে শুভর ঘরের পাশে ওই ছোট ঘরের খাটে প্রথমে শোওয়াতে চেষ্টা করেছিল তমাল। শোয়নি দীপ্তি। এখনও দু হাঁটু জড়ো করে ঠায় তাতে মাথা গুঁজে বসে ছিল। আর তমাল একটু দূরে ওই ভাঙা চেয়ারটায় বসবার চেষ্টা করছিল, আবিষ্কার করেছিল বাঁদিকে হেলান দিলে চেয়ারটা আর দুলছে না।

ভোরবেলাকার আবছা আলো দীপ্তির শরীর জুড়ে পড়েছে আবার। কিন্তু তাতে রাতের ওই অ্যারাবেস্কধর্মী লাইট পোস্টের আলোর রহস্যময়তা নেই। মাথা তুলে দীপ্তি জিজ্ঞেস করল, কী রে, টেলিফোনে পেলি কাউকে?

—কোথায় আর পেলাম, বুথটাই তো খোলেনি।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞেস করল দীপ্তি, শুধু তুই জানিস্‌ আর আমি জানি, লোকটা অতটা হাঁটল কী করে বল তো? কী করেই বা গায়ের জামাটা খুলে ফেলল? এমন কী হতে পারে?

তখন তমাল বলল, কাল রাতে আমাদের অবস্থাটা কী ছিল তোমার মনে আছে?

অস্ফুট গলায় দীপ্তি বলল, মনে আছে।

তমাল বলল, আমার কী মনে হয় জানো? মনে হয় ভালবাসা আর ভালবাসাহীনতা দুটোই বোধহয় একই মাপের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তুমি যে শুভদাকে আপ্রাণ ভালবাসো এটা শুভদা জানত কিন্তু সমস্ত অসম্ভবকে পায়ে ঠেলে মাঝরাতে শুভদা আবার বেঁচে উঠেছিল শুধু এইটুকু দেখতে যে তার ভালবাসা কী ভাবে মরে যাচ্ছে।

—কী বলতে চাইছিস তুই, তমাল? যেভাবেই হোক ওই বাথরুম পর্যন্ত উঠে এসে জমে থাকা বৃষ্টির জলে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েই তো...

—না দীপ্তিদি। তুমি ভুল করো না, শুভদা অনেক আগেই মারা গিয়েছিল। আমি ওর বডি ছুঁয়েছি, আমি জানি অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল শুভদা।

তমালের কথায় শিউরে উঠল দীপ্তি। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে বলে এক অচেনা আওয়াজে জিজ্ঞেস করল, কখন হয়েছিল তবে? কখন? তমাল বলেছিল, সেই যখন আমরা দুজনে হাতে হাত রেখে ওর সামনে দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, যখন তুমি ওকে ঠেলে জাগাতে চাইছিলে আর ও আমাকে চিনতে পারল না বলে আফসোস করছিলে।

একটা চাপা কান্নায় অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল দীপ্তি। জানলার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিল অন্য দিনের তুলনায় আজ অনেকটা বেশি আলো ফুটেছে তবে সারা রাত বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তায় জল জমেছে বেশ খানিকটা। হঠাৎই দেখেছিল ছাতুবাবু দৌড়চ্ছে। আজ যে কারণেই হোক্‌, প্রথম বাসটা না পেয়ে পরের বাসটা ধরতে ছুটছে ছাতুবাবু। কিন্তু অভ্যাস আর যায় কোথায়? পরের বাসটার অনেক দেরি আছে তবু না ছুটে কি ছাতুবাবু পারে?

তমাল চটি গলাতে গলাতে বলল, আর একবার দেখি। যদি বুথ্‌টা খোলে তাহলে সকলকে খবর দেওয়া যেতে পারে।

দীপ্তি তখন বলেছিল, শোন্‌ তমাল, তুই কী ভাবছিস আমার জানতে ইচ্ছে করছে। তুই কি আমাকে, যেভাবে মেজবউদি বা বাকি সবাই ঠিক করেছে, তেমন করে...?

কথা শেষ হওয়ার আগেই তমাল বলল, উঁহু। আমি একটা ভয়েজে আবার যাব। ছ-সাত মাস কী তার কিছু বেশি দেরি হতে পারে। তবু সমুদ্রের ওই জল, ওই নীল গহন না দেখতে পারলে আমি পাগল হয়ে যাব দীপ্তিদি।

চটি পরতে গিয়ে তমালের মানসিক চেতন ও অবচেতনে অকস্মাৎ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। কখনও বাঁ পা গলাতে গিয়ে ডান পা খুলে যায় আবার কখনও ডান পা। আর হঠাৎই অত্যন্ত কঠোর হয়ে গিয়েছিল দীপ্তি। সাদা শাড়ি পরা রুক্ষ কোনও ভালবাসাহীন নারীর মতো দীপ্তি বলেছিল, মনে রাখিস তমাল, পৃথিবীতে কোনও হত্যাই কিন্তু একলা হয় না। তাতে কেউ না কেউ জড়িয়ে থাকে। কেউ না কেউ। থাকতে বাধ্য...।

অঙ্কন : নির্মলেন্দু মণ্ডল

ছোটগল্প

দ্বীপপুঞ্জ

সু কা ন্ত চ ট্টো পা ধ্যা য়

একদা এই সরস্বতী নদীর উজান বেয়ে কত সওদাগরের নৌকো পাল তুলে ভেসে গেছে আদি সপ্তগ্রামের দিকে, কেউ কি বিশ্বাস করবে এখন? ছোট ব্রিজটার বয়স বেশি হয়নি, দেখলেই বোঝা যায়। রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়ে অনেক নীচে নদীর খাতটা দেখবার চেষ্টা করছিল দেবযানী, তলপেটের সীমান্তে মাস দুয়েকের পুরনো অপারেশনের স্কারটা টনটন করে উঠতেই সোজা হল। কবে মরে হেজে গেছে নদী, এখন এই ভরা বর্ষায় রোগা একটা খালের মতো দেখায় তাকে। সত্যি বলতে কি, খালও নয়, খালেও এসময় জলের একটা ধারা থাকে, এখানে বোধহয় তাও নেই, ঘন কচুরিপানায় ঢেকে আছে নীচটা, সেই আচ্ছাদনের তলায় জল থাকলেও কিছু এসে যায় না। মোট কথা নদী এখন মৃত, তার একটা চিহ্ন শুধু জেগে আছে এখানে।

সাদার ওপর হলুদ-লাল-সবুজ জংলা ছাপের সিন্থেটিক শাড়ির আঁচল পিঠের ওপর থেকে ডান দিক দিয়ে ঘুরিয়ে সামনে এনে কোমরের বাঁদিকে গুঁজেছে দেবযানী, সেখানে ভাঁজ করা একটা গোলাপি রুমালও গোঁজা আছে। দু হাত পেছনে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত মিষ্টি একটা গন্ধ প্রাণভরে টেনে নিতে নিতে প্রশান্ত ইন্দু টের পায় ভারতবর্ষে এসব জিনিস জন্মায় না। বহু দূরে পারী, লন্ডন, আমস্টারডাম বা ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ভেসে আসছে যেন ওই পাগলকরা ঘ্রাণ। দেবযানীর শরীর ঘুরে প্রশান্তর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যাচ্ছে তা এখন।

ঘুরে রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দেবযানী বলল, তুই যে বললি এটা সরস্বতী নদী, তুই কনফার্মড? তোদের হিস্ট্রির লোকেদের দিয়ে বাবা বিশ্বাস নেই, যে কোনও কিছুর ভেতর থেকে একটা ইতিহাস টেনেহিঁচড়ে বার করা তোদের স্বভাব।

বলে আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেছে দেবযানী। কৌতূহলী চোখে চারধারটা দেখছিল। দেখবার খুব একটা কিছু নেই অবশ্য এখানে। ব্রিজ পেরিয়ে খানিকটা এগিয়ে ডান দিকে বাঁক নিলে একটা বাজারমতো পাওয়া যাবে, বাজার ছাড়িয়ে বাস স্ট্যান্ড, যেখান থেকে এক ঘণ্টা পর পর কলকাতার বাসগুলো ছাড়ে। ঝুলে-পড়া চশমাটা নাকের ওপর দিকে ঠেলে দিতে দিতে ব্রিজের ওপারে তাকাল দেবযানী। কাল রাতে ঘোর বৃষ্টির মধ্যে ওই দিক থেকেই গাড়ি চালিয়ে এসেছে সে, এই ব্রিজটাও নিশ্চয়ই পার হয়েছে— তখন এতসব কিছু খেয়াল করবার মতো অবস্থা ছিল না মনের। কিন্তু কেন এল সে? ফোনে গীতশ্রীর দেওয়া ভাসা ভাসা একটা ঠিকানার ওপর নির্ভর করে এত দূর? এতকাল পর প্রশান্ত সম্পর্কে সত্যিই কি কোনও কৌতূহল অবশিষ্ট আছে আর? না বোধহয়। প্রবল এক ক্রোধ, হ্যাঁ ক্রোধই, তাকে তাড়িয়ে এনেছে এখানে। কাল সারারাত, এমন কি ঘুমের ভেতরেও বুঝি, ক্রোধটা ধিকি ধিকি জ্বলছিল বুকে। এখন অবশ্য সব ক্রোধ আর ক্ষোভ মরে গিয়ে শান্ত হয়ে এসেছে ভিতরটা।

কাল রাত আটটার দিকে ওই বাজারের কাছেই একটা ঝুপড়ি দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়েছিল দেবযানী। হালকা বৃষ্টি ছিল তখন। প্রশান্তর কথা জিজ্ঞেস করতে দোকানি যেভাবে এগিয়ে এসে বৃষ্টিতে প্রায় ভিজে যেতে যেতে প্রশান্তর বাড়ির পথটা তাকে দেখিয়ে দিয়েছিল তাতে দেবযানী তখনই টের পায় এই গঞ্জমতো জায়গায় প্রশান্ত রীতিমতো বিখ্যাত লোক।

এই ব্রিজটার কথা মনে আসছিল না দেবযানীর। না আসবারই কথা। রাতের বেলায় গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ন্যাশনাল হাইওয়ের দুধারে পশ্চিমবঙ্গের সব পাড়াগাঁকেই একই রকম দেখায়। সেই খোলার চালের মেটে ঘর, দু-একটা পানাপুকুর কিংবা ডোবা, সেই শনি-কালীর মন্দির বা মসজিদ, শিবতলা, ঘুমন্ত কুকুর বা জাবরকাটা গরু-মোষ। আর বৈচিত্র্যহীন সব গাছপালা। এসবের মধ্যে কোনও সৌন্দর্য খুঁজে পায় না দেবযানী।

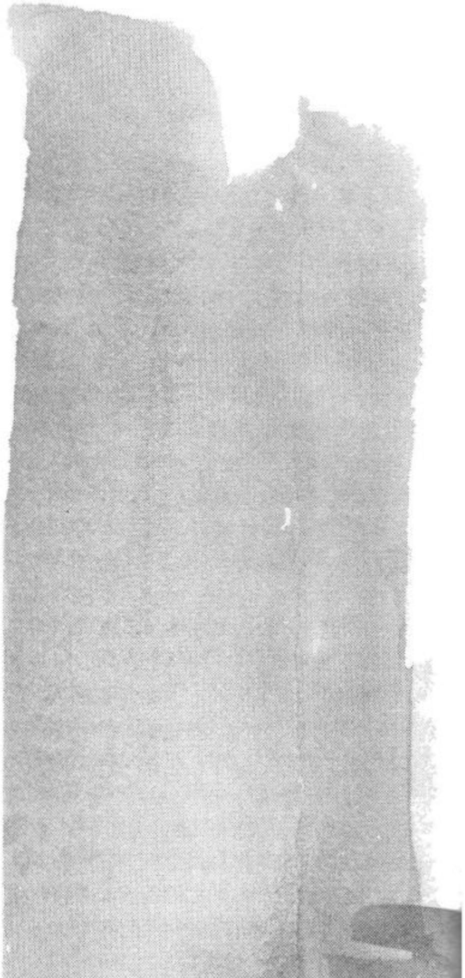

দারিদ্র্য, শুধু অপরিসীম দারিদ্র্য! গত অ্যাসেম্বলি ইলেকশনের পর ছুটি কাটাতে শংকরপুর যাওয়ার পথে কথাটা বলেছিল বলে কী তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে তার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল উৎপল! দেবযানী ভোলেনি।

দেবী!

প্রশান্তর ডাকে অবাক হয়ে ঘাড় ঘুরিয়েছে দেবযানী, ফর্সা অপরূপ মুখখানায় একটা ছায়া

পড়েই মিলিয়ে গেল বুঝি। গতরাতে এখানে এসে পৌঁছনোর পর এই প্রথম এত গাঢ় করে ডাকল প্রশান্ত। কতকাল পর শুনছে সে ওই ডাক! মাঝখানের দুটো যুগ উড়ে গেছে। উড়ে গেছে নাকি ক্ষয়ে গেছে বলবে?

ঠোঁটের হাসিতে একটু কৌতুক মেশানোর চেষ্টা করে দেবযানী বলল, মনে আছে এখনও তোর? ওই নাম? তোর বউয়ের সামনে আবার ও নাম ধরে ডেকে বসিস না যেন!

বলে শব্দ করে একটু হাসল সে। প্রশান্তর চোখে হাসি নেই, কৌতুকের লেশমাত্র নেই। কেমন যেন ঘোর লাগা দৃষ্টি। শেষ বিকেলের আলো মরে আসছিল। পশ্চিম আকাশে ঘনায়মান মেঘের দিকে তাকাল দেবযানী। পাখির একটা ঝাঁক উড়ন্ত মালার মতো উড়ে আসছিল মাথার ওপর। এইসব পাখিদের নাম কোনওদিন কাউকে জিজ্ঞেস করে জানা হয়নি দেবযানীর। ছোট একটা শ্বাস গোপন করে প্রশান্তর দিকে তাকাল সে।

তুই কিন্তু এখনও বলিসনি কোথায় আমার ঠিকানা পেলি?

প্রশ্নটা করে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এখনও প্রশান্ত। দূরমনস্ক দেবযানী বলল, সব কথা তোকে বলতে হবে কেন?

আজ সকাল থেকে বারতিনেক ওই প্রশ্নটা করেছে প্রশান্ত। প্রত্যেকবারই হালকা কথার ছলে উত্তরটা এড়িয়ে গেছে সে। বোধহয় একটু রহস্যের লোভে। এখানে এসে সারাটা দিনই কেমন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটল আজ। অ্যালজোলাম নামের ওই ঘুমের ওষুধও এত চমৎকার ঘুম কোনও দিন দিতে পারেনি তাকে। মাঝখানে প্রীতি এসে একবার ডেকে তুলেছিল তাকে দুপুরের খাবার জন্যে। তারপর ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি এল আবার। আর গভীর এক ঘুম।

বিকেলে চায়ের কাপ হাতে ঘুম ভাঙিয়েছিল প্রীতি, হাসতে হাসতে বলেছিল, বাহ্ বাহ্, এত ঘুমোতেও পারেন আপনি! ওদিকে আপনার বন্ধু যে তৈরি হয়ে বসে আছে আপনাকে সরস্বতী নদী দেখাতে নিয়ে যাবে বলে।

বাইরে বিকেলের মেঘভাঙা রোদে ভেসে যাচ্ছে তখন চরাচর, জানালায় ভারী পরদা থাকায় বুঝতে পারেনি দেবযানী। এখন প্রীতির স্বচ্ছ সরল কচি মুখখানা ফিরে দেখতে পেল আবার। কাল রাতে এখানে এসে পৌঁছনোর পর থেকে মেয়েটা কত কী করে যাচ্ছে তার জন্যে! শোবার সময় মশারির ধার পর্যন্ত গুঁজে দিয়েছিল।

প্রশান্তর বোধহয় একটু অভিমান হয়েছে, দূর আকাশে জমাট কালো মেঘের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে। তুচ্ছ একটা ব্যাপারের ওপর প্রশান্ত এত জোর দিচ্ছে যে দেবযানীর জেদটা বেড়ে যাচ্ছে তাতে। একটু মজাও অবশ্য পাচ্ছে সে। প্রশান্ত কোনও কৌতূহল না দেখালে সে নিজেই হয়তো বলে ফেলত।

তমলুকের ওয়েবকুটার সম্মেলন থেকে ফিরে নৈহাটি থেকে গীতশ্রীই ফোনে বলেছিল, তোর প্রেমিককে দেখে এলুম রে এবার।

মানে?

প্রশান্ত ইন্দু, ভুলে গেছিস?

আর তখনই দেবযানীর মনে পড়ে গিয়েছিল রায়গঞ্জ থেকে প্রেসিডেন্সিতে পড়তে আসা গ্রামীণ সরল মেধাবী ছেলেটির কথা। স্কুলশিক্ষক বাবার বহুদিনের স্বপ্ন ছেলে প্রেসিডেন্সিতে পড়বে। সত্তরের সেই উত্তাল দশকে প্রেসিডেন্সিই বোধহয় শেষ করে দিত ছেলেটাকে যদি না মাঝখানে এসে পড়ত দেবযানী। একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল ঠিকই, ভাসা ভাসা একটা শারীরিক সম্পর্ক। কলেজ পালিয়ে সিনেমা দেখা। কফি হাউস। দু-একবার লুকিয়ে চুমু। ব্যাপারটাকে কোনওদিন বিয়ে পর্যন্ত ভাবেনি দেবযানী।

দেবযানীর বাবা-মা উভয়েই পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কর্মী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা। বস্তুত এম.এ পরীক্ষার ফল বেরনোর আগেই উৎপলের সঙ্গে তার বিয়েটাও যে পার্টি সূত্রেই হয়েছে সে বিষয়ে দেবযানীর কোনও সন্দেহ নেই। দেবযানীর মৃদু আপত্তি কেউ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। যে জীবনকে সে অনেক অনেক বড় বলে জানত, তা হঠাৎই কেমন ছোট হয়ে এসেছিল। প্রশান্তর সঙ্গে কলেজজীবনের সম্পর্কটাকে এক সময় তুচ্ছ এক ইনফ্যাচুয়েশন বলেই ধরে নিয়েছিল সে। হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিল সে প্রশান্ত নামের কোনও পরিচ্ছেদের কথা।

বহুকাল পর নৈহাটি থেকে ফোনে গীতশ্রী বলেছিল, ও কিন্তু তোর কথা এখনও ভুলতে পারেনি, খুব জিজ্ঞেস করছিল রে! বেচারা!

শুনতে শুনতে বুকের খুব গভীরে একটা সিরসিরানি কি টের পায়নি সে? পেয়েছিল। তারপর আরও কত বৃত্তান্ত বলেছিল গীতশ্রী, এই বয়সেও সেই কলেজজীবনের মতোই চেহারা রেখেছে, মাথার চুল কুচকুচে কালো, একটাও পাকেনি। আমাকে তো প্রথমে চিনতেই পারেনি, বলল বুড়িয়ে গেছিস। নতুন বাড়ি করেছে, কতবার যে ওর ওখানে বেড়াতে যেতে বলল! ভারি সুন্দর নাকি জায়গাটা। ঐতিহাসিক কী সব মনুমেন্ট-ফনুমেন্ট আছে।

নাম শুনেই চিনেছিল দেবযানী। উৎপলদের পার্টির দুর্ভেদ্য দুর্গ। মোটামুটি পথটা চেনা ছিল বলেই গাড়ি চালিয়ে একা এত দূর আসতে পেরেছে সে। তাছাড়া ভেতরে তখন প্রবল একটা ক্রোধে দাউদাউ করে জ্বলছিল। ক্রোধের বশে মানুষ কত অসাধ্য সাধন করতে পারে দেবযানী এখন জানে।

গাঢ় হয়ে সন্ধ্যা নামছিল, মাথার ওপর নিচু হয়ে আসছিল মেঘ। প্রশান্তর পেছন পেছন ব্রিজ থেকে নেমে এল সে। পথটা আট ফুট চওড়া হবে, পিচেরই। তবে দীর্ঘদিন বোধহয় মেরামত হয়নি, এখানে-ওখানে গর্ত জেগে আছে। তাতে ধরা আছে বৃষ্টির জল আর আকাশের প্রতিবিম্বিত ক্ষীয়মাণ আলো। দুধারের ঘন গাছপালায় পাখিদের সব কলরব এখনও স্তব্ধ হয়ে যায়নি। কোথা থেকে যেন কদমফুলের মৃদু গন্ধ ভেসে আসছিল। বুনো ঝোপঝাড়ের তীব্র গন্ধের মধ্যেও সেটা আলাদা করে চিনতে পারে দেবযানী। পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে ভারি অবাক দৃষ্টিতে চারদিকটা দেখছিল সে। প্রশান্ত গম্ভীর হয়ে আছে, এই ঘনায়মান অন্ধকারে তার ভেতরকার ছটফটানিটা উপভোগ করতে ভারি ভাল লাগছিল দেবযানীর।

একটু হেসে দেবযানী বলল, তোদের এখানে নাকি কীসব ঐতিহাসিক ব্যাপার-স্যাপার আছে?

ভিজে হাওয়া আড়াল করে সিগারেট ধরাল প্রশান্ত, চোখ সরু করে বলল, কার কাছে শুনেছিস?

উত্তরে গীতশ্রীর নামটা কিছুতেই বলবে না দেবযানী। কলেজে পড়ায় গীতশ্রী, সেখানেই কলিগকে বিয়ে করে থিতু হয়ে গেছে। কলেজে না পড়ালেও তার সঙ্গে দেবযানীর যোগাযোগ থাকতে পারে সেটা এখনও কেন যে মাথায় খেলছে না প্রশান্তর।

ভ্রূ কুঁচকে দেবযানী বলল, আমি শুনেছিলাম... কোথায় যেন পড়েছি, এখন ঠিক মনে পড়ছে না.... আছে সত্যি?

একটা শ্বাস ফেলে প্রশান্ত বলল, হ্যাঁ।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা রাস্তার বাঁকে এসে গিয়েছিল। পাকা রাস্তাটা এখান থেকে সোজা গিয়ে কয়েক কিলোমিটার দূরে হাইওয়ের সঙ্গে মিশেছে। বাঁ দিকের ইট বিছানো রাস্তায় নেমে এল দু'জনে। কাল রাতে এই রাস্তাটা দিয়েই ঢুকেছিল দেবযানী। ইটের আস্তরণ এখানে-ওখানে উঠে গিয়ে কাদা জমে আছে। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই দেবযানীর। দীর্ঘ গভীর কয়েকটা টান দিয়ে সিগারেটটা রাস্তার পাশে ঝোপে ছুঁড়ে দিল প্রশান্ত। সেখানে তারস্বরে ঝিঁঝি ডাকছিল। পকেট থেকে ছোট টর্চ বার করে পথের ওপর আলো ফেলল সে। গা সিরসির করছিল দেবযানীর। বহুকালের জমে থাকা ক্রোধ আর গ্লানি সব ধুয়েমুছে ভেতরটা যেন পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন এক ধরনের

অন্ধকার অনুভব ছাড়া আর কিছু নেই সেখানে।

অথচ কাল দুপুরে যখন সে গাড়ি নিয়ে বেরয় তখন কেমন জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল ভিতরটা। খড়্গপুরে আই আই টি-র হস্টেল থেকে টুপু ফিরেছে আগের দিন সন্ধেবেলায়। দু দিনের ছুটি। কিসের ছুটি ও-ই জানে। আজকাল দেবযানী জিজ্ঞেসও করে না ছেলেকে। ঘর থেকে বেরবার সময় শুধু বলেছিল, আমি বেরচ্ছি।

স্টার প্লাস-এ কী একটা প্রোগ্রাম দেখছিল টুপু, টিভির স্ক্রিন থেকে চোখ না সরিয়েই বলেছিল, কখন ফিরবে?

প্রশ্নটায় উত্তরের জন্য কোনও আগ্রহ ছিল না। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে দেবযানী বলেছিল, আজ ফিরব না। দু-চারদিন দেরি হবে।

তখন ঘাড় ঘুরিয়ে অদ্ভুত শীতল এক দৃষ্টিতে মাকে দেখেছিল টুপু। এরকম যে আগে দু-একবার হয়নি তা নয়, বাবার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে একবার মা চলে গিয়েছিল লালগোলা প্যাসেঞ্জার ধরে বহরমপুর। মাসির বাড়ি। টুপুর সেবার ক্লাস ফাইভ, সামনে পরীক্ষা। বাবাও ইলেকশন নিয়ে ব্যস্ত, পরদিনই সি.এম-এর সঙ্গে তার নির্বাচনী কেন্দ্রে যাবার কথা। সি.এম-এর থার্ড টার্ম ছিল বোধহয় সেটা। টানা পনেরো দিন ধরে ক্যাম্পেন সেরে এসে মায়ের খোঁজ করার সময় পেয়েছিল বাবা সেবার। স্কুল থেকে ফিরে এক দিন টুপু দেখেছিল মা ফিরে এসেছে। চোখ দুটি ফোলা, ডান হাতের কনুইয়ের কাছে লম্বা কালসিটে দাগ। টুপু সেদিন বুঝতে পারেনি, কিন্তু এখন সে জানে কিসের দাগ ছিল সেটা।

টুপুকে ওরকমভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে দেবযানী বলেছিল, তোমার বাবা যদি এর মধ্যে দিল্লি থেকে ফিরে আসেন তাকে বল, আমি বাইরে গেছি কদিনের জন্যে। খোঁজখবর করতে বারণ করো। কোনও অ্যাড্রেস রেখে যাচ্ছি না, প্রয়োজন নেই বলে। সুশীলা রইল। তাছাড়া ড্রাইভার দারোয়ান দুজনেই থাকছে।

তারপর আর ছেলের মুখের দিকে ফিরে তাকায়নি সে। গাড়ি বার করেছে, তখনও আকাশ মেঘলা। দুপুর দুটোয় বিদ্যাসাগর সেতুর ওপরে হালকা বৃষ্টির ছোঁওয়া পেয়েছিল উইন্ডস্ক্রিনে। ঝাপসা একটা নদী। সেতু থেকে নেমে চলন্ত ওয়াইপারের ফাঁকে একটা শহর। ম্লান, মূক, সমস্ত শরীরে ক্ষত।

উৎপলের ফোনটা এসেছিল খুব ভোরে। তখনও মেঘচাপা আকাশে ভাল করে আলো ফোটেনি। হাত বাড়িয়ে বেডসাইড টেবিল থেকে কর্ডলেস ফোনটা তুলতে ইচ্ছে করেই একটু সময় নিয়েছিল দেবযানী।

একটা হাই তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওপার থেকে উৎপলের অহংকারী ক্রুদ্ধ গলা পেয়েছিল, কী ব্যাপার? এখনও ঘুমচ্ছ?

দেবযানী চুপ করে আছে দেখে উৎপল তখন সরাসরি প্রসঙ্গে চলে যায়, শোনো, দু-একদিনের মধ্যেই ফিরব ভেবেছিলাম। হচ্ছে না।

ঘুমচোখে দেবযানী বলেছিল, কেন? দিল্লিতে কী এত কাজ পড়ল হঠাৎ?

কী কাজ মানে? কাগজ দেখনি? রাতের ন্যাশানাল নিউজটাও শোনোনি?

কী হল আবার ওখানে?

মিনিস্ট্রি বোধহয় পড়ে যাচ্ছে। আমাদের একটা মিটিং আছে আজ রাতে।

তার জন্যে তুমি আসতে পারছ না কেন?

স্টুপিড! জরুরি মিটিং বলছি না। কলকাতা থেকে সি.এম-ও আসছেন, তাকে রিসিভ করতে ছুটতে হবে একটু পরে।

তারপর আরও অনেকক্ষণ কথা বলেছে উৎপল, নানা রকমের নির্দেশ। কিন্তু কোনও কথাই আর কানে ঢোকেনি দেবযানীর। ওই 'স্টুপিড' শব্দটাই তার মাথার ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে তখন। সত্যিই স্টুপিড সে! নইলে এতদিন আছে কী করে লোকটার সঙ্গে?

রাস্তাটায় আলো নেই। একটা ঝোপের কাছে জোনাকির ওড়াউড়ি দেখে দেবযানী দাঁড়িয়ে পড়ল। ঠাণ্ডা চোরা একটা হাওয়ার পরশ পেয়ে প্রশান্ত টের পেল এক্ষুনি বড় বড় ফোঁটায় নামবে। দেবযানী টের পাচ্ছে না, পাওয়ার কথাও নয়। জোনাকি দেখছিল সে মন দিয়ে। দূরে কোথাও প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশের প্রান্তে নিঃশব্দ কয়েকটা ঝিলিক দেখতে পেল প্রশান্ত। নিচু হয়ে আসছে মেঘ।

প্রশান্ত চেঁচাল, দেবী, পা চালা শিগগির! এসে পড়ল!

ফিসফিস করে, যেন অনেকটা আপনমনেই, দেবযানী বলল, আসুক!

দুই

নীচের কিচেনে বোধহয় চিকেন হচ্ছে, সিঁড়ি ঘুরে গন্ধটা ওপরেও উঠে আসছে। একটা শ্বাস ফেলে দেবযানী বলল, তোর বউটা খুব ভাল রে, প্রশান্ত!

দোতলার বারান্দায় বেতের চেয়ারে পাশাপাশি বসে আছে দু'জনে। চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে প্রশান্ত দৃষ্টিকে স্থির রেখেছে দূরে কোথায়। পা দুটি নিচু মোড়ার ওপর তোলা, পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করেছিল একটু আগে, ধরানো হয়নি এখনও। প্যাকেটসহ হাতটা চেয়ারের হাতল থেকে ঝুলে আছে।

বুকের খুব গভীরে সূক্ষ্ম একটা বেদনা অনুভব করছিল প্রশান্ত, সেটাকে সামাল দিতে একটু সময় নিল সে, তারপর চোখ না ফিরিয়েই বলল, হ্যাঁ। অনেক দুঃখকষ্ট গেছে ওর জীবনে। প্রথম বিয়েটা টেকেনি। দেখেশুনেই বিয়ে দিয়েছিল ওর বাবা, তখন হায়ার সেকেন্ডারিও পাস করেনি। ছেলেটা চাকরি করত দুর্গাপুরে। বছর দেড়েকের মাথায় কচি ওই বাচ্চাটাকে নিয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছিল প্রীতি।

তিতু, তিতু তাহলে প্রশান্তর কেউ নয়? তথ্যটা ওই প্রথম জানল দেবযানী। পরশু রাতে প্রীতির আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে থাকা তিতুর ফরসা গোলগাল মুখখানা চকিতে একবার দেখতে পেল যেন সে। বড় বড় চোখ দুটিতে কৌতূহল। বিস্ময়ভরা গলায় দেবযানী বলল, কেন? তুই জিজ্ঞেস করিসনি ওকে কিছু কোনওদিন?

ঠাণ্ডা গলায় প্রশান্ত বলল, নাহ্। ও অবশ্য বলতে চেয়েছিল গল্পটা, আমিই শুনতে চাইনি ইচ্ছে করে। যদ্দুর মনে হয় ঘনিষ্ঠ কোনও আত্মীয়ার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল ছেলেটা। ইনসেস্ট।

কী ভেবে দেবযানী বলল, এই যে আমি হঠাৎ করে এসে উপস্থিত হয়েছি, প্রীতি তোর কাছে জানতে চাইল না আমি কে, কেন এলাম? ওর কথা শুনে অবশ্য মনে হচ্ছিল আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই বলেছিস তুই ওকে!

বলে বাঁকা চোখে প্রশান্তর দিকে তাকিয়েছে দেবযানী। পকেট হাতড়ে লাইটার বার করে সিগারেট ধরাল প্রশান্ত, দীর্ঘ একটা টান দিয়ে চুপ করে রইল খানিকক্ষণ, তারপর চাপা গলায় বলল, ও খুব সরল সাদাসিধে, ওর কাছে কিছুই লুকোইনি আমি! সব বলেছি ওকে। সেই যে গঙ্গার ধারে জীবনে প্রথম চুমু খেয়েছিলাম তোকে, তা-ও!

প্রায় শিউরে উঠে দেবযানী বলল, ছিঃ!

যেন দেবযানীর মুখে ওই একরত্তি শব্দটা শোনবার জন্যে বহুকাল প্রতীক্ষায় ছিল প্রশান্ত, ভিতরে খুব গভীরে কোথাও অপরূপ একটা আরাম পেল সে। চকিতে ফিরে তাকিয়ে দেখল দেবযানীর মুখ পলকের জন্যে বুঝি একটু লাল হয়ে উঠেছে। দৃষ্টিকে আবার ঘুরিয়ে নিল সে ছড়ানো-ছিটানো বাড়িঘর। দূরের আকাশে মেঘের ফাটল থেকে নীল উঁকি দিচ্ছে। বৃষ্টিও নেই। কমপাউন্ড ওয়াল দিয়ে ঘেরা প্রশান্তর এই ঝকঝকে দোতলা বাড়িটাই বরং এই বাইরের দিকে। বাইরে অবশ্য এখন এই বেলা দশটায় দেখবার কিছুই নেই। বাড়ির সামনে দিয়ে পিচরাস্তা হাইওয়ের দিকে ছুটে গেছে উত্তরে। হতদরিদ্র মানুষের

গঞ্জমতো জায়গায় একটা দর্শনীয় জিনিস। কলেজ মাস্টারদের মাইনে যতই বাড়ুক না কেন তা দিয়ে এ রকম প্রাসাদ হয় না। প্রচুর পাঠ্যবই নোটবই লেখা হয়ে গেছে প্রশান্তর। সে সবের আয় থেকে একটা লংরুটের বাস নামিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। বছর দুয়েকের মাথায় আরও একখানা। তারপর পেট্রোল পাম্প, হাই রোডের ওপর। এসবের মূলে আছে পরিশ্রম। চিন্তা। উদ্যম। আর পার্টি। প্রশান্ত জানে।

চেয়ার ঠেলে উঠে প্রায় নিঃশব্দে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিল দেবযানী। প্রশান্ত ফিরেও তাকাল না। পরশু রাতে এখানে এসে পৌঁছনোর পর প্রশান্ত এবং প্রীতির সব আপত্তি অগ্রাহ্য করে নীচের গেস্টরুমটাতেই থেকেছে দেবযানী। খাবার টেবিলে বারবার প্রীতি বলছিল, ওপরেই তো আমাদের দুটো ঘর ফাঁকা পড়ে আছে! তা ছাড়া নীচেটায় অনেকদিন কেউ থাকে না, রায়গঞ্জ থেকে ওর বাবা-মা কখনও এলে ওটা খোলা হয়। বুড়ো মানুষ ওপর-নীচে করতে কষ্ট হবে বলে ওই ব্যবস্থা করা আছে। রাতে একা ওখানে যদি ভয় পান?

শুনে হেসেছিল দেবযানী, ভয়? ভূতের? কী যে বল তুমি?

তখন তো দেবযানী জানত না তার সম্পর্কে ঠিক কতটুকু জানে প্রীতি। আজও সকালবেলায় শব্দ পেয়ে দরজা খুলতেই দেখেছিল ট্রেতে চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রীতি। ঝিরিঝিরি বৃষ্টির শব্দ পাচ্ছিল বাইরে, ঘড়ি না দেখলে বুঝতেই পারত না আটটা বেজে গেছে কখন।

ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম তো? বলে মিষ্টি করে হেসেছিল প্রীতি।

না, না, এখন তো অনেক বেলা হয়ে গেছে।

কলকাতার লোকেরা অনেক বেলা করে ঘুম থেকে ওঠে, আমি জানি। কী করব, ও বলছিল এখানকার রাজবাড়িটা আপনাকে দেখাতে নিয়ে যাবে। ওই তো পাঠাল।

এই বৃষ্টিতে? তোমার বরটা এখনও পাগল আছে!

বাঃ, গাড়ি করেই তো যাবেন! আপনি খুব ভাল গাড়ি চালাতে পারেন।

কে বলেছে তোমাকে?

ও আমাকে সব বলেছে!

'সব' বলার অর্থটা এই মাত্র বুঝতে পেরেছে দেবযানী। পরশু রাতে নীচের খোলা গ্যারেজে সেই যে গাড়িটাকে ঢুকিয়েছে তারপর আর খোঁজখবর করেনি। এত দীর্ঘ পথ আসায় জলে কাদায় নিশ্চয়ই বিশ্রী অবস্থা হয়ে আছে ওটার। প্রশান্তকে বললেই একটা ব্যবস্থা হতে পারে, কিন্তু তাকে কথাটা বলতে আর ইচ্ছে করছে না। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামছিল দেবযানী।

দেবযানীর বিলীয়মান পায়ের শব্দটা বুঝি শুনতে পাচ্ছিল প্রশান্ত। একটু বেশি বয়সেই বিয়ে করেছে সে। পাস করার পর কিছুদিন একটা স্কুলে কাজ করেছিল হাওড়ায়। এখানকার কলেজে পাকা চাকরিতে জয়েন করেছে বছর পনেরো হবে। বিয়ের কোনও পরিকল্পনাই ছিল না তখন। প্রাইভেট পড়াতে গিয়ে কী করে যেন জড়িয়ে গেল সে এই মেয়েটার সঙ্গে। প্রীতি তখনও ডিভোর্স পায়নি। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছিল সে নতুন করে। প্রশান্তর থেকে অন্তত পনেরো বছরের ছোট হবে প্রীতি।

ডিভোর্স পাওয়ার পর প্রশান্ত আর দেরি করতে চায়নি। তবে বয়স নিয়ে মনে একটা খচখচি ছিল। কাগজে সই করে বিয়ে, তবু ফুলশয্যা হয়েছিল। ফুলশয্যার রাতে প্রশান্ত একেবারে সিনেমার ঢঙে প্রীতির মুখখানা দু হাতের অঞ্জলিতে তুলে ধরে বলেছিল, এই বুড়ো বর তোমার পছন্দ হয়েছে?

ঘাড় কাত করে সারা দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত মুখখানা নামিয়ে নিয়েছিল প্রীতি। বিছানায় ঘুমে অচেতন শিশুটিও ছিল। প্রীতির চোখের কোণে টলটল করছিল জল। আজ প্রশান্ত জানে সেই অশ্রু কৃতজ্ঞতার ছিল না, ছিল ভয়ের। অন্য এক জীবনের ভয়।

না, দেবযানীর কথা মনে হয়নি সেদিন তার। একবারও না। এম এ পরীক্ষার পরপরই পার্টির প্রথম সারির নেতা উৎপল সেনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল দেবযানীর। প্রশান্ত তখন রায়গঞ্জে। খবরটা পেয়ে প্রবল এক ধাক্কায় প্রায় চেতনাহীন ছিল সে কটা দিন। তারপর ধীরে সইয়ে নিয়েছে, যেমন সবাই নেয়।

পরশু রাতে ঘোর বৃষ্টির মধ্যে দেবযানীর গাড়ির হর্নের শব্দে নীচে নেমে এসে দরজা খুলে প্রশান্ত বুঝেছিল, না, তার ধারণাটা ভুলই। দেবযানীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা ছিঁড়ে যায়নি এখনও।

খোলা গেট দিয়ে গাড়িটা ঢুকছে তখন। গাড়ির দরজা খুলে বারান্দা পর্যন্ত ছুটে আসতে আসতেই পরিপূর্ণ ভিজে গিয়েছিল দেবযানী। চশমা খুলে আঁচলে কাচ মুছতে মুছতে বলেছিল সে, চিনতে পারছিস?

অবিশ্বাস্য এই ঘটনায় প্রশান্ত প্রায় কাঁপছিল থরথর করে। দেবযানী! দেবী। এত দিন পর! চোখের চশমা ছাড়া দেবী পাল্টায়নি একটুও।

ওপর থেকে কৌতূহলবশে নেমে এসে সিঁড়ির কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল প্রীতি, তার আঁচল ধরে তিতু।

প্রায় যেন ফিসফিস করেই বলেছিল প্রশান্ত, দেবী!

দেবযানী শুনতে পায়নি। আর তখনই সিঁড়ির কাছ থেকে প্রায় ছুটে এসে তার হাত দুটি ধরে প্রীতি বলেছিল, দেবযানীদি? ঠিক বলেছি?

প্রায় বালিকার মতো সরল বউটির হাতের উষ্ণতা অনুভব করতে করতে দেবযানী বলেছিল, আমাকে চিনলে কী করে? বর বলেছে বুঝি?

আপনার কথা ও এত বলেছে, শুনতে শুনতেই চেনা হয়ে গেছে।

বলে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে ফেলেছিল প্রীতি। ছেলেকে বলেছিল, তিতু, শিগগির এসে প্রণাম করো। পিসি।

বছর পাঁচেকের বাচ্চাটা ছুটে এসে প্রণাম করে পালিয়ে গেল কোথায়।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পরশু রাতের দৃশ্যটা ফিরে একবার দেখতে পেল দেবযানী। মনে পড়ল, বাচ্চাটার জন্যে কিছু আনাও হয়নি। আসলে কাপড়-চোপড়ও খুব একটা গুছিয়ে আনতে পারেনি। হাতের কাছে যা ছিল সে সবই ঢুকিয়েছে ছোট স্যুটকেসে। টুকিটাকি ওষুধপত্র। অ্যালজোলাম আর ইভালন!

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে একতলায় রান্নাঘরের চৌকাঠে দাঁড়াল দেবযানী। এদিকে পেছন ফিরে আছে প্রীতি। চিকেন নামিয়ে একটা বড় বাটিতে ইলিশমাছে নুনহলুদ মাখাচ্ছিল। হঠাৎ কী ভেবে মুখ ফেরাতেই দেবযানীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। প্রীতির চোখের মণিদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে হাসিতে, বলল, রাজবাড়ি দেখতে বেরোলেন না?

তোমার রান্নার এত সুগন্ধ বেরিয়েছে, এসব ভাল ভাল জিনিস ছেড়ে এখন কি আর রাজবাড়ি দেখতে ইচ্ছে হবে কারও? আমি তো থাকতে না পেরে নীচে নেমে এলাম! বাইরে বেরোনোর প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে ঠোঁট উল্টে দেবযানী বলল।

প্রায় বালিকার মতো খিল খিল করে হেসে উঠে প্রীতি বলল, আপনার বন্ধু কিন্তু কখনও প্রশংসা করে না আমার রান্নার!

'আপনার বন্ধু' কথাটা কেমন করে যেন বলল প্রীতি। চমকে উঠে দেবযানী প্রীতির বড় টানা চোখ দুটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল একবার। চোখের গভীরে যতটা সম্ভব দেখে নিয়ে বুঝল কথাটায় ঘোরপ্যাঁচ কিছু নেই। প্রীতি হাসছিল। নিষ্পাপ সরল হাসি। দেবযানীর বুকের ভিতরটা হঠাৎ টনটন করে উঠল কেমন। খুঁজে খুঁজে ঠিক বার করেছে প্রশান্ত ফুলের মতো ওই মেয়েটিকে! ওর দৃষ্টির ভিতরে বিষাদের একটা ছায়াও আছে বুঝি।

একটু চুপ করে থেকে কী ভেবে প্রীতি বলল, এত দেরিই যখন হয়ে গেল, খেয়েদেয়ে ও বেলায় না হয় যাবেন রাজবাড়ি দেখতে। বিকেলে মনে হয় বৃষ্টি হবে না আজ।

তিন

প্রীতির কথাই ঠিক হল।

বিকেলে বৃষ্টি হল না। দুপুরে খেয়েদেয়ে একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে গাঢ় ঘুমের ভিতরে চলে গিয়েছিল দেবযানী। দরজা ভেজিয়ে জানালার পরদা টেনে ঘরটাকে অন্ধকার করে নিয়েছিল শোবার আগে। তারপরই দীর্ঘ ওই ঘুম।

দেবী! দেবী!

যেন ঘুমের ভিতরেই ডাকটা শুনছিল সে। ধড়ফড় করে উঠে বসে দেখল একেবারে শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে আছে প্রশান্ত।

কলকাতায় রোজ দুপুরে এ রকম ঘুমস নাকি?

বলে ঘরের প্রায়ান্ধকারে দুষ্টু দুষ্টু হাসছিল প্রশান্ত। চমৎকার দুপাটি দাঁতের ঝিকিমিকি দেখতে দেখতে দেবযানীর মনে পড়ল তার গোড়ার দিকে দুটো দাঁত ফেলতে হয়েছে কিছুদিন আগে, ওপরে বাঁ দিকে একটা রুটক্যানাল করা আছে। সামনের ওপরের দাঁতটাই জ্যাকেট বাঁধানো। গত দশ বছরে একে একে এই সব হয়েছে। মুগ্ধ চোখে প্রশান্তর হাসিটা দেখতে দেখতে দেবযানী উঠল।

প্রশান্ত হাত বাড়িয়ে দেবযানীর একটা হাত ধরতে যাচ্ছিল, ঝট করে একটু সরে গিয়ে ফিস ফিস করে দেবযানী বলল, তোর তো সাহস কম নয় দেখছি! বাড়িতে বউ রয়েছে ...

দেবযানীর গলায় একটু প্রশ্রয়ের আভাস পেয়ে প্রশান্ত বলল, দুর, ও খুব সরল, ওর মাথায় এসব আসবেই না!

তীব্র এক দৃষ্টিতে প্রশান্তর চোখে চোখ রেখে দেবযানী বলল, তোর লজ্জা করল না কথাটা বলতে? বয়সে এত ছোট নিষ্পাপ একটা মেয়ের জীবন নিয়ে খেলা করতে তোর বাঁধল না?

প্রায় মিইয়ে যেতে যেতে প্রশান্ত বলল, আমার আর কীইবা করার ছিল, দেবী! তুই-ই বল!

জানালার পরদা সরিয়ে দিল দেবযানী। আর অমনি ভরা বিকেলের সব আলো যেন লাফ দিয়ে ঢুকল ঘরে। খোঁপা করতে করতে সে টের পেল প্রশান্তর গলায় যে কাতরতা ফুটে উঠেছিল তা একটা দমকা হাওয়ার মতো তার শরীরের ভেতর দিয়ে বইছে এখন। না, প্রশান্তর সব ভালবাসা মরে যায়নি এখনও। কিন্তু দুই যুগ আগেকার দেবযানী আর এই দেবযানী আক্ষরিক অর্থেই এক নয়, জানে প্রশান্ত? দু মাস আগে তার হিসটেরেকটমি হয়ে গেছে। জরায়ু ওভারি সব কেটে বাদ দিয়েছে ডাক্তার। ইভালন নামের স্ত্রী হরমোনের ট্যাবলেট খেতে হয় রোজ তাকে। আর ঘুমের জন্যে অ্যালজোলাম। ইভালন আর অ্যালজোলাম। অ্যালজোলাম আর ইভালন। এই তো দেবযানী! কিন্তু এখন এই যে গাঢ় ভালবাসার কথাগুলো শুনে সিরসির করে উঠছে সমস্ত শরীর, প্রশান্তকে শরীরের স্পর্শটুকুও দিতে পারছে না বলে একটু বেদনা কি বোধ করছে না সে বুকের গভীরে? অপরূপ এক মায়ায় ভিজে যাচ্ছে না ভিতরটা? আহা, যদি বলতে পারত দেবযানী মুখ ফুটে, তুই আমাকে ভালবাস, আরও গভীর করে ভালবাস, প্রশান্ত! আরও অনেক দিন তা হলে আমি ওই ভালবাসার জ্বলুনি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারি! আমার এখনও সেই মনটা আছে, প্রশান্ত! তবে শরীর বলতে আর কিছু নেই রে!

খাটের কোনায় বসেছে প্রশান্ত। মুখখানা বিষাদগ্রস্ত। আড়চোখে দেখল একবার দেবযানী। তারপর ঘরের ভেতরে বহমান আলোর দিকে তাকিয়ে রইল সে। প্লাবনের মতো ওই আলো যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে দুজনকেই।

দিদি, আপনারা কখন বেরোবেন? চা হয়ে গেছে কিন্তু! প্রীতি বলল। পরদার ওপার থেকে কথাটা বলে আবার ফিরে যাচ্ছিল। নিঃশব্দে কখন এসেছে দুজনের কেউ টের পায়নি।

দরজার দিকে চমকে ফিরে তাকিয়েছে দেবযানী, একটু অস্বস্তির মধ্যে সে বলল, কী রে, বেরোবি না? রাজবাড়িটা দেখিয়ে আনবি বলেছিলি?

একটা শ্বাস ফেলে প্রশান্ত বলল, রেডি হয়ে আয়। চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব।

চটপট রেডি হয়ে নিয়ে চা দু-তিন চুমুকে শেষ করে বেরোবার মুখে দেবযানী খেয়াল করে দেখল গ্যারেজটা খোলা, শাটার নেই। আয়তনেও বেশ বড়। তার ভেতরে ধুলোকাদায় ধুসর ছোট্ট লাল গাড়িটাকে দেখে মায়াই হচ্ছিল দেবযানীর। চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দিতে গিয়ে ফুয়েল কাঁটায় চোখ পড়ল। পেট্রোল ফুরিয়ে এসেছে। কলকাতা থেকে বেরোবার সময় ট্যাংক ফুল আছে কিনা সেটা লক্ষ করবার মতো মনের অবস্থা ছিল না।

ব্যাক গিয়ারে রেখেই গাড়িটাকে খোলা গেট দিয়ে রাস্তার ওপরে নিয়ে এল দেবযানী। প্রশান্ত এসে পাশে বসতেই ফ্রন্ট গিয়ারে পড়ল গাড়ি।

হাইওয়ের পেট্রোল পাম্পে এসে ট্যাংক ফুল করে নিল সে। ওই হাইওয়ে ধরে কিছুটা যেতে একটা বাজার মতো জায়গা পড়ল। সেটা পেরিয়ে প্রশান্তর নির্দেশে বাঁ দিকের কাঁচা রাস্তায় নামল গাড়ি। দুধারে সব হতদরিদ্র ছিটেবেড়ার ঘর। ঘন ঝোপঝাড়, পুকুর ডোবা। হাঁ করে দাঁড়িয়ে নগ্ন শিশুদের দঙ্গল। সে সব পেরিয়ে বিশাল একটা স্ট্রাকচারের সামনে এসে হতভম্ব হয়ে গাড়িটাকে দাঁড় করাল দেবযানী। 'স্ট্রাকচার' শব্দটাই মাথায় এল তার, কারণ 'রাজবাড়ি' বললে যে পূর্ণ অবয়বের কথা মনে আসে এখানে তা অনুপস্থিত। বিশাল বিশাল সব স্তম্ভ উঠে গেছে আকাশের দিকে, সামনের দিকটায় ছাদও নেই। চারদিকে স্তূপীকৃত প্রাচীন ইট। ধ্বংসস্তূপই বটে, খণ্ডহর!

সামনের মাঠটা ছোট। একফালি। দক্ষিণে বোধহয় একটা পুকুর আছে পুবমুখো বাড়িটার। হ্যাঁ, পুকুরই। দেবযানী ঘাড় উঁচু করে দেখল। মাঠের ঠিক মাঝখানে গাড়িটাকে রেখেছে সে, দুজনেই গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রশান্ত বলল, পলাশির যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলা পরাজিত হবার পর তার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু নাকি নবাবের অরক্ষিত ভাণ্ডার থেকে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে পালিয়ে আসছিল নৌকো করে। শোনা যায় কলকাতার কাছাকাছি এসে ডাকাতের তাড়া খেয়ে লোকলস্কর সহ সে সরস্বতী নদীতে ঢুকে পড়েছিল। তারপর নৌকো ভিড়িয়ে এখানে বসতি করে। ক্লাইভও নাকি এসেছে অনেকবার এই রাজবাড়িতে।

ইতিহাস! ইতিহাস! সমস্ত শরীর কেমন সিরসির করে উঠল দেবযানীর। ফিসফিস করে সে বলল, ভেতরটা দেখা যাবে না?

প্রশান্ত বলল, না।

হাত বাড়িয়ে দেবযানীর একটা হাত ধরল প্রশান্ত। কাঠের পুতুলের মতো ওই নিষ্প্রাণ শীতল হাত প্রশান্তর হাতের তাপে পুড়ে যাচ্ছিল প্রায়। তবু বাধা দিল না সে।

চার

রাতে দোতলার ডাইনিং টেবিলে প্রীতি বলল, কেমন দেখলেন রাজবাড়ি? বললেন না তো কিছু?

ম্লান হেসে দেবযানী বলল, ভালই তো। অনেক প্রাচীন।

ও তো বলে সিরাজ-উদ-দৌলার কোন বন্ধু নাকি ওটা তৈরি করিয়েছিল।

অন্যমনস্ক দেবযানী বলল, হতে পারে। ইতিহাসে কত কি আছে!

প্রশান্ত নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছিল। ফেরার সময় গাড়িতে একটাও কথা বলেনি সে। দেবযানী টের পেল অকারণ এক অপরাধবোধে সমস্ত খাবার বিস্বাদ হয়ে উঠছে ধীরে। প্রীতি নীচের কিচেনে কী আনতে গেছে। সেই ফাঁকে উঠে পড়ল সে। হালকা গোলাপি রঙের অ্যালজোলাম তাকে ডাকছে। পয়েন্ট ফাইভ

মিলিগ্রাম। একটা ঘুম চায় সে এখন, নীরন্ধ্র এক ঘুম।

বেসিনে হাত ধুয়ে ধবধবে সাদা টাওয়েলে হাত মুছতে গিয়ে সামনের আয়নায় চকিতে একবার নিজের মুখখানা দেখল দেবযানী। উৎপল নিশ্চয়ই এর মধ্যে অজস্রবার ফোন করেছে বাড়িতে। হঠাৎ সে উধাও হয়ে গেছে শুনে দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত করে আছে। তবে পুলিশে খবর দেবে না সে, দেবযানী জানে। তাতে রাজনৈতিক অসুবিধে আছে। বাড়িতে ফিরে গেলেই হিংস্র শ্বাপদের মতো মুখ করে চেঁচাবে, কার সঙ্গে গিয়েছিলে? কোথাকার! এরপর ঘরে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখব!

এবার কিছুতেই মুখ খুলবে না দেবযানী। যতই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক উৎপল, কিছুতেই বলবে না কোথায় লুকিয়ে ছিল সে এই কটা দিন। দেবযানীর নিজের গোপন সঞ্চয় হয়ে থাকবে এই সব দিনরাত। চুল ধরে টেনে নিয়ে বিছানায় ফেলবে তাকে উৎপল। ফেলুক। বেল্ট দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে মারবে। মারুক। বলবে না।

ঘরে এসে আলো জ্বেলে দেবযানী দেখল বেডসাইড টেবিলে জলের জাগ আর গ্লাস কখন এক ফাঁকে রেখে গেছে প্রীতি। গ্লাসে জল ঢালল সে। তারপর ব্যাগ থেকে অ্যালজোলাম আর ইভালন বার করে টুক করে গিলে ফেলল। জানালা বন্ধ। পরদা সরিয়ে জানালার কাচের ওপারে চোরা বিদ্যুতের আলোয় নিচু হয়ে আসা মেঘ দেখছিল সে। বৃষ্টি আসছে। আর আসছে ঘুম।

মাঝরাতে অদ্ভুত এক স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল দেবযানীর। কখন বিছানায় এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল, দরজা বন্ধ করার কথাও মনে ছিল না। বারান্দার ভিজে হাওয়া খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ছিল। পতপত শব্দে পরদাটা উড়ছে। বাইরে বুঝি মিহি বৃষ্টি চলছে, আর শোঁ শোঁ হাওয়া। বিদ্যুতের চকিত আলোয় দেখল ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে প্রশান্ত। চশমা হাতড়াচ্ছিল দেবযানী।

বজ্রপাতের প্রবল শব্দে কী একটা ভেঙে পড়ল কোথায়। ঘুম ছুটে গেছে তার, বেডস্যুইচ টিপে আলো জ্বেলে এক লাফে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। তারপর সাপের মতো হিস হিস করে বলল, এত রাতে এ ঘরে এলি তুই?

সমস্ত শরীর কাঠের মতো শক্ত হয়ে এসেছে দেবযানীর। প্রশান্ত বুঝি থরথর করে কাঁপছিল, জড়ানো গলায় বলল, তোকে ছাড়া এতদিন আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি সে কথা তোর মনে হয়নি একবারও?

এতক্ষণে প্রশান্তর মুখ থেকে ঝাঁঝালো গন্ধটা পেল দেবযানী, ঘৃণায় উপচে ওঠা গলায় বলল, তুই মদ খেয়েছিস? এত রাতে মদ খেয়ে তুই আমার ঘরে এলি? বেরিয়ে যা এখান থেকে?

প্রাণপণে কণ্ঠকে সংযত রাখার চেষ্টা করছিল, দেবযানী। প্রশান্ত শুনছে না কিছুই, বিছানায় ধপ করে বসে পড়ে সে বলল, দেবী! তোকে আমি চাই! তোকে ছাড়া আমি আর বাঁচতে চাই না!

প্রশান্ত কি তার শরীরই চাইছে এতদিন পর? দেবযানীর মনে হল শরীর বলতে তার যেন আর কিছু অবশিষ্ট নেই এখন। অদ্ভুত এক ভয়ে গুটিয়ে যেতে যেতে সে বলল, এসব গেঁয়ো কথাবার্তা শুনতে আমার আর ভাল লাগছে না, প্রশান্ত। তুই যাবি, না তোর বউকে ডাকব?

পাগলের মতো হেঁচকি তুলে একটু হাসল প্রশান্ত, ঘন ঘন কয়েকটা শ্বাস নিয়ে বলল, বউ? বউ নয়, ও আমার পুতুল! ও জানে তোকে ছাড়া আমি বাঁচব না!

তোকে দেখে আমার ঘেন্না হচ্ছে, প্রশান্ত!

ঘেন্না কর। আমি তো ঘেন্নারই যোগ্য!

প্রশান্তর গলা ভেঙে এসেছে। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে সে। কাঁদছে বোধহয়। চোখের ঝুলে পড়া চশমা ঠিক করে নিয়ে এরপর কী কী করা উচিত ভাবছিল দেবযানী। তারপর কী ভেবে খাটের নিচ থেকে স্যুটকেসটা বার করে দ্রুত হাতে হাতের কাছে টুকিটাকি যা ছিল সব ঢুকিয়ে নিল তাতে। চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে স্যুটকেস হাতে প্রায় ছুটে ওপরে উঠে এল সে। প্রশান্তর বেডরুমের দরজায় নক করতেই প্রীতির গলা পেল, কে? দিদি?

দেবযানীর মনে হল যেন তার আসবার অপেক্ষাতেই ছিল প্রীতি এতক্ষণ, কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বলল, আমি চলে যাচ্ছি, প্রীতি। তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়ে গেলাম। গ্রিলের তালাটা খুলে দেবে?

এভাবেই এই দুর্যোগের মধ্যে দেবযানীকে চলে যেতে হবে তাও যেন জানে প্রীতি। প্রায় যান্ত্রিক পুতুলের মতোই চাবি নিয়ে বেরোল সে। দেবযানীর পেছন পেছন সিঁড়ি দিয়ে নামছিল।

বারান্দায় বৃষ্টির ছাট আসছিল। তালা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে প্রীতি। ছুটে বাইরের গেট খুলতে গিয়ে আমূল ভিজে গেল দেবযানী। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই।

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করার সময় দেবযানী দেখল এখন আর বৃষ্টির ফোঁটা বলতে কিছু নেই, ধারায় জল নামছে আকাশ থেকে। গাড়ি ব্যাক করাবার সময় হেডলাইটের আলোয় এক ঝলক দেখতে পেল, প্রীতি তখনও পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। ওয়াইপার চলছে, তবু বৃষ্টির এক ধূসর প্রাচীর সামনে। দেবযানী আর পেছনে তাকাল না।

ঘরে এসে প্রীতি দেখল প্রশান্ত চিত হয়ে শুয়ে আছে। চোখ দুটি খোলা। শিয়রের কাছে বসতেই কী এক ঘোরের ভেতর থেকে প্রশান্ত বলল, কে? দেবী?

ম্লান হেসে প্রীতি বলল, দিদি চলে গেলেন এক্ষুনি।

মানে?

তোমার সঙ্গে কী হয়েছে আমি কী করে বলব?

আমার সঙ্গে? কই কিছু হয়নি তো!

ভয়ঙ্কর শব্দে বাজ পড়ল কাছেই কোথায়। ঝড়ো হাওয়া এসে কাচের শার্সিতে ছোবল মেরে যাচ্ছিল। তিনতলার সিঁড়িঘরে ঝনঝন শব্দে কাচই ভেঙে পড়ল বোধহয়।

নেশা ছেড়ে যাচ্ছিল প্রশান্তর, বিছানায় উঠে বসল সে। অসম্ভব এক ক্রোধ ফণা তুলছে ভিতরে, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছিল। দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল সে। প্রশান্তকে হিমশীতল এক দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে শান্ত গলায় প্রীতি বলল, এই দুর্যোগের মধ্যে গেল, কিছু একটা হলে ...।

যেন এই একটা কথার জন্যেই অপেক্ষা করেছিল প্রশান্ত, কান্নাভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে, বেশ হয়েছে! মরুক, মরে যাক ও! সারা জীবন ধরে তিলে তিলে দগ্ধে মেরেছে আমাকে, আমার কষ্ট দেখতে ও এসেছিল এখানে! আমাকে বোকা ভেবেছে, যেন আমি বুঝতে পারব না কিছু! আয়, এসে দেখে যা আমি কত সুখী! কত সুখী আমি!

বলতে বলতে পাগলের মতো হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল প্রশান্ত। মাথা নিচু করে মুখ গুঁজে দিয়েছে সে পাশে বসে থাকা প্রীতির বুকে। দু হাতে প্রশান্তর মুখখানা আরও নিবিড় করে টেনে বুকের ঠিক কেন্দ্রের ফাঁকা জায়গাটায় নিয়ে এল প্রীতি। কাঁদুক, কেঁদে একটু হালকা হোক।

পরম মমতায় প্রশান্তর চুলে বিলি কাটতে কাটতে মৃদু কোমল গলায় প্রীতি বলল, ছি, ওসব কেন বলছ? দিদি মানুষটা কত ভাল।

সহসা প্রশান্তর মনে হল বাইরের ওই প্রবল দুর্যোগ আর ভিতরের এই তীব্র জ্বলুনি— এসবের হাত থেকে এ মুহূর্তে একমাত্র প্রীতিই রক্ষা করতে পারে তাকে। প্রীতির বুকের চাপে অন্ধ হয়ে থাকায় সে দেখতে পেল না দরজার দিকে ফেরানো শুকনো দুটি চোখ তখন ধিকিধিকি জ্বলছে।

অঙ্কন : কৃষ্ণেন্দু চাকী

বহুমাত্রিক মা

শ্রীদুর্গার, কিংবা চণ্ডীর শাস্ত্রীয় রূপকল্পনা অষ্টোত্তর শতনামের মধ্যে যেমন কবিতার ভাষায় বিধৃত, তেমনি প্রতিমা রূপায়ণেও তার অজস্র বিভিন্নতা কারুকৃতেরা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু রূপকল্পনা অনস্বীকার্যভাবেই জন্ম নিয়েছে ভারতবর্ষের নৃতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক আঞ্চলিকতার ক্রোড়ে। প্রচ্ছদের ২৫টি এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলির ১৩টি উদ্ধৃত প্রতিলিপিতে যেমন শিল্পীর নামের তাৎপর্য, তেমনি ভারতের বহুমুখিনতার গুরুত্বও লক্ষণীয়।

শ্রীশ্রীদুর্গা। শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩৯৩

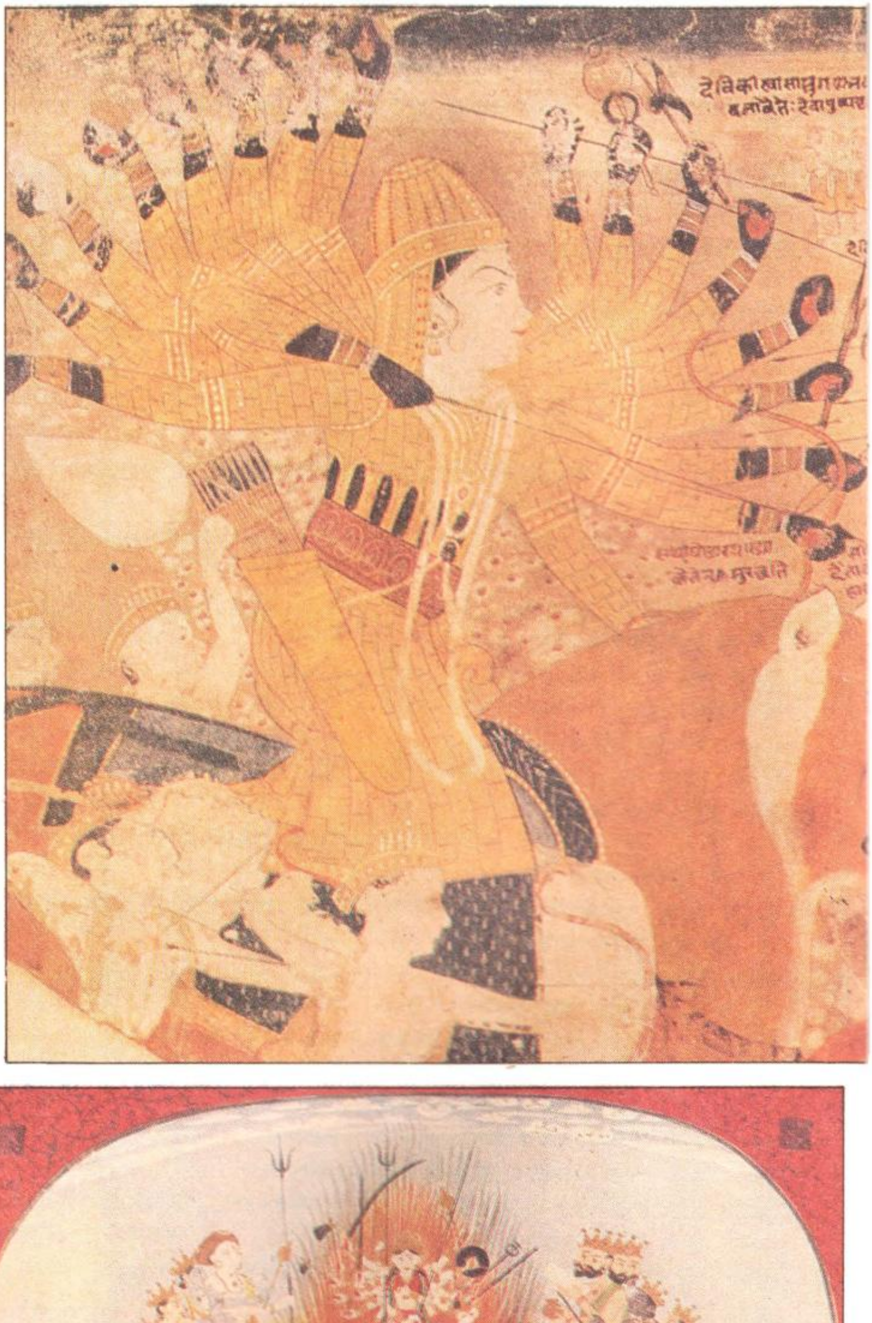

১

৪

১. মহিষাসুরমর্দিনী। প্রাচীন চিত্র।১৩৬২
২. মহিষাসুরমর্দিনী। রাজপুত চিত্রকলা। ১৭শ শতাব্দী। ১৩৫১
৩. শ্রীশ্রীদুর্গা। শিল্পী নন্দলাল বসু। ১৩৫৬
৪. শ্রীশ্রীদুর্গা। প্রাচীন চিত্র। ১৩৫৭
৫. দুর্গাপট। জয়পুর চিত্রশৈলী। অষ্টাদশ শতক।১৪০০

২

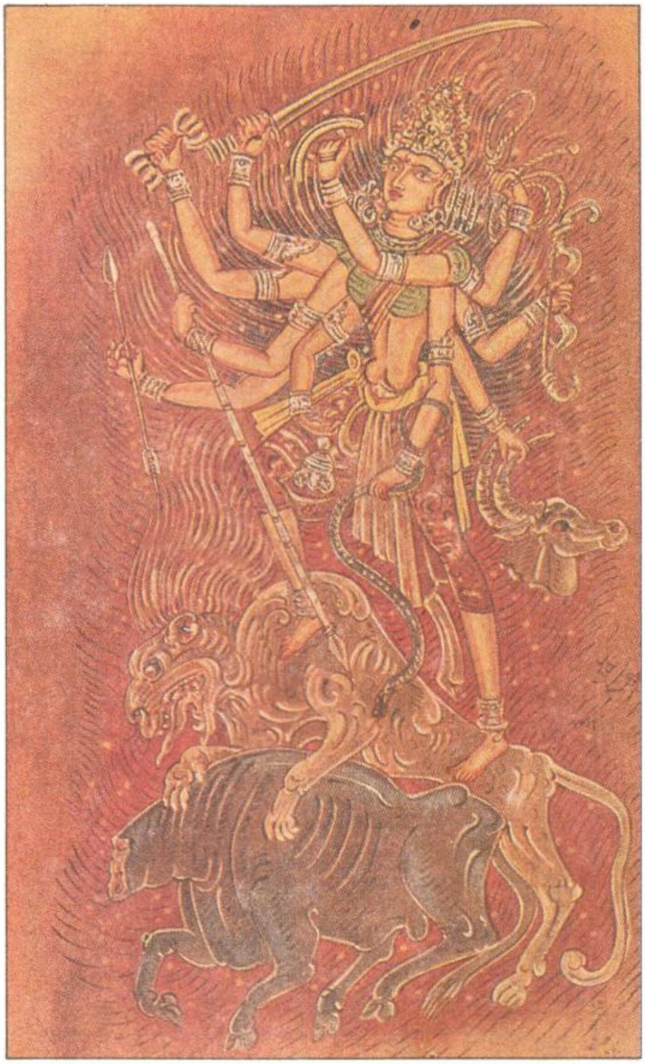

৩

৫

“দিগ্‌ভুজা, নানা
প্রহরণপ্রহারিণী,
শত্রুমর্দিনী,
বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—
আমি সেই কালস্রোতমধ্যে
দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী
বঙ্গপ্রতিমা!”
বঙ্কিমচন্দ্র : কমলাকান্তের
দপ্তর

শাস্ত্র বিধান আচার : এক পলকে

প্রতিপদ ৪ আশ্বিন সোমবার শারদীয়া দুর্গাদেবীর প্রতিপদাদিকল্পারম্ভ ঘটস্থাপন ও চণ্ডীপাঠ নবরাত্র ব্রতের সূচনা	দ্বিতীয়া ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার চণ্ডীপাঠ দেবীর উদ্দেশ্যে পট্টডোরা সম্প্রদান ব্রহ্মচারী পূজন	তৃতীয়া ৬ আশ্বিন বুধবার নবরাত্র ব্রতের তৃতীয় দিন দেবীর প্রসাধনার্থে অলক্তক, দর্পণ ও সিন্দূর সম্প্রদান	চতুর্থী ৭ আশ্বিন বৃহস্পতিবার দেবীর উদ্দেশে কজ্জল, মধুপর্ক ও রৌপ্যতিলকাদি সম্প্রদান মানব্রত বা সৌভাগ্যব্রত	পঞ্চমী ৮ আশ্বিন শুক্রবার —৯ আশ্বিন শনিবার দেবীর বোধন বিল্বতরুর নিকটে গমন ও দেবীর জাগরণ- সম্পাদন		ষষ্ঠী ১০ আশ্বিন রবিবার সায়ংকালে দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাসন : 'দুর্গে দেবি সমুত্তিষ্ঠ অহং ত্বামধিবাসয়ে' দুর্গাষষ্ঠী ব্রত	সপ্তমী ১১ আশ্বিন সোমবার নবপত্রিকা প্রবেশন ও সংস্থাপন : 'প্রবিশ্য তিষ্ঠ গৃহেহস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহম্' প্রাণপ্রতিষ্ঠা, প্রার্থনা ও পূজারম্ভ
মহাষ্টমী ১২ আশ্বিন মঙ্গলবার নবশক্তির আবাহন ও পূজন চতুঃষষ্টি যোগিনীপূজন সন্ধিপূজা	মহানবমী ১৩ আশ্বিন বুধবার যথাবিধি পূজন ও প্রদক্ষিণাদি কুমারীপূজা (কুলাচার অনুযায়ী অন্য তিথিতেও অনুষ্ঠেয়) বলি (কুলাচার অনুযায়ী মহাষ্টমীতেও অনুষ্ঠেয়)	বিজয়া দশমী ১৪ আশ্বিন বৃহস্পতিবার যথাবিধি পূজার্চন ও দেবীর প্রসাদ- ভিক্ষা দর্পণ- বিসর্জন : 'গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকে' অপরাজিতা পূজা	একাদশী ১৫ আশ্বিন শুক্রবার বিশেষ কৃত্য নাই। তবে 'স্নানং দানং জপো হোম উপবাসস্তথৈবচ' সব তিথিতেই প্রযোজ্য ভবানীস্তোত্র : ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন নপ্তা ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা। ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।।	দ্বাদশী ১৬ আশ্বিন শনিবার	ত্রয়োদশী ১৭ আশ্বিন রবিবার সকাল ঘ ৬।৭ পর্যন্ত কামদেব পূজা (বিধান পুরাণনির্দেশিত)	চতুর্দশী ১৭ আশ্বিন রবিবার সকাল ঘ ৬।৮ থেকে শেষরাত্রি ঘ ৪।৯ পর্যন্ত পূর্ণিমা শেষরাত্রি ঘ ৪।১০ থেকে সোমবার ১৮ আশ্বিন রাত্রি ঘ ১।৫৮ পর্যন্ত	পূর্ণিমা ১৮ আশ্বিন সোমবার কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা নারিকেল-জল পান ও সারারাত্রি জাগরণে অক্ষক্রীড়া বিধেয় লিঙ্গপুরাণে ইন্দ্রপূজারও বিধান আছে : 'কৌমুদ্যাং পূজয়েল্লক্ষ্মীম্ ইন্দ্রমৈরাবতস্থিতম্'

শাস্ত্র বিধান আচার : বিস্তৃতি

পূজাপদ্ধতি নির্ধারিত হচ্ছে প্রধানত বৃহন্নন্দিকেশ্বর, দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ ইত্যাদির বিধি অনুসারে। বিভিন্ন তিথির প্রতিপাদ্য অনুষ্ঠান বিষয়ে কিছু কিছু মত ও মতান্তর তো আছেই, তার সঙ্গে আছে লোকাচার ও কুলাচার। এই নির্ঘণ্টলিখনে সহায়ক হয়েছে গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণ রচিত বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বিরচিত পুরোহিতদর্পণ, ড. রাজবলি পাণ্ডেয় রচিত হিন্দুধর্মকোষ ও বিভিন্ন পঞ্জিকা। এছাড়াও সন্দেহস্থলে শরণ নিয়েছি পণ্ডিতপ্রবর যাদবেশ্বর শাস্ত্রী ও শাস্ত্রবিদ জীবননাথ ভট্টাচার্যের। এই সব শাস্ত্রবিধান ও আচার বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব আমাদের জীবনের সঙ্গে এইসব পূজাপদ্ধতির যোগ আছে। নবপত্রিকা রচনায় উদ্ভিদজগতের সঙ্গে আমাদের প্রাণের যোগ সূচিত,পূজার মন্ত্রগুলিও বহু ক্ষেত্রে আমাদের জীবনমন্ত্রই। একটি অতীন্দ্রিয় জগতের সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মিলন আশ্চর্যভাবে প্রতিফলিত পূজাপদ্ধতিতে। সর্বোপরি কল্যাণ আর কল্যাণ— শুধু আমার নয়, সকলের। এই কল্যাণবুদ্ধিই এই পূজাপ্রকরণের মূল কথা।

দুর্গানামহেতু দেবীপুরাণে রিপুসংকটে দুর্গের মতো বলেই দেবীর নাম দুর্গা : তারিতা রিপুসংকটে দেবাঃ শক্রাদয়ো যস্মাৎ তেন দুর্গা প্রকীর্তিতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে দুর্গ

ঘটস্থাপন মঙ্গলকৃত্য অনুষ্ঠানের সূচনা এবং ক্রিয়াসিদ্ধির সংকল্পের প্রতীক। নবরাত্রির সূচনায় ঘটস্থাপনা ঘটে দেবীরই স্থাপনা। ঘটভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেরও প্রতীক। ব্রহ্মা এই ঘটভাণ্ডে বিম্বিত। তদুপরি সমস্ত পুণ্যবারিধারা এই ঘটবারিতে আহূত— ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতী। নর্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।

চণ্ডীপাঠ মহাগ্রন্থ পাঠে সু-উচ্চারিত ধ্বনি সমস্ত পরিবেশকে যেন প্রক্ষালিত করে পবিত্র করে তোলে। দেবীমহিমাকীর্তন আমাদের দিব্যভাবে ভাবিত করে।

পাঠ ও শ্রবণ দেবীমাহাত্ম্য পাঠে ও শ্রবণে সর্বসিদ্ধি : মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্তিতং। পঠেচ্চ শৃণুয়াদপি সর্বকর্মসিদ্ধয়ে।।

সম্প্রদান আমরা দেবতাকে আপন করে নিই, তাই দেবীকে কন্যার মতো সাজাতে তাঁকে দিই আলতা, চিরুনি, চুল বাঁধার ফিতে ও সুবাসিত তেল ইত্যাদি।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা পত্রী স্থাপনের পর প্রাণপ্রতিষ্ঠাকৃত্য। মৃন্ময়ী হলেন চিন্ময়ী : অন্যেষামপি দেবানাং প্রতিমাস্বপি পার্থিব। প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্তব্যা তস্যাং দেবত্বসিদ্ধয়ে।।

বিভিন্নরূপে জননী তৃতীয়ায় মৎস্যপুরাণ অনুযায়ী গৌরীপূজার বিধান আছে। দুর্গা তো আছেনই, আবার পৃথক করে গৌরী কেন? এ কোন গৌরী? একই জননীকে বহুভাবে দেখে আমাদের তৃপ্তি, তাই এই বিভিন্ন রূপকল্পনা, তাই মহাষ্টমীতে চতুঃষষ্টী যোগিনীপূজা। কুমারীপূজাও তো আসলে মাতৃপূজাই।

নবপত্রিকা মন্ত্র সপ্তমীতে নবপত্রিকাকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে ' ওঁ চণ্ডিকে চল চল চালয়'— তুমি চল, আমাদেরও চালনা কর। এই যে মাতৃনির্ভরতা, এ তো আমাদের শৈশবকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। শৈশবে মায়ের হাত ধরে আমরা চলি, তিনিই আমাদের চালনা করেন।

দর্পণ বিসর্জন এ এক আশ্চর্য কল্পনা— আমাদের হৃদয়দর্পণে যদি তিনি বিসর্জিত হন তাহলে আমাদের মৃন্ময় দেহ তো চিন্ময় হয়ে ওঠে।

বিসর্জন মন্ত্র বিসর্জন দেবীকে স্বস্থানে গমনের অনুমতি দান। পুনরাগমনের আহ্বান ওই বিসর্জনেই বিধৃত : দুর্গে দেবি জগন্মাতঃ স্বস্থানং গচ্ছ পূজিতে। সংবৎসর-ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় বৈ।।

কোজাগরী কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় লক্ষ্মী ডেকে ডেকে ফিরছেন 'কো জাগর্তি'— কে জেগে আছ? যে জেগে আছ 'তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি' —তাকেই আমি সম্পদ দান করব। নিদ্রিতের কাছে কি সম্পদ আপনা থেকেই আসে?

লক্ষ্মীপ্রণাম ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে।। ❑ জ্যোতিভূষণ চাকী

দেবীপক্ষের আকাঙ্ক্ষার দিনাঙ্ক

রবিবার : ষষ্ঠী

অকালবোধনের দুর্গা পূজা দেখার একটা আদর্শ স্থান— 'ধ্রুপদী' দৃষ্টান্তও বলা যায়— এখনও কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ি। আর, কলকাতায় রানী রাসমণির এবং শোভাবাজারের রাজবাড়ির পুজোও রয়েছে। কিন্তু দূরদর্শনে পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্লোজ-আপে, পুজোর আমেজ এবং মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গীত মিশিয়ে পূজাঙ্গনের কী সুন্দর-গম্ভীর হৃদয়মন ভরানো অনুষ্ঠান হতে পারত। হয় না।

সোমবার : সপ্তমী

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে বেলা ৩টেয় বুদ্ধদেব বসুর কাহিনী অবলম্বনে নাটক 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'। তাছাড়াও ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত চারদিন কলকাতায় মোট দশটি নাটক প্রযোজিত হচ্ছে। কিন্তু যুগমন কাঁপানো নাটকও নেই, পরিচালকও নেই। কলকাতা কেন এই সপ্তাহে হয় না লাতিন-হৃদয়ী? গানে, নাটকে উচ্ছলা? ফিয়েস্তায় ভরা? (৮১ পৃষ্ঠায় 'কখন কোথায়' দেখতে পারেন)।

উত্তরশিয়রি এই নগরীর বামপার্শ্বে অঙ্কশায়িনী গঙ্গা। কখনও কখনও শরতে সে কি হতে পারে না আমাদের আকাশগঙ্গাও, যদি সদয় হন কলকাতার মহানাগরিক? কিংবা যুগপৎ পোর্ট কমিশনার্স-এর চেয়ারম্যান? (বর্তমান দুঃখিনী গঙ্গার দিকে তাকালেই বোঝা যায় কেন এই নদীকূলে বসে অমিত রায়ের প্রেমিকা কেটি মিটারের কপাল ভেঙেছিল।)

মঙ্গলবার : অষ্টমী

সকাল ৮টা ২৯ মিঃ থেকে অঞ্জলি শুরু। কয়েক বছর আগে, বোধহয় ১৯৯৩ সালই হবে, অষ্টমী পূজার লগ্ন পড়েছিল ভোররাতে। সেই অত্যাশ্চর্য শেষরাত্রিটিকে আর ফিরে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। সে রাত্রে নামকরা মণ্ডপগুলিতে জনস্রোত ছিল ক্ষীণ। অঞ্জলিদানের মধ্যে একটা অতীতের শ্রদ্ধার গন্ধ মাখা স্মৃতি এসে দাঁড়িয়েছিল।

বুধবার : নবমী ❊ বৃহস্পতিবার : দশমী

মধ্যবিত্ত বাঙালি দর্শককে বরং 'হারাকিরি' করতে উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই ১৯৯৮ সালে বিজয়া দশমীর রাত্রে বিসর্জন দেখতে যাওয়ার পরামর্শ? একান্ত নির্দয় না হলে ওই সৎ পরামর্শ আর কেউ দেবে না। দেওয়ার দিন বোধহয় অর্ধশতাব্দী আগেই বিগত হয়েছে। এখন বরং প্রীতিসম্মেলন, বিজয়ার আলিঙ্গন এবং প্রণাম— এরই জন্য একটি সন্ধ্যা চিহ্নিত হয়েছে। পুষ্পে, বর্ণে, গন্ধে এই দিনটিকে আমরা তো আরও হৃদয়ময় করতে পারি? যেমন বাঙালির বর্ষপঞ্জীতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আজ কপালে পরেছে একটি অতুলনীয় লাবণ্যের টিপ। সেও তো এই শতাব্দীরই সৃষ্টি। বঙ্গভঙ্গের আগে তো ছিল না। হিন্দু বাঙালির দ্বিতীয় নববর্ষ হিসাবে সন্ধ্যাটিকে নিশ্চয়ই করা যায় আরও অনেক রজনীগন্ধা।

শুক্রবার : একাদশী

কেউ কেউ বলেন, দিনে-গিয়ে-দিনে-ফেরার জন্যও জায়গা আছে— বকখালি, ডায়মন্ড হারবার, কিংবা রূপনারায়ণের কূলে গাদিয়াড়া। কাটোয়া লাইনে বলাগড়ে গিয়ে নৌকোয় সবুজদ্বীপ। ❊ আগামীকাল থেকে ফুটপাতে মেলা বসবে। সরার লক্ষ্মী, পট, মৃত্তিকার মূর্তি নিয়ে কলকাতা হবে লোকায়ত।

শনিবার : দ্বাদশী

গঙ্গার এঘাট থেকে ওঘাটে যাওয়ার জন্য অনতিদূর পাল্লার স্টিমারগুলিকে দেখলেই ওঠানামার স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা মনকে ইশারা দিতে থাকে। শরতের নদীর স্বাদও ভোলার নয়। কে যেন বলেছিল, ভাড়ার লঞ্চ— বিশ বাইশজন নিয়ে পার্টি করার মতো— পাওয়া যায়, ন্যূনপক্ষে অর্ধেক দিনের জন্য?

অঙ্কন : সুব্রত চৌধুরী

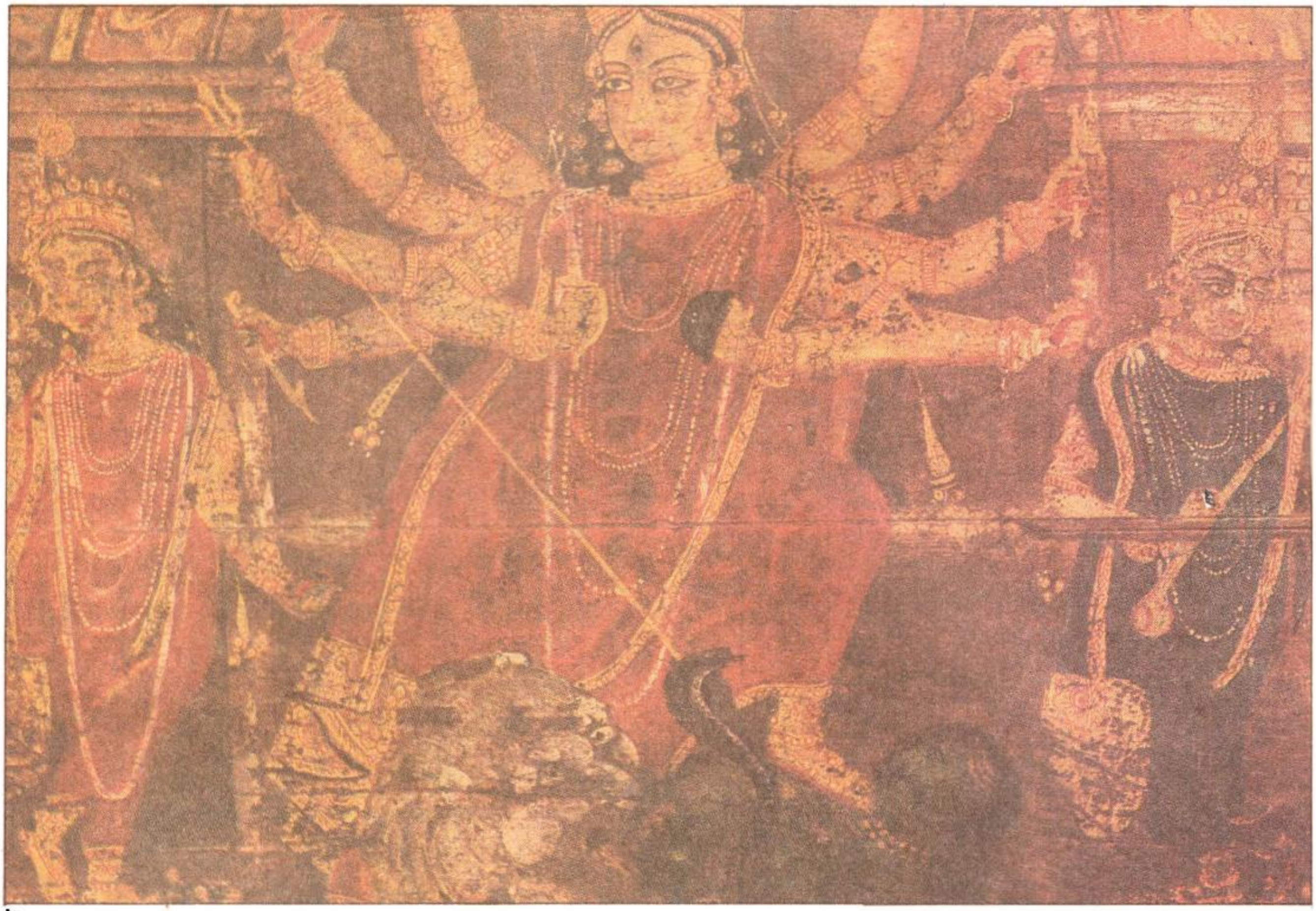

৬

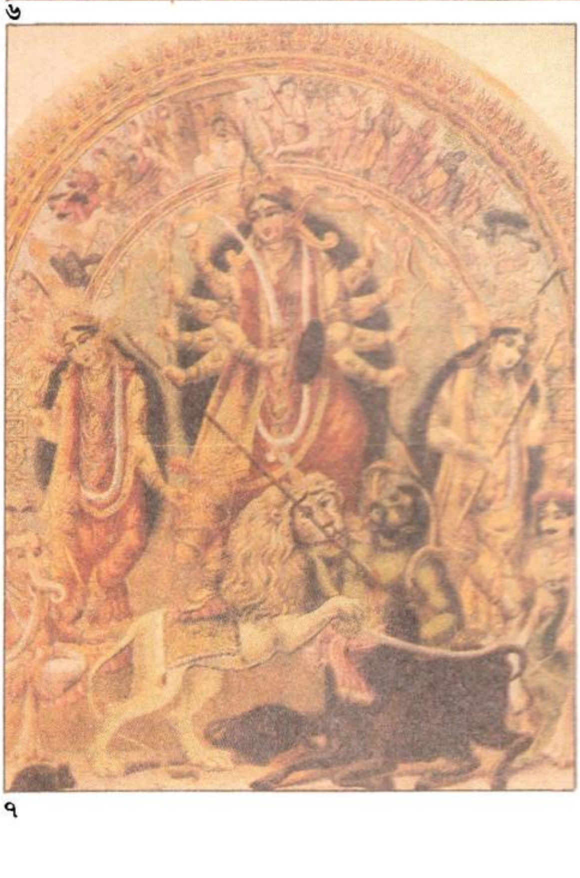

৭

৮

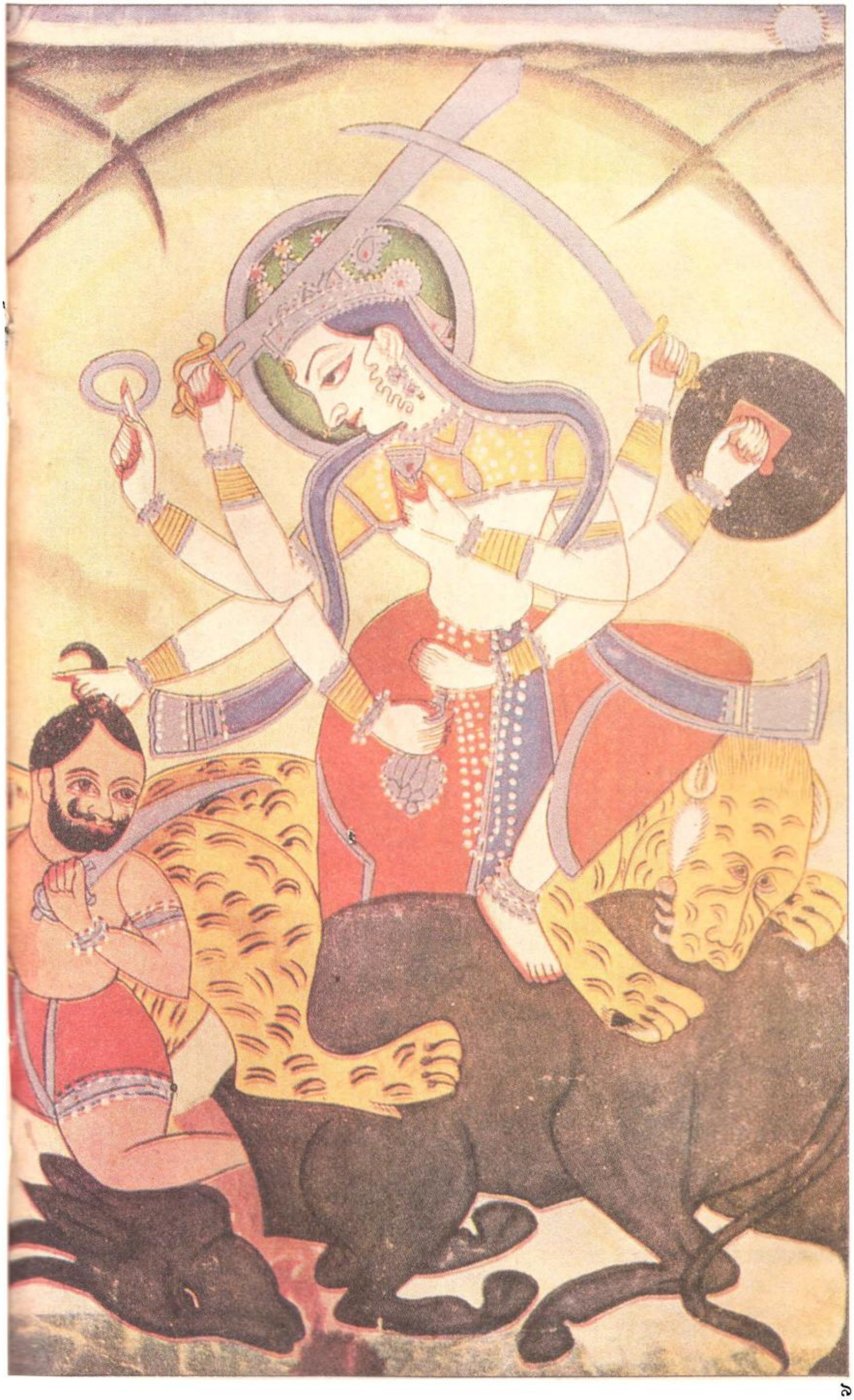

"এক সুবর্ণনির্মিত দশভুজা প্রতিমা নবারুণকিরণে জ্যোতির্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত,— তাহাতে নানা আয়ূধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত।"
বঙ্কিমচন্দ্র : আনন্দমঠ

৬. শ্রীশ্রীমহিষাসুরমর্দিনী। কাষ্ঠফলকে অঙ্কিত। বর্ধমান-কালনা। ১৩৭৯
৭. শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনী। বাংলার প্রাচীন পট। ১৩৭০
৮. শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনী। ওড়িশার প্রাচীন পট। ১৩৭২
৯. শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনী। প্রাচীন পট। ১৩৬৬

৯

১০

১১

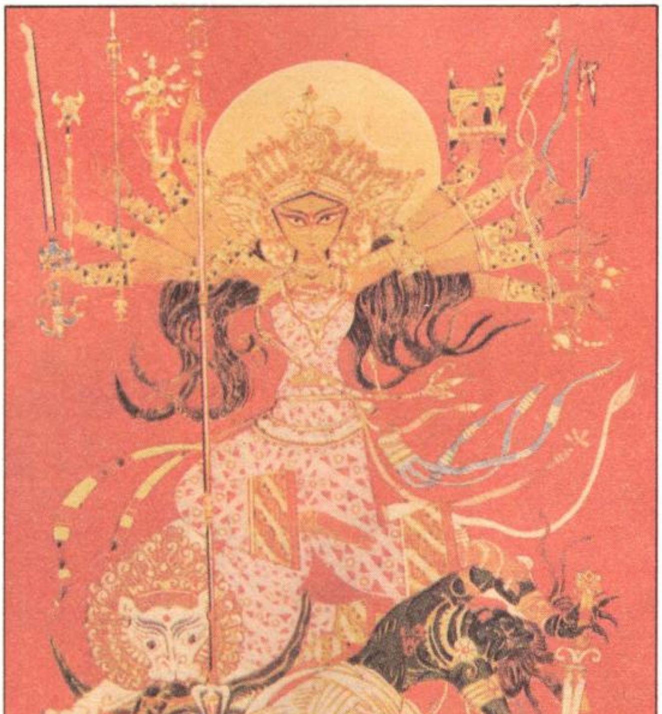

১২

১০. শ্রীশ্রীদুর্গা। প্রাচীন কাঠখোদাই। শিল্পী কার্তিকচন্দ্র বসাক। ১৪০১

১১. গণেশজননী। বাংলার প্রাচীন পট। ১৩৯৭

১২. শ্রীশ্রীদুর্গা। শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩৮১

রামায়ণের গল্প-স্রোত ভবিষ্যৎস্পর্শী। পালাকারদের হাতে তা পুনঃসৃষ্ট

ক্ষমতার লড়াইয়ের ভিন্ন নাম অকালবোধন

গৌতম ভদ্র

'আমি যদি জন্ম নিতেম কৃত্তিবাসের কালে"। মুচকি হেসে কেউ বলতে পারেন, কালিদাস ও কৃত্তিবাসের মধ্যে ফারাক যে অনেকটাই। আর তোমারও স্পর্ধার বলিহারি। ওই আমিটা হলেও হতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ। কালিদাসের কালের স্বাদগন্ধ তাঁকেই ছুঁয়ে যেত, তিনিই সেই ধ্রুপদী সাহিত্যের উত্তরসাধক। তুমি কিনা ধরতে চাও আমাদের কৃত্তিবাসকে? একেবারে 'প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ'। কীই বা তোমার সাবুদ? কীই বা তোমার তকমা? কোথায় বা সেই চাপরাশ?

ভরসা যে এখন পুজোর সময় আর আমি বাঙালি। তাই বাংলা ভাষায় 'বটতলায়' ছাপা বাজারে চালু কৃত্তিবাসী রামায়ণটা বার বার পড়তে ভালবাসি। বটতলার কৃত্তিবাস যে গল্পের ঝুলি আমাদের রোজকার কাজকর্মের পেছনে কী কী গল্প আছে, বাজারি রামায়ণে সেইগুলোর সবটাই খোলসা করে বলা হয়েছে। কেনই বা রাত্তিরে দই খাওয়া কারও কারও মানা অথবা প্রতি বছরে কেনই বা শরৎকালে পুজার বাদ্যি শুনলে মনটা আঁকু পাঁকু করে, এই সব গুরুতর প্রশ্নের কোনও না কোনও জবাব বটতলার কৃত্তিবাস-ই ছেলেবেলা থেকে আমাদের জুগিয়ে চলেন। এই কৃত্তিবাস সবাইয়ের, আমার ও আপনার, কেবলমাত্র নলিনীকান্ত ভট্টশালী বা সুখময় মুখোপাধ্যায়ের নয়। সেই সব ভারী ভারী সংস্করণে আদি ও অকৃত্রিমতার কষ্টিপাথরে মজার মজার গল্পগুলি বাদ চলে গেছে। ছেলেবেলার চেনা তুখড় গল্প বলিয়ে কৃত্তিবাসকে খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে ওঠে।

মধ্যযুগে গায়েনরা চিনতেন তাঁদের শ্রোতাকে তাদের খুশি করাটাই ছিল উদ্দেশ্য। উনিশ শতকের ছাপাখানাও গড়ে তোলে একটা 'কম্পোজিট টেক্সট', মেলানো মেশানো এক জড়াপট্টি। পশ্চিমবঙ্গের কৃত্তিবাস ওঝার লেখার মধ্যে অবলীলায় ঢুকে পড়েন উত্তরবঙ্গের কবি নিত্যানন্দ অদ্ভুতাচার্য। নানা বঙ্গের নানা পুঁথি মিলে তৈরি হতে থাকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বাঙালির কল্পনার জগৎ গড়ে ওঠার এক বিচিত্র প্রক্রিয়ায়। 'জড়াপট্টির' জট খুলতে গিয়ে নলিনীকান্ত এই নির্মাণের অনবদ্য ইতিহাস লিখে দেখিয়েছেন, মলাটে আবদ্ধ ওঝা কৃত্তিবাসের রামায়ণের মধ্যে কত অঞ্চলের কত গায়েন ও কবির কারুকৃতি লুকিয়ে আছে। এই পঞ্চরঙ্গির মিশেলই বটতলার কৃত্তিবাসের জোর,'ভাষা রামায়ণ'-এর বহুমাত্রিক আবেদনের উৎস।

গাওয়া দরকার উৎসবে, পরবের সময়। দুর্গাপূজাও উৎসব, বটতলার রামায়ণ তাকে বাদ দেয় কী করে। লঙ্কাকাণ্ডের চরম ক্ষণে অকালবোধনের গল্প জুড়ে বসে। বাঙালির শারদীয় সাহিত্যের অন্যতম আদি নিদর্শনরূপে অকালবোধনের গল্পটিকে ভাবলে ক্ষতিটা কী? পণ্ডিতরা কানে আঙুল দিতে পারেন। কালিকা পুরাণের গল্পটিকে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 'বাতুলের প্রলাপ' বলেছেন, তাঁর মতে জ্যোতিষের এক নিগূঢ় তত্ত্ব এই শরৎকালের পূজার মধ্যে ঢাকা আছে। শাক্ত সাধনার মাহাত্ম্যপটেও অকালবোধনের কোনও না কোনও মানে বার করা যায়। নারীবাদীদের হাতে সেই বিশ্লেষণ। আরও সুতীক্ষ্ণ হতে পারে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, কালিকাপুরাণ বা দেবীভাগবতমের সূত্র ধরেও আমাদের চেতনায় শক্তিসাধনার রূপ কীভাবে পরিগ্রহ করেছে, শাক্ত ও বৈষ্ণবের টানাপোড়েনে কেমন করে মধ্যযুগীয় সংস্কৃতিতে নানা সমঝোতার ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছিল, পুরাণ বিশেষজ্ঞদের এই পরিচিত ছকটিও নেহাত অচেনা নয়।

তবু পূজা তো একটি ক্ষণ, পরব। সেই ক্ষণের কথাটাকে গল্পরূপে ভাবলে মহাভারতটা বোধহয় অশুদ্ধ হয় না। গল্পে মজাও আছে, উত্তেজনাও আছে, গাল্পিক রসাস্বাদন বিদ্যানিধি বা শশিভূষণ দাশগুপ্তের লেখা পড়া না পড়ার উপর নির্ভর করে না। নানা মত আছে, অত বাদবিচার করলে গল্প চালিয়ে নিয়ে যাওয়া মুশকিল, সেই কথা একসময় কৃত্তিবাস জানিয়ে দিয়েছেন।

'পুরাণে অনেক রূপ, কে পারে কহিতে।'

রাবণকে মারাটা রামের কর্ম নয়, লঙ্কাকাণ্ডের শেষে এই কথাটা রাম নিজে বুঝতে পারেন, কারণ, রাবণের খুঁটি বড় জোরদার, স্বয়ং অম্বিকা। সবাই জেরবার, একেবারে মাথায় হাত।

"এখানে চিন্তিত রাম কি করি উপায়।।
আমা হৈতে নাহি হল রাবণ সংহার।
জনক-নন্দিনী সীতা না হৈল উদ্ধার।
মিথ্যা পরিশ্রম কৈনু সঞ্চয় বাচর।
মিথ্যা কষ্টে করিলাম বন্ধন সাগর।।
মিথ্যা করিলাম যত রাক্ষস সংহার।
লক্ষ্মণের শক্তিশেল ক্লেশমাত্র সার।।
অনুপায় সকলি হইল এইবার।
বিভীষণে কহেন, কি হবে মিতা আর।।
নয়নেতে বহে জল শুকাইল মুখ।

"যুদ্ধ ছেড়ে বড় বড় বীররা হাত পা ছড়িয়ে কাঁদছে, ছবিটা ছেলেবেলায় বেশ নাড়া দিত। ভাগ্যে নেই, হবেটা কী করে? এই রকম অনুভূতি সবলের হরবখত হয়, আমাদের রাম-লক্ষ্মণও তো ব্যতিক্রম নন।"

তাহা দেখি বিভীষণের দুঃখে ফাটে বুক।।
বলে প্রভু আমার নাহিক সাধ্য আর।
আমা হৈতে হৈলে হৈত উপায় উহার।"

সব কাজের কাণ্ডারি বিভীষণও হাল ছেড়ে দিয়েছে। ঘাটে এসে নৌকা ডুবল আর কি।

"এত শুনি কান্দেন আপনি রঘু রায়।
ধূলায় লোটায় ছিন্ন নীলোৎপল প্রায়।।
লক্ষণ কান্দিছে আর বীর হনুমান।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল জাম্ববান।।
রোদন করিছে সবে ছাড়িয়া সমর।"

যুদ্ধ ছেড়ে বড় বড় বীররা হাত পা ছড়িয়ে কাঁদছে, ছবিটা ছেলেবেলায় বেশ নাড়া দিত। ভাগ্যে নেই, হবে টা কী করে? এই রকম অনুভূতি সবলের হরবখত হয়, আমাদের রাম-লক্ষ্মণও তো ব্যতিক্রম নন। তবে তাদেরও তো খুঁটি আছে। ব্রহ্মা আসেন, রামকে চণ্ডীপূজা করতে পরামর্শ দেন। ফ্যাকড়া অনেক। তাই দেবীর অকালেই বোধন। ফুরসত পেলে রাবণ পূজা করে ফেলবে। অকালেই দেবীকে জাগাতে হয়, রাবণের দল ছেড়ে তিনি যেন রামের পক্ষে চলে আসেন। কালিকা পুরাণ বা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে রামের পক্ষে ব্রহ্মাই দেবীর পুজো-আচ্চাটা সেরে দেন। গল্পটাও তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। এখানে ঝামেলাটা রামকেই নিতে হয় জোগাড় দেন হনুমান। বিধিমত সপ্তমী, অষ্টমী পূজা সাঙ্গ হল, নবমীর পূজা শেষেও দেবীর পাত্তা নেই। পৃথিবীটা চষে হনুমানকে আনতে হয় কুল্লে একশো আটটি নীলপদ্ম। দেবী একটা পদ্ম হাতিয়ে নেন। এবারের সবটাই কৃত্তিবাসের বানানো, কারও কাছ থেকে ধার করা নয়, গল্পের টান টান উত্তেজনা যেন শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। আনা পদ্মের হিসেব নিয়ে রাম ও হনুমান তর্ক জুড়ে দেন।

"হনুমানে কন, ব্রহ্ম সনাতন,
এ কি পবন তনয়।
সঙ্কল্প করিয়া, বিধান রচিয়া,
শতাষ্ট আছে সংখ্যায়।
এক পদ্ম তায়, পাওয়া নাহি যায়,
ঠেকিলাম ঘোর দায়।
যাহ পুনর্বার, এক পদ্ম আর,
আন গিয়া বাছাধন।
হনুমান কয়, শুন মহাশয়,
শতাষ্ট আছে গণন।
শুন হে গোঁসাই, আর পদ্ম নাই,
দেবীদহে বনমালী।
...আমার বিস্ময়, অন্যথা না হয়,
দেখেছি গণনা-ক্রমে।
নিশ্চয় তারিণী, হরিলা নলিনী,
না ভুলিও প্রভু ভ্রমে।"

বুঝুন অবস্থাটা। হাজার হলেও ব্রহ্ম সনাতন। অথচ তিনিই ভাবে ভোলা মানুষ; পদে পদে ঠকে যান। হনুমান ধোঁকা খাবার লোক নন, আদত ব্যাপারটা সমঝে দেন। যা হবার নয় তাই হচ্ছে, খেলায় যে কেউ নাজেহাল হতে পারে, প্রাকৃত জনের ভাষায় রাম বলে ওঠেন,

"বুঝিলাম সার, কপালে আমার,
আছে কতেক যন্ত্রণা।"

রাজীবলোচন রাম শেষ পর্যন্ত নিজের চোখ উপড়ে দিতে চান, বরদায়িনী দেবীর প্রকাশ হয়। রাম কিন্তু অনুযোগ করতে ছাড়েন না,

"ভাল দুঃখ দিলে মাতা পেয়ে অসময়।
কিন্তু জননীর মত হেন কার্য্য নয়।"

এই গল্পটি 'কৃত্তিবাস বিরচিল মধুর ভাষায়' কারণ কাহিনীটি পুজোর গল্প, এর আধারেই ধরা পড়ে পূজার মাহাত্ম্য। রামের পূজায় সকলেই অংশভাক্, গল্প শোনাটা শ্রোতাদের পুণ্যভাগী করে তোলে।

"অকালবোধনে পূজা, কৈলে তুমি দশভুজা,
বিধিমতে করিলা বিন্যাস।
লোকে জানাবার জন্য, আমারে করিতে ধন্য,
অবনীতে করিলে প্রকাশ।"

দেবীর মাহাত্ম্য, ভক্তের মাহাত্ম্য। একজনের জন্যই আর একজন। ভক্তই তো পূজা করে, দেবীকে স্বীকৃতি দেয়। সেখানে প্রতিস্পর্ধিতা আছে, আছে ক্ষমতার খেলা। রামও ভক্ত, রাবণও ভক্ত, দেবীকে ধরে দুজনেই টানাটানি করেছেন। এবারের মতো খেলায় রাম জিতেছেন।

এই ক্ষমতার খেলাই গল্পের নানা মোচড়ে ধরা পড়ে, অপ্রত্যাশিতের সম্ভাবনাকে বোঝানো হয় কারও লীলারূপে, দৈবী খামখেয়ালিপনায়, সুখ ও দুঃখের অনুভব এখানে মোটা দাগে, প্রাকৃত ভাষায় রচিত। ভাগ্যের একচোখামির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হয়, রামের গলায় শোনা যায় রামপ্রসাদী সুর—

"কারো স্বর্ণপাত্রে অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
কারো অন্ন নাহি মেলে, ভিক্ষায় ভক্ষণ।।
...আমারে করেছ মাত্র দুঃখের ভাজন।
...সুঃখভাণ্ড অল্প হ'লো, দুঃখ তাহে ভারি।
তথাপি রাখিছ দুঃখ পূর্ব্ব না বিচারি।।
নিষেধ করি গো তাই যদি ভেঙ্গে যায়।
এ দুঃখ রাখিতে স্থান পাইবে কোথায়।।"

অকালবোধনের পুজো হয়ে ওঠে সবার, এই ভাষা সকলের, দুঃখের চাপে জীবনের সরা যে-কারওরই ভেঙে যেতে পারে। দুঃখও তো নানারকমের হতে পারে, রামের লিস্টে কোনওটাই বাদ নেই। বাক্যের বিন্যাসে, কাহিনীর সূত্রে একান্ত সম্পর্কের কোনও সুযোগ থাকে না, দেওয়া-নেওয়ায় আছে সবাইয়ের আমন্ত্রণ।

দুই

শারদীয় সাহিত্যের খেলায় শুধু বাঙালি কৃত্তিবাস মাতেননি। আঠেরো শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতক জুড়ে দুর্গা পূজোকে ঘিরে বাংলা ভাষায় ভাবময় গীতি রচনার ধারা তৈরি হয়েছিল, আমাদের অতি পরিচিত আগমনী ও বিজয়ার গানে। শাক্তদের লীলাসঙ্গীত, বিষয় পুজোর দিনগুলিকে ঘিরে গার্হস্থ্য জীবনের একটি পরিচিত খণ্ডচিত্র। অল্পদিনের জন্য বাপের বাড়িতে বিবাহিত মেয়ের আসা ও ফিরে যাওয়া। মধ্যযুগের নানা টুকরো-টুকরো গাথায়, শিবায়ন বা অন্নদামঙ্গলে পড়া লৌকিক শিবের ঘর গেরস্থালির গল্পগুলি এই গানগুলিতে অন্য রসে সিঞ্চিত হয়েছে। রচয়িতারা পুরুষ, স্বরটা কিন্তু মেয়ের, মা মেনকার। মূর্খ কেউ নন, অনেকেই সম্পন্ন, বিত্তবান। সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, কবিয়াল রাম বসু, শ্রীধর কথক ও কাঙাল ফিকিরচাঁদের পাশাপাশি গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও নবীনচন্দ্র সেনের নামও গীতিকারদের তালিকায় দেখা যায়। গানগুলি প্রচলিত অর্থে আদৌ Folk নয়। পুজোর উপলক্ষে রস-এর প্রবর্তনাই যেন মূল লক্ষ্য। আগমনী থেকে বিজয়ার দিনে সম্পন্ন গেরস্থের ঘরে বাপের বাড়ি আসা বিবাহিত মেয়ের সঙ্গে মায়ের নৈমিত্তিক যে সব আলাপ সম্ভব, তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাওয়া হয়েছে। বিষয় সীমিত, ঘরকন্না, জামাই-মেয়ের সম্পর্কের টানাপোড়েন ও দেখভালেই কথা সীমাবদ্ধ। সব কিছুই মা মেনকার চোখে, তাঁর চাউনিতেই ধরা পড়ে সামাজিক অসঙ্গতি, পারিবারিক দৈন্য, বিবাহিত মেয়ের অসহায়ত্ব, সব ছাপিয়ে ক্ষণ আনন্দ।

"তুমি না এলে এখন, যেতো মা জীবন,
মায়ে ঝিয়ে দেখা হতো না।
এখন জুড়ালো হৃদয়.....।"

কিন্তু এই পাওয়াটা ক্ষণিকের, খেলাটা ভাঙবার জন্যই। মেয়েকে যেতে হবে, মেয়ে যাবেই, কেউ কাউকে আটকাতে পারে না।

"বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশমাতা, ডাকে বার বার।"

উমাকে বিদায় দেবার সময় মা মেনকা শুধু

বলতে পারেন,

"এস মা, এস মা উমা, বলো না আর
'যাই, যাই'।
মায়ের কাছে হৈমবতি, ও কথা মা
বোলতে নাই।"

পুজোটা তো একটা 'ফ্রেম' মাত্র, প্রতি বছরে অনুষ্ঠানটি ঘুরে ফিরে আসে। চলে চারদিন ধরে, শেষ দিন বিজয়া ও বিসর্জন। এই আনুষ্ঠানিক রীতির কাঠামোয় গড়ে উঠছে উনিশ শতকীয় গানের একটি ধারা, পারিবারিক বোধের অনুভব ও তার প্রকাশ, মা ও মেয়ের বিশেষ বন্ধন। এই বিশেষ টানটার কোনও প্রকাশ আমরা মধ্যযুগে দেখি না। হয়তো রামপ্রসাদে সূচনা। কিন্তু উনিশ শতকেই সবাই এই সঙ্গীতে হাত মকশো করছেন, বিশেষ পরবকে ঘিরে বার বার পারিবারিক গাথার আনন্দ ও দুঃখের মুহূর্তকে শাশ্বতের মর্যাদা দিচ্ছেন। বাৎসরিক পুনরাবৃত্তিতে, পুজোর অনুষঙ্গে, ঘরের কথা হয়ে উঠেছে সাহিত্যের নিত্য উপজীব্য। পারিবারিক অনুভূতির কাছে তুচ্ছ হয়ে উঠছে অন্যান্য জাগতিক ও পারলৌকিক প্রাপ্তির দাবি।

তিন

শারদীয় সাহিত্য ও কৃষ্টিতে আগমনী গান যদি বাঙালির উনিশ শতকীয় সংযোজন হয়, 'মহিষাসুর মর্দ্দিনী' তবে বিংশ শতকের সংযোজন। একেবারে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা, বেতার ও আকাশবাণী কলকাতার ফসল পঙ্কজকুমার মল্লিক বার বার বলেছেন টিম স্পিরিটের কথা, এই প্রোগ্রাম রচনায় উল্লেখ করেছেন পরম সুহৃদ বাণীকুমার (বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য) ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ভূমিকা। কীভাবে প্রচার মাধ্যম ঐতিহ্য তৈরি করে পঙ্কজ কুমার মল্লিক তার একটা বিবরণ দিয়েছেন।

"আমাদের মনে হঠাৎ একটা পরিকল্পনা জেগেছিল। ধর্মপ্রাণ বাঙালী হিন্দুর ঘরে বার মাসে তেরো পার্বণ। আর, সব পার্বণের বড় পার্বণ দুর্গাপূজা—মহাদেবীর আবাহন। আমরা ভাবলাম, দশভুজা দুর্গতি নাশিনীর বার্ষিক আরাধনার শুভ উদ্বোধন যদি একটি সাড়ম্বর বেতার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে করা যায় তো কেমন হয়।"

যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। বাণীকুমার ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র অশোকনাথ শাস্ত্রীর সহযোগিতায় গ্রন্থনা ও পাঠ তৈরি করে ফেললেন। ১৯৩২ সালে প্রথমবার অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয় ষষ্ঠীর দিনে। পরে সময়সূচী বদলে যায়, অনুষ্ঠান শুরু করা হয় মহালয়ার ভোরে। পঙ্কজ কুমারের স্মৃতিচারণের ভঙ্গিটা নজর কাড়ে,

"দেবীপক্ষের আরম্ভের প্রাক্কালে পবিত্র মহালয়া তিথির সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা যখন যাবেন পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গায় পিতৃপুরুষের তর্পণ করতে, তখন সেই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা দেবী মহিষাসুরমর্দ্দিনীর বন্দনা করে দেবীপক্ষকে আবাহন করলে, তা অনেক বেশী মনোজ্ঞ হবে।... আমরা চেয়েছিলাম, এই গীতময়, মন্ত্রময় ও স্তোত্রময় চণ্ডীবন্দনায় বাঙালী-হিন্দু মহালয়ের প্রত্যূষে সুপ্তোত্থিত হয়ে উঠবেন, এই ধ্বনি শ্রবণ করতে করতেই তাঁরা মহাদেবীকে স্মরণ করে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর দিকে যাত্রা শুরু করবেন পিতৃপুরুষের তর্পণার্থে। আমরা সফল হয়েছিলাম।"

> 'ঐতিহ্য'কে আলাদা করে না চিনলে ঐতিহ্য বানিয়ে তোলা অসম্ভব। বাঙালির পূজার আনুষ্ঠানিক গণ্ডিকে ছাড়িয়ে যে কথাসাহিত্য, আখ্যানগীতি গড়ে উঠেছে, তাতে একই সঙ্গে ধর্মকে স্বীকার করে এবং তাকে ছাপিয়ে এই ভাঙাগড়ার খেলা দেখতে পাই।

১৯৩২ সালের কথা ভেবে বলছেন ৭০-এর দশকে। নানা প্রতিসরণ ঘটেছে তাঁর স্মৃতিতে। ধর্মভীরু পঙ্কজ কুমার বার বার 'হিন্দু' কথাটা বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে জানাতে ভোলেননি যে মুসলমান সঙ্গীতযন্ত্রী ভ্রাতাদের কথা, তাঁরা অসঙ্কোচে যন্ত্রানুসঙ্গে সাহায্য করেছেন।

তবুও সর্বজনীনতায় পার্থক্য আসছে, হিন্দু ও মুসলমানের সহযোগিতাকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে হচ্ছে। 'মহিষাসুর মর্দ্দিনীর' পালা অন্য তানে বাঁধা, রামের গল্পটা সেখানে নেই, আগমনীর আকুলতাও অনুপস্থিত। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী থেকে কাহিনী নেওয়া, মেধস মুনির কাছে সুরথ রাজা গল্প শুনছেন। সংস্কৃত পাঠ, তার সঙ্গে আধুনিক গান। প্রথম দিকের অনুষ্ঠানে গানগুলি একেবারে জমেনি, এই কথা পঙ্কজ নিজে স্বীকার করেছেন। পরে বিমলভূষণ, দ্বিজেন, শ্যামল সন্ধ্যা ও সুপ্রীতির গলায় 'নমো চণ্ডী' অথবা 'বাজলো তোমার আলোর বেণু' শ্রোতাদের মন মাত করে দিয়েছিল। রসমধুর সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি, তার সঙ্গে সুরে বাঁধা গান, জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী—পরিবেশনা একেবারে আধুনিক, সুর উদাত্ত, ঝোঁকটা ভক্তি ও আকুতির চাইতেও মনকে জাগিয়ে তোলার দিকে। আসন্ন উৎসবের মেজাজ তৈরি করে দেওয়াই উদ্দেশ্য। এখানেও পৌরাণিক ফ্রেম বদলে গিয়ে তৈরি হচ্ছে আধুনিক উৎসব উদযাপনের ধারণা, সব কিছুই হচ্ছে মার্গীয় ভঙ্গিতে, আধুনিকের সুরে।

চার

হিন্দি সাহিত্যের বিখ্যাত পুরুষ সূর্য কান্ত ত্রিপাঠী, 'নিরালা' আমাদের ঘরের লোক, মহিষাদল ও কলকাতার ছেলে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রামাণিক ও সুললিত অনুবাদ তিনি করেছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতাও হিন্দীভাষীদের কাছে তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে কলকাতায় তিনি 'রাম কী শক্তিপূজা' নামে কবিতাটি লেখেন। কবিতাটি প্রসিদ্ধি অর্জন করে, এম.এর. পাঠ্য হয়, কবিতাটির উপর একাধিক 'নোট'ও বার হয়। ত্রিপাঠীর রাম আশা ও নিরাশায় ভোগেন, তিনি দ্বিধান্বিত, কী করবেন ঠাওর করতে পারেন না। শুভের পক্ষে তিনি, অথচ জগৎ জুড়ে তো রাবণেরই জয়। নীলোৎপলের গল্পটা এই কবিতাটিতে পড়া হয় ব্যক্তির সার্থকতা অন্বেষণের আখ্যান-রূপে। এই আধুনিক পাঠে ত্রিপাঠীজি ঐতিহ্যের যে রূপান্তর করছেন, তা ঐতিহ্যের সঙ্গে দূরত্ব অনুভব না করলে ঘটানো সম্ভব নয়।

একইভাবে কোনও না কোনওরকমে 'ঐতিহ্য'কে আলাদা করে না চিনলে ঐতিহ্য বানিয়ে তোলা অসম্ভব। বাঙালির পূজার আনুষ্ঠানিক গণ্ডিকে ছাড়িয়ে যে কথাসাহিত্য, আখ্যানগীতি গড়ে উঠেছে, তাতে একই সঙ্গে ধর্মকে স্বীকার করে এবং তাকে ছাপিয়ে এই ভাঙ্গাগড়ার খেলা দেখতে পাই। বটতলার কৃত্তিবাস, শাক্ত পদাবলীর গীতিকার বা মহিষাসুরমর্দিনীর পালাকাররা ঐতিহ্যের আবৃত্তির ছলে কিন্তু তাদের সময়মাফিক আধুনিক। নিজেদের সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁরা নিজেদের মতো করে গড়ে তুলছেন ঐতিহ্যকে, তারপরে সেই বানিয়ে তোলা জিনিসের গায়ে অতি প্রাচীনের লেবেল লাগিয়ে হাজির করছেন আমাদের সামনে। প্রাচীনের ছলে যেন নবীনই কথা বলছে, অথচ ছলটা আছে। এই ছল-রাখাটাই কি ঐতিহ্যের আধুনিকতার একটি লক্ষণ?

আজও কি বাঙালির শারদীয় কৃষ্টি সেই ছলেরই এক রকমফের নয়?

মাতৃবিপ্লব থেকে মার্কসবাহিনীর ফেরার সব পথ আজ বন্ধ

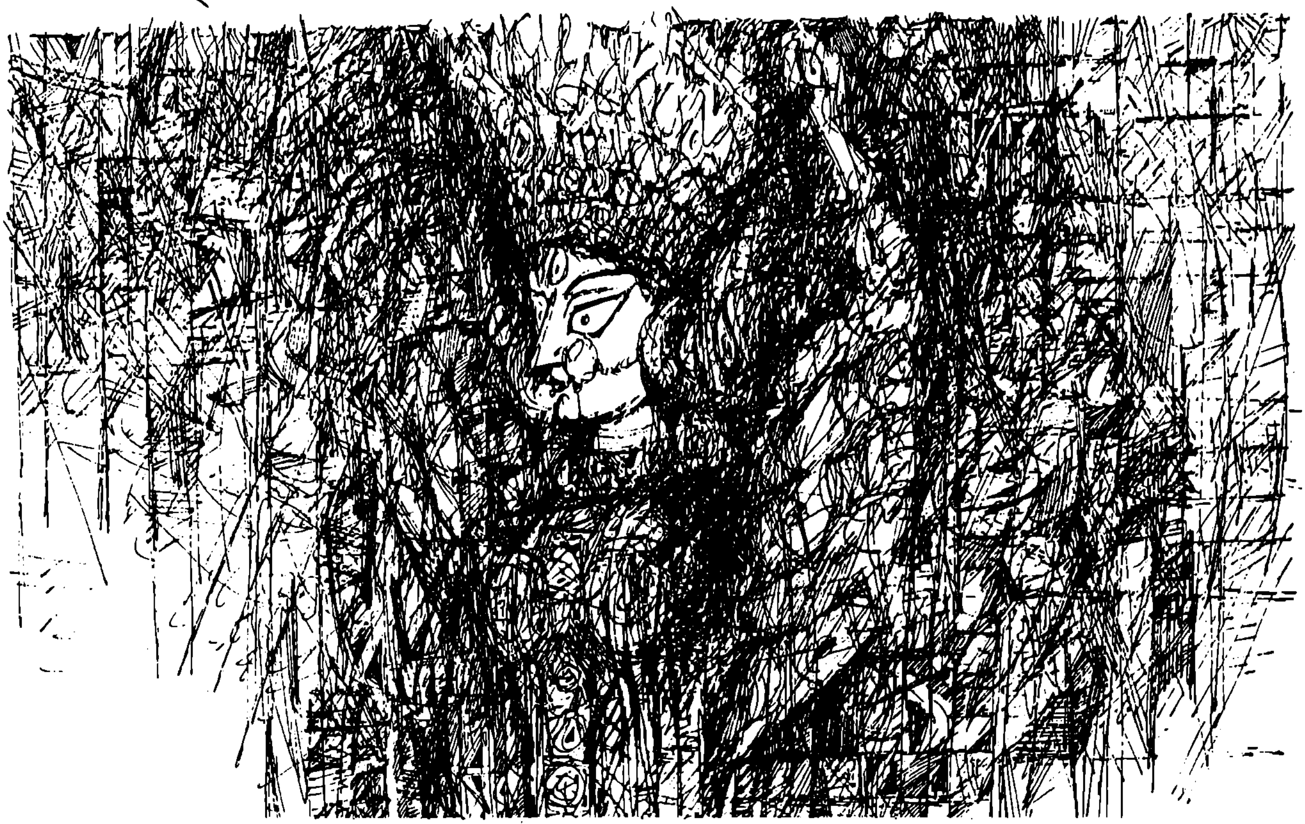

বাংলার মহিষমর্দিনী বনাম মার্কসবাহিনী

রা ঘ ব ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

মহিষমর্দিনী, সিংহবাহিনীকে যতটা সেকুলার বলে চালানোর চেষ্টা দেখি এবং দিনদিন সেই চেষ্টার যত বাড়বাড়ন্তই হোক না কেন, রণরঙ্গিনী আদৌ ততটা সেকুলার নন। মা যা ছিলেন সে কথা শিকেয় তুলে রেখে, মা যা হয়েছেন সেইদিকে আলোকসম্পাত করলেই প্রসঙ্গটি একেবারে জল হয়ে যাবে।

বারোয়ারি, সর্বজনীন ইত্যাদিতে মাতৃপূজার যে নবরূপ, ১৯২৬ সালকে অনায়াসে তার প্রারম্ভকাল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সর্বজনীন দুর্গাপুজোর ব্যাপক প্রচলন তখন থেকেই শুরু, অন্তত কলকাতায়। ঠিক তার আগেই ঘটেছে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। সর্বজনীন দুর্গোৎসবের আবির্ভাবকে তাই হিন্দু সংহতির এক প্রয়াস হিসাবে ঘোষণা বা বর্ণনা করলে খুব একটা ভুল কিছু বলা হবে না।

এইখানেই পূর্ণচ্ছেদ, এমন কিন্তু নয়—আছে দেবী-বিবর্তন, তাঁর ক্ষমতার, ভোটের সিম্বল হয়ে ওঠা। কর্পোরেট বদান্যতা, প্রকারান্তরে বিনিয়োগে মা ঐশ্বর্যশালিনী, জমকপূর্ণ যেমন হলেন, তেমনই আজ মকবুল ফিদা হুসেন যদি সেই বারোয়ারি পুজো উদ্বোধন করেন, তা হলেও কোনও ভাটপাড়ার পণ্ডিত নিশ্চয়ই রে-রে করে তেড়ে আসবেন না। উলটে ছেলেছোকরা-চ্যাংড়ারা দাবি করতে পারে মাতৃমূর্তি তা হলে সেক্সি মাধুরী হোক। সারকথা, সর্বজনীন দুর্গোৎসব হিন্দু সংহতির দ্যোতক হিসেবে শুরু হলেও মা আজ যথার্থই সেকুলার। এই নবরূপ নির্মাণে কমিউনিস্টদের অবদান অসীম। দেবীও তাঁর বামমার্গী সন্তানদের নেহাত রিক্ত রাখেননি। সস্নেহ

আলিঙ্গনে টেনে নিয়েছেন পুজো কমিটিতে, চণ্ডীপাঠ করিয়েছেন, মার্ক্সবাদী পুরোহিতের পুজোর ফুলও গ্রহণ করেছেন আহ্লাদে।

মাতৃরূপের আরও বহু বিবর্তন যে ঘটবে তাতে সন্দেহ নেই। মহিষাসুর বৈরী, মা তবু তাকে স্থান দিয়েছেন নিজের যৌথ পরিবারে। চাল কলা নৈবেদ্যের ভাগ সে রীতিমত পাচ্ছে। আফিম অমৃতে রূপান্তরিত হওয়ার আগে কমিউনিস্টরাও দশভুজার শত্রুই ছিল। ধর্ম তখন তাদের কাছে আফিম। কী ভাবে, কোন রণকৌশলে দুর্গা কমিউনিস্ট কোতল করলেন এবং তাদেরও ধীরে ধীরে স্থান দিলেন পুজোপ্রাঙ্গনে, ভক্তি ও উৎসবের কোরাসে ঝাণ্ডার লাল রঙ নিশ্চিহ্ন করলেন, এইটি যথার্থ সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়। সেই পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণী শক্তি কোথায়! যুদ্ধ বিবরণটি আমাদের সামনে আছে কিছু ফাঁকফোকর সমেত। অনেক-অনেক জায়গা পাঠক অনায়াসে ভরে নিতে পারবেন নিজের স্মৃতি ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে। মাতৃদেবীর বর্তমান রূপ-প্রসঙ্গটি কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে রেখে আমরা এক ঝলক দেখে নিই বরং—মা কী ছিলেন।

সিপাহি বিদ্রোহ, বা কার্ল মার্ক্স কথিত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের বছর তিনেক আগে (১৮৫৪) সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয়-স্তম্ভে প্রকাশিত কলকাতার দুর্গোৎসব বিবরণের অংশবিশেষ:

"নগরে মহামায়া মহেশ্বরীর মহা মহোৎসব অতি সমারোহপূর্ব্বক নির্বাহ হইয়াছে ... শোভাবাজারস্থ নৃপতিদিগের উভয় নিকেতনে নৃত্য গীতাদির মহাধুম হইয়াছিল, সাহেবরা নিমন্ত্রিত হইয়া সেই নাচের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, লোভ দেবের প্রিয় শিষ্য শ্বেতাঙ্গ ও আন্দ্রু পিন্দ্রু গোমিস ও গানসেলবস্ প্রভৃতি কৃষ্ণাঙ্গগণ যাঁহারা মোদের বেলাত ও মোদের কুইন বলিয়া গর্ব্ব পর্ব্ব বৃদ্ধি করেন তাঁহারা এই পুজোপলক্ষে রাজভবনে উপস্থিত হইয়া বিলক্ষণরূপে উদর পূরণ করিয়াছেন।"

হিন্দু পার্বণে সাহেবদের জন্য 'নো এন্ট্রি' বোর্ড লটকে দিতে কেউ যে চাননি এমন নয়। কিন্তু হঠাৎ ধনীরা কেন তা শুনতে যাবে! এই নব্য বাঙালিরা সার বুঝেছিল অর্থ আর প্রতিপত্তিই মোক্ষ। সেই মোক্ষলাভে দেবীপৃষ্ঠে আরোহণ গর্হিত কোনও অপরাধ নয়। সংবাদ প্রভাকরের মন্তব্য, ইংরেজ পক্ষপুটে পুষ্ট হঠাৎ ধনী বাঙালিরা "সাহেবদের নিমন্ত্রণ করে নাচ-গান-পানভোজনে তাঁদের পরিতৃপ্ত করার জন্য এতদূর অশোভনভাবে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন যে তাতে যে উৎসবের গাম্ভীর্য কলুষিত হত সে-সম্বন্ধে তাঁদের চৈতন্য পর্যন্ত লোপ পেয়েছিল।" এই প্রকার সমালোচনা, সদ্য ধনবান বাঙালিরা বিধবার বাতিক হিসেবে দেখেছিলেন বড়জোর। সাহেবের দাক্ষিণ্যলাভে দেবী শক্তির ব্যবহার এতে এক বিন্দু কমেনি। বরং মা যে প্রকৃতই ক্ষমতার আধার, বিষয়কর্মের জীবনেও বাবুরা তা বেশি বেশি করে টের পেতে থাকলেন। পৌত্তলিক বলে ঠাট্টামস্করা নয়, মৃণ্ময়ীকেন্দ্রিক উৎসবের তেজে লালমুখোরা অভিভূত, ব্যবসার নতুন-নতুন চুক্তি ও ইজারাদারি দুহাতে বিলোতে লাগল তারা।

আমাদের এই স্যাঁতসেতে আবহাওয়া, জলাভূমি আর গুমোট গরমের মুলুকে শিল্পবিপ্লবোত্তর বুর্জোয়া কোথায় পাব। নাদুবাবু-ছাতুবাবু-লাটুবাবুরাই ভরসা। আর তাঁদের ভরসা হলেন স্বয়ং দুর্গতিনাশিনী। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল মুৎসুদ্দীচরিতে এ না হয় খাপ খেয়ে গেল, তাই বলে বিপ্লবসাধকরাও আশ্রয় করবে মাতৃচরণ!

হায়, বাঙালির বুঝি মা ছাড়া কেউ নেই! এমন মা-ন্যাওটা জাত পৃথিবীতে আর একটিও মিলবে না। এমনকী বাঙালির দেশপ্রেম, বাঙালির জাতীয়তাবাদ সমস্তই মাতৃচ্ছায়ায় প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। একটিই ধ্বনি শুনি—মা! মা!

গ্রিক পুরাণের পার্সিফোনে নন আমাদের দুর্গা, নীরদ চৌধুরীর মতে বরং ওই গ্রিক দেবীর সঙ্গে উমার অমিলই বেশি। কিন্তু ভক্তদের প্রশ্নে উভয়ের ভূমিকাই কি এক নয়? পশু রক্তের বিনিময়ে পার্সিফোনেও ভক্তদের শক্তি প্রদান করেন। মার্ক্সবাদী পণ্ডিত ডি ডি কোসাম্বি দুর্গা রহস্যভেদে মহেঞ্জোদারোর প্রস্তরমূর্তিতে এমন এক শিব আবিষ্কার করেছেন যাঁর মাথায় রয়েছে মহিষের সিং। গোপালকদের দেবতা হিসেবে একসময় মহিষপুজোর প্রচলন ছিল—মাসোবা নাম তার। এই মাসোবাই পরে মহিষাসুর হয়ে ওঠে। দুর্গাকে মহিষাসুরমর্দিনী খেতাব অর্জন করতে হত্যা করতে হয়েছে মহিষাসুরকে। কোসাম্বির অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক বিবর্তন লক্ষ করা। মুৎসুদ্দি-সন্ত্রাসবাদী-জাতীয়তাবাদী এবং শেষে কমিউনিস্ট স্পর্শে দুর্গার বিবরণনামার সেখানে কোনও স্থান নেই।

সন্ত্রাসবাদী দেশপ্রেমিক নলিনীকান্ত গুপ্ত দুর্গার কাছ থেকে ধার, উপহার বা আশীর্বাদ হিসাবে শক্তি সংগ্রহের কথা সরাসরি বলেননি। কিন্তু বারবার বলেছেন দুর্বলতার কথা, ভারতবাসীর ক্ষুদ্রতার কথা। "আর আজকালকার মানুষ দেখ—সবই তার ছোট ক্ষুদে, টুকরো। ... তার ধর্ম মানে—অবশ্য যেখানে ধর্ম এখনও বেঁচে আছে—ভাল মানুষটি হয়ে থাকা,—সাত্ত্বিক প্রকৃতির হয়ে দুচারটা বাঁধা নীতির গৎ ধ'রে চলা। এ যেন ছোট্ট একটুকু ধুক্‌ধুকে প্রাণ ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে চারদিকের টানের প্রলোভনের ভিতর দিয়ে কোন রকমে পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছে।"

এইসকল মানুষ স্বরাজ গঠনে সক্ষম হবে ভাবাটা আকাশকুসুম কল্পনা বই কিছু নয়। শক্তি চাই, দৃঢ়তা চাই, হয়ে উঠতে হবে নিজেদের মাপের চেয়ে অনেক বড়, বিপুল। শক্তিরূপিনী দুর্গার শরণ ছাড়া তখন আর উপায়ই-বা কী!

ধর-পাকড়ের যুগের বিবরণ পেশ করেছেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। বারীন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন:

"... জীবন আমাদের ভগবদমুখী হইবার আর এক কারণ, বঙ্গ-ভঙ্গের পরে আমাদেরই একজন বড় কাজের কাজী "ভবানী মন্দির" বলিয়া একখানি পুস্তিকা লেখেন। তাহার মর্ম এই যে, নিভৃত পর্বতগুহায় ভবানীর মন্দির হইবে, সেইখানে সাধনায় সিদ্ধ শক্তিমান আধারে ভগবতী বিগ্রহ ধরিয়া দেশকে মুক্তিযজ্ঞে দীক্ষা দিবেন। আমাদের পাগল করিবার যেটুকু বাকি ছিল, তাহা এই "ভবানী মন্দির" করিয়া ছাড়িল। বইখানির লেখা যেমন অপূর্ব শক্তিব্যঞ্জক, বিষয়ও তেমনি মনপ্রাণ-ভরা, তাই সেই অবধি এই নেশায় আমাদের পাইয়া বসিল।"

আন্দামানফেরতাদের মধ্যে কেউ কেউ পরে শক্তির পথ ছেড়ে ভক্তির পথ ধরেছিলেন। বারীন্দ্রের জীবনের শেষ পর্বে যেমন ছিল—"... শুধুই শান্ত নীরবতা, অনন্ত বিশ্বাস উর্দ্ধমুখে আপনাকে মেলিয়া অপেক্ষা।"

তাই বলে ভবানী মন্দিরের দরজা চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়নি। শত্রুনাশিনীও অবহেলা, অবজ্ঞায় ধুলিধূসর হননি। ভবিষ্যতের সন্তানরা তো নির্বিবাদে বেড়ে উঠছিল গোকুলে। মায়ের এই নব্য সন্তানরা বামমার্গী এবং তারা তখন টেরও পায়নি আদ্যাশক্তির বিরুদ্ধাচারণ শেষ পর্যন্ত শত্রুরূপে ভজনাতেই থেমে থাকবে না। জগৎসংসারের বিপত্তারিণীর বরাভয় ছাড়া ভোটসমুদ্র সন্তরণও যে অসম্ভব, একথা তারা ক্রমে বুঝতে পারে।

কম্যিউনিস্ট নেতাদের জন্মপত্রিকা ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে এই নেতৃবর্গের আতুঁড়ঘর দুটি: বিলেত এবং আন্দামান। অতীতের সন্ত্রাসবাদী তথা আন্দামান, কারাগার এবং উচ্চশিক্ষার্থী উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তের সন্তান যারা বিলেতে সাময়িক তাঁবু ফেলেছিল। দুই-ই কালাপানিফেরত। বিলেতফেরত ব্যারিস্টার আর প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদীদের এই জোটের মধ্যে তাই কোথাও সংগোপনে 'মা' থেকেই গেলেন।

গীতার বদলে অ্যানার্কিস্টরা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো হাতে তুলে নিলেন, নিজেদের ধর্মীয় ঐতিহ্য অস্বীকারের প্রবল প্রয়াসও দেখা গেল। ফলে, অন্তত কিছুকালের জন্য মাতৃ বিসর্জন যে ঘটেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিলেতফেরত কমিউনিস্টরা তাদের কৈশোর ও তারুণ্যের দিনে পুজোর উৎসবের একটা তীব্র টান অনুভব করত এবং সেইসঙ্গে বামুনকায়েতের এই বংশধরদের অনেকের বাড়িতেই ছিলেন কুলদেবী, ঠাকুরঘর এবং পুজো-আচ্চার বাইরে এরা কেউই ছিল না। গুটিকয় ব্রাহ্ম বাদে।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনী 'তরী হতে তীর' গ্রন্থে সামান্য সংশয় কুচোসমেত হলেও কবুল করেছেন—"পুজোর কথা ভাবলে মনে পড়ে তখনকার আরতির কথা, সেখানে ছুটে যাওয়া এবং শেষ হলে ভূমিষ্ঠ হয়ে দেবীকে প্রণাম (যা সেই স্মরণাতীত কালে স্বাভাবিকভাবে করা যেত, ভক্তিরসের বিন্দুমাত্র সিঞ্চন বিনাই!)। ... দুর্গাপুজোর সময় অবশ্য ঠাকুর দেখে বেড়িয়েছি কিছুটা ... পুজো অবশ্য মনকে নাড়া দিত, এখনো কিছুটা দেয়—"

স্বাভাবিকের বিরুদ্ধে, মনের নাড়ার বিরুদ্ধে যে যাত্রা, তার প্রত্যাবর্তন একপ্রকার অনিবার্য। যদিও মাও জে দঙ্ বলেছেন—ধারা বিরোধী হওয়াটাই মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী সাধনা। দেশজ মার্ক্সবাদীরা মাতৃসংস্কৃতির থেকে বেশি দূরে এবং বেশি দিন অবশ্য পালিয়ে থাকতে পারেনি। সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে একটু এদিক-ওদিক করে সেই পলাতক বাহিনী সম্পর্কেও হয়তো বলা যেত—কোথায় পালাবে? ছুটবেই বা আর কত? তেভাগা-তেলেঙ্গানা অন্তে ফেলে আসা পদরেখা ধরেই আবার এসো হে ফিরে নিজ মাতৃক্রোড়ে।

মা নিজে করুণাসমুদ্র হলেও তাঁর মুগ্ধ সন্তানরা তো ঠিক সেরকমটা ছিল না। ক্ষুদ্রতা, সংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীলতাও ত্রিনয়নীকে বলয়-বন্দি করতে কম উদ্যোগী হয়নি। সুলেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর দেশের বাড়ির পুজোর বিবরণে স্মৃতি হাতড়ে টেনে এনেছেন এমনই একটি ঘটনা।

"একবার আমাদের একঘরে করা হল—চার পাঁচশো লোকের খাওয়া ফেলা গেল ... কারণ পুজোর দালানে কর্তারা যে ফ্রী স্কুল খুলেছিলেন তার মাস্টারমশাই-এর স্ত্রী নাকি বিবাহিতা স্ত্রী নন। তাঁকে গ্রাম থেকে না তাড়িয়ে গ্রামের মোড়লরা জলগ্রহণ করবেন না। ব্যাপার সত্য কি মিথ্যা কেউ খুঁজলো না। দ্বিতীয় দিনে কম্প্রোমাইজ হল, পনেরোজন ব্রাহ্মণ মোড়লকে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে।"

মার্ক্সবাদ তখন পর্যন্ত 'সর্ব শক্তিমান' হয়ে ওঠেনি অন্তত এই দেশে। দেবীর জয়গান মুখরিত দিনে ধূর্জটিপ্রসাদের গ্রামে স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ দিয়ে ঠেকাতে হচ্ছে এক নারীরই অবমাননা। কিন্তু নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে কমিউনিস্টদেরও কি কোনও বৈপ্লবিক চিন্তা দেখা গিয়েছে? বাম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পুলিশের গুলিতে নিহত সরোজকুমার দত্তের সততা সম্পর্কে কারও কোনও প্রশ্ন নেই। 'পরিবার ও কমিউনিজম' শীর্ষক নিবন্ধে সরোজ দত্ত আমদানি করলেন প্রায় এক ঐশ্বরিক পবিত্রতা।

" ... বিপ্লবের ফলে শ্রেণী, জাতি, ধর্ম ও বর্ণের কুসংস্কারের বিলুপ্তি—এই দুয়ের ফলে

> সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে একটু এদিক-ওদিক করে সেই পলাতক বাহিনী সম্পর্কেও হয়তো বলা যেত— কোথায় পালাবে? ছুটবেই বা আর কত? তেভাগা-তেলেঙ্গানা অন্তে ফেলে আসা পদরেখা ধরেই আবার এসো হে ফিরে নিজ মাতৃক্রোড়ে।

নরনারীর প্রণয়নের ক্ষেত্রে এমন একটি পবিত্রতা দেখা দেয়, বুর্জোয়া সমাজে যা কল্পনার অতীত। কোন অনুশাসনের ভ্রূকুটি নেই, অবাধে পরস্পরকে ভালবেসে দুইজনে মিলিত হয়ে একটি শান্তির নীড় ... এর নৈতিক পবিত্রতা অস্বীকার করবে কে? তারপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ..." ইত্যাদি, ইত্যাদি।

হয়তো মূল প্রতিপাদ্য থেকে সামান্য সরে এসেছি আমরা—একে মার্জিনের নোট বলে গণ্য করা হোক। গ্রামের ব্রাহ্মণ মোড়লদের যেখানে আপত্তি, ঠিক সেই জায়গাটিতে, অর্থাৎ বিবাহবহির্ভূত সহবাস তো কমিউনিস্টদের কাছেও গ্রহণীয় ছিল না, বিবর্তনের দীর্ঘ যাত্রায় মা আজ মূর্তীমতী ফেমিনিস্ট। উলটো দিকে গ্লাসনস্ত-পেরেস্ত্রৈকা-বার্লিন প্রাচীর চূর্ণ হওয়া ইত্যাদিতে মার্ক্সবাদী 'পবিত্রতার' বহু বাঁধনও শিথিল হচ্ছিল একটু-একটু করে। মা এগিয়ে যাচ্ছেন কোমরে ঘুনসি বাঁধা অবুঝ, দুরন্ত শিশুটির দিকে—আর ধুলোকাদা মাখা, ক্লান্ত, প্রায় ঘুমে চোখ জুড়ে আসা শিশুটিও টলতে-টলতে এগিয়ে আসছিল মায়ের দিকে। স্বামীপুত্রকন্যায় পরিপূর্ণ সংসারের হিরণ্যগর্ভাও তো এই দেবীই। রণক্লান্তদের তিনি সস্নেহে কোলে তুলে নিলেন, মাতৃদুগ্ধে মুছে গেল ক্লান্তি ও জীর্ণতার সব দাগ, সব মালিন্য।

পরিণত বয়সেও 'বাগবাজারী বখাটে ভাব' যিনি কাটিয়ে উঠতে পারলেন না, গঙ্গাতীরে 'নিতম্বিনীদের মুক্তকেশ লঘুবেশ স্নান ও ঢলানি'-র কথা তাঁর স্মৃতিতে 'বাবু বৃত্তান্ত' লেখার সময়ও উজ্জ্বল। কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম না লেখানো সেই বামপন্থী সমর সেনের একটি চোখা মন্তব্য: "কিষাণ সভাগুলি ম্রিয়মাণ হয়ে এল, প্রকট হল শহরভিত্তিক রাজনীতি, যেটা ভারতীয় সমাজে ব্যাপক দুর্নীতির একটা কারণ।"

যুদ্ধ, মন্বন্তর, বাম হঠকারিতা ইত্যাদির পর কমিউনিস্ট পার্টি তখন বেশ ভদ্র, গেরস্থ গোছের হয়েছে। শুয়োরের খোঁয়াড়ের মুখোশ উন্মোচনের কথা ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করে আসলে টলতে টলতে ফিরে আসছে মহামায়ারই সূক্ষ্ম তন্তুহীন জালের আওতায়—সংসদীয় পথে।

মার্ক্সবাদীদের এই ফিরে আসাটাকে মস্করা করে কেউ-কেউ বলতেই পারেন—খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, কিন্তু তাতে দ্বন্দ্বের দিকটা ঠিক পরিস্ফুট হবে না। সন্ত্রাসবাদীদের যুগেই আকাশ-পাতাল ব্যবধান মোচনকারী 'মা' 'মা' রব উঠেছিল সবথেকে বেশি। বিলেতফেরত মার্ক্সবাদী ও প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদীদের সম্মিলনে সৃষ্ট কমিউনিস্ট নেতৃত্ব তেভাগা-তেলেঙ্গানা পর্যন্ত মহামায়ার আশপাশে বিশেষ ঘোরাঘুরি করেনি।

প্রত্যাবর্তনপর্ব সমর সেনের কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে— " ... শক্তির আরাধনা আবার শুরু হয় সন্ত্রাসবাদীদের সময়ে। মার্ক্সবাদের প্রভাবে রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে এটা কমে যায়। সম্প্রতি যে আবার বেড়েছে সেটা অবশ্য খুব আনন্দের কথা নয়, কেননা সেটা বেড়েছে বিশেষ করে মস্তান ও তাদের সাকরেদদের মধ্যে, রাজনীতির ব্যবস্থাপনায় যাদের প্রভাব সবাই জানেন। তাছাড়া মাতৃকুল বেশ জমজমাট—কেন্দ্রে তো আছেনই, এদিক ওদিক অনেক মা আছেন যাঁদের শিষ্যশিষ্যা বিস্তর, তাছাড়া মনের মধ্যে ভারতমাতা বিরাজ করছেন। এক হিসেবে, অন্তত পশ্চিম বাংলায়, এই মায়ের যুগ ... ।"

সমর সেনে ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে

লিখেছিলেন মায়ের বিজয় কাহিনীর এই বিবরণ। ছাব্বিশ বছরে বদল যেটুকু, যতখানি, তাতে শক্তিরূপিনীর একচ্ছত্র আধিপত্যই গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। বাহাত্তুরে পুজো সম্পর্কে সমর সেন লিখছেন :

"এখন পুজোর সময়। মা-দুর্গা ঘরে আসছেন। অনাহার অত্যাচার সব ভুলে হিন্দুরা প্রতিমাপূজায় মন দেবেন। অনাহার, বেকারজীবন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনের কথা তোলা এ সময়ে পাপ। তাতে ভোট রঙ্গের কালে ক্ষতি হতে পারে। জননী, প্রতিমা, জন্মভূমি, স্বর্গ, নরক, সব এখন একাকার হবে। ... "

কমিউনিস্ট পার্টির বহির্মহল সম্পর্কে বামপন্থী এই কবি, লেখক যতটা অবগত ছিলেন, পার্টির অন্দরমহল অর্থাৎ তার সাংগঠনিক দিকটি সম্বন্ধে ছিলেন ততটাই অন্ধকারে। ফলে মা যখন মার্ক্সবাহিনীমর্দিনী, সমর সেন সেই উপাখ্যানের খলনায়ক হিসেবে কেবল মস্তান আর তাদের সাকরেদদের দেখতে পান। আন্দোলনের অভাব, জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নতাকে দায়ী করেন। সংখ্যাগুরু হয়েও সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতার কেন্দ্রে এই জনগণ নেই, বরং 'শিক্ষিত সমাজ', মধ্যবিত্ত এবং শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরাই তার নিয়ন্তা। শহরে দলীয় শক্তিবৃদ্ধির উৎকৃষ্ট উৎস হচ্ছে পুজো। মাতৃবিমুখ হয়ে থাকলে আখেরে ক্ষতিই হবে, প্র্যাগম্যাটিক জ্যোতিবাবুর দল সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল। তাই বলে দলীয় কর্মসূচিতে এই সংক্রান্ত একটিও বাক্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদিও পুজো কমিটি দখল অভিযান, পাড়ার সি পি এম কর্মী ও নেতাদের দুর্গাপুজোয় চাঁদার বই হাতে কড়ানাড়া শুরু হয়ে গিয়েছে ষাটের দশকের শুরুতেই।

ষাটে এসে পৌঁছনোর আগে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মীদের উপর দিয়ে কম ঝড়-ঝাপটা যায়নি। বারবার জেলখাটা এবং সুড়ঙ্গ জীবনযাপন ('আন্ডারগ্রাউন্ড লাইফ'-এর এই বঙ্গানুবাদ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় করেছেন) নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে রচনা করেছিল গভীর তৃষ্ণা। জগতের আনন্দযজ্ঞ শ্রান্ত, ক্লান্ত এই মানুষদের অনায়াসে টেনে নেবে, শুষে নেবে এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া আনন্দময়ী হৃদয়ের কোনও প্রায় বিস্মৃত কোণে অক্ষতই ছিলেন। হিটলারের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ঘোষণা করে রাহুল সাংকৃত্যায়ণ গীতার শ্লোকের আদলে নতুন শ্লোক রচনা করেছিলেন। তাঁর কাব্যপ্রতিভাকে বিশুদ্ধ রসিকতা বলেই বা গ্রহণ করব কেন?

"যত্র স্তালিন মহাজ্ঞানী
যত্র রক্তা চ কাহিনী
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি
ধ্রুবা নীতি মতির্মম।"

একথা আমরা বিস্মৃত হইনি, এককালে মাটির একটি বৃহৎ ডেলাকে ঘিরে আলো ঝলমল পাঁচদিনের হল্লার ব্যালান্সশিট কমিউনিস্টরা পাড়ার রকে বসে করতেন। দেখা গিয়েছে, এ বাবদ আমাদের বার্ষিক ব্যয় প্রায় শত কোটি। একটি হলদিয়া প্রকল্পের কাজ তাতে অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারত। কিন্তু বঙ্গদেশে সরকারি গদি কব্জা করার পর সেই ব্যয় বিরোধী ভাষণ-গুঞ্জন কিছুই শোনা যায়নি। বরং বামমার্গী সরকারের আমলেই বারোয়ারি অর্জন করেছে নবযৌবন। রাজ্যের অর্থমন্ত্রীকে দেখা গিয়েছে পুজোর কদিন যানশাসনে পথে নামতে। এমনকী গত বছর অগ্নিবিধি নিয়ে কড়াকড়িরও লাগাম টানা হয়েছে সন্তর্পণে, যাতে সরকারের ভাবমূর্তি পুজোবিরোধী না হয়ে ওঠে।

> **শহরে জনসংযোগের প্রশ্নে দলের প্রবল ভরসা যে আজ কেবল এই মহিষাসুরমর্দিনী! তাঁকে শত্রুভাবে ভজনা শুরু করে একবিংশ শতকের দোরগোড়ায় পৌঁছে হৃদয়ে স্থান দেওয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কী!**

সমর সেনের খেদেরও কোনও কারণ দেখি না। পুজোর হই-হট্টগোলের মধ্যে আন্দোলনের কথা দল ভুলে গিয়েছে এ কথা আদৌ সত্য নয়। গত বছরই সি পি এম নেতা, পঞ্চায়েত মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র পুজোর মরশুমে গড়ে তুলোছিলেন এযাবৎ অকল্পিত, অভিনব এক আন্দোলন। উচ্চ বর্ণের সঙ্গে একাসনে বসে শেষ পর্যন্ত পুজো করার অধিকার আদায় করে নিলেন গোপী বল্লভপুরের হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষজন।

কবে বারোয়ারি পুজো মণ্ডপের এক কোণে মলিন একখানি লাল বস্ত্রে ঢাকা স্টলে শীর্ণ, মধ্যবয়স্ক পাড়ার সি পি এম নেতা মাস্টারদাকে দেখেছি। মার্ক্সবাদের অ আ ক খ, ছোটদের রাজনীতি, এমিল বার্নস-এর মার্ক্সবাদ এবং সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক প্রকাশিত মহামতি লেনিন রচনাবলির বিশাল একটি ডালি প্রায় বুকে আগলে বসে কেবলই মাছি তাড়াচ্ছেন।

মার্ক্সবাদী সাহিত্যের স্টলগুলির স্কোয়ারফুট আজ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এমনকী সব পুজোমণ্ডপে তারা আর নিজেদের লাল শালুতেও ঘিরে রাখে না। পুজো কমিটিতে মার্ক্সবাহিনীর অধিষ্ঠান ঘোষণা করে পুজো বাজেটের একাংশ নানাবিধ কল্যাণ-ত্রাণমুলক কাজে খরচের বহর। প্যান্ডেলে-প্যান্ডেলে রক্ত পরীক্ষা করে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের ব্যবস্থা, জীবাণু-অসুর বিনাশে চরণামৃতে ক্লোরিনের ব্যবহার ইত্যাদির পিছনেও রয়েছে 'সমাজ সচেতন', 'দায়িত্বশীল' বাম বাহিনী।

এজাতীয় সংযোজন, উদ্ভাবন প্রতি বছরই ঘটতে থাকায় শিষ্যশিষ্যার বিপুল বাহিনী সমেত মহামায়াও পরিগ্রহ করছেন নবরূপ। মার্ক্সবাদী নেতা দেবীর সামনে ভক্তিগদগদ চিত্তে শুদ্ধ উচ্চারণে চণ্ডীপাঠ করছেন—পুজোর এ এক আলাদা আকর্ষণ। নেতারা পুজো উদ্বোধন করছেন এ ঘটনা তো কবেকার, তামাদি হতে চলল। পার্টি কি কোনও চেষ্টাই করেনি দলীয় নেতা ও সদস্যদের ভক্তিমার্গ থেকে সংগ্রামের পথে ফিরিয়ে আনতে? করেছে অবশ্যই, যদিও ফল শূন্য। দলীয় ফতোয়া, হুলিয়া অগ্রাহ্য করে পুরুতের ভূমিকা নিষ্টার সঙ্গে পালন করেছে আঞ্চলিক নেতারা। দল শাস্তি দেয়নি। চোখ মুদে এসেছে মায়ের প্রভাবে।

মাতৃবিপ্লব থেকে ফেরার সব পথ আজ বন্ধ। শহরে জনসংযোগের প্রশ্নে দলের প্রবল ভরসা যে আজ কেবল এই মহিষাসুরমর্দিনী! তাঁকে শত্রুভাবে ভজনা শুরু করে একবিংশ শতকের দোরগোড়ায় পৌঁছে হৃদয়ে স্থান দেওয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কী! অন্তরের অসহায়তা, গোপন-পরাজয় সমস্তই হজম করতে হচ্ছে ভোটপত্রের মহিমায়। মাতৃমহাকর্ষে তৃণ খণ্ডের মতোই ভেসে যাচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির নীতিকথামালা। দলের ভবিষ্যৎ কর্মসূচির (বাৎসরিক) কোনও এক দফায় মাতৃপুজা হয়তো একদিন একচিলতে জায়গাও পেয়ে যাবে। এ বড় যন্ত্রণার, বড় আক্ষেপের, লজ্জারও কথা। কিন্তু হায়, আর ফেরার পথ কোথায়!

আমরা এখানে কিঞ্চিৎ খেদের সঙ্গে হলেও ভারতচন্দ্র স্মরণ করি বরং—

"ভবিষ্যৎ ভাবি কেবা বর্তমানে মরে।
প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ করে।"

অঙ্কন : সুব্রত চৌধুরী

প্রতিমা তো বটেই, নির্মাণশৈলী. এমনকী পরিভাষারও বিস্তর বদল

কুমোরটুলির চারশো বছরের বিবর্তন

জয়ন্ত দাস

কলকাতার আদি কুম্ভকার সম্প্রদায়ের কাজ ছিল চাক ঘুরিয়ে হাঁড়ি কলসি থালাবাসন— এসব তৈরি করা। এঁদের বসতি গড়ে ওঠে জব চার্নকের আগমনেরও আগে। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে সরস্বতী নদী মজতে শুরু করলে এঁরা গঙ্গার লাগোয়া লোকালয়গুলিতে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছিলেন। এঁদের আদি নিবাস ধরা হয় সপ্তগ্রামকেই।

সেই আদিম কুমোরটুলির একটা ঝাপসা ছবি পাওয়া যায় নিরঞ্জন পাল বা যতীন্দ্রনাথ পালদের স্মৃতিচারণে।যে স্মৃতি তাঁরা পেয়েছিলেন পূর্বজদের গল্পকথায়। 'গঙ্গার এপারে কুমোরটুলির দিকটায় প্রায়ই পালের জাহাজ এসে ভিড়ত। আসত সিঙ্গাপুর থেকে নারকেল বোঝাই করে। এ পাড়ায় তখন বাঁশের বাখারির কয়েকটা ঘর মাত্র। তাতে সুঁদরি গরান আর শাল-বল্লার খুঁটি। মাথার উপরে হোগলার চাল। অনেক পরে আসে চোঙ খোলার টালি। সন্ধেবেলা ওই অঞ্চলে টেঁকা দায় হত। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত কুমোরদের পোয়ানের (উনুনের) ধোঁয়া। চোখ জ্বলত সেই ধোঁয়ায়।'

এই শতকের গোড়ার দিকে নিরঞ্জন পাল যখন কৃষ্ণনগর থেকে কুমোরটুলিতে আসেন তখনও এ পাড়ায় চাক ঘুরতে দেখেছেন। পোয়ানের ধোঁয়া তাঁকেও কাঁদিয়েছে। 'তখনও এ পাড়ায় মৃৎপাত্রের কারিগরের সংখ্যা নেই নেই করেও চল্লিশ শতাংশ। আর মূর্তিশিল্পী ষাট

Uttam Ji
DIGITAL ASTROLOGER cum PALMIST
अंक ज्योतिष हस्त रेखा विशेषज्ञ फीस 31/-
UTTAM JI
PALMIST /ASTRO-NUMEROLO
We Can not Chan
Suggest Practical
remedies to be Sucess ful on Life
(100% DEEP POINTED DIELING)
আপনার জিজ্ঞাসার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন। দেখুন ডিস্‌কভারি চ্যানেল।
Discovery CHANNEL
EXPLORE YOUR WORLD

শতাংশ। যাঁরা কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের কাছ থেকে শিল্পের কলাকৌশল রপ্ত করতে পারল তাঁরা রয়ে গেল, বাকিরা চলে গেল বালি, উত্তরপাড়া রিষড়া আর হাওড়ার দিকে।'

মিলেমিশে গেল সপ্তগ্রামের সঙ্গে নদিয়া। হাঁড়ি কলসির সঙ্গে মূর্তিশিল্প। কেমন করে? সেটি অনুপুঙ্খ লক্ষ করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি তাঁর বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীতে লিখলেন—'এই শহরের মধ্যেই এখনো তেমন সব পাড়া খুঁজলে পাওয়া যায়—কাঁসারিপাড়া পোটোতলা কুমরটুলি বাক্সপটি ইত্যাদি। এই সব জায়গায় শিল্পী কারিগর দু রকমের লোক আছে, যারা ওস্তাদ এক-এক বিষয়ে। ওস্তাদরা ঘরে বসে কাজ করছে, চেলারা যাচ্ছে সেখানে কাজ শিখতে—ঐ সব পাড়ার ছোট-বড় নানা ছেলে! সেখানে ক্লাসরুম টেবিল চেয়ার লাইব্রেরি লেকচার হল্‌ কিছুই নেই, অথচ দেখা যায় সেখান থেকে পাকা-পাকা কারিগর বেরিয়ে আসছে—পুরুষাণুক্রমে আজ পর্যন্ত। ...খেলতে খেলতে artist, artisan কারিগর শিল্পী হয়ে উঠছে যেন মন্ত্রবলে।'

মাটির মহিমা

লণ্ডনের ওয়েম্বলি পার্কে শুরু হয়েছে ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিবিশন। দেশ-বিদেশ থেকে এসেছেন নানা মাপের শিল্পী। ভারতবর্ষ থেকেও এসেছেন একজন। উনতিরিশ বছরের এক যুবক। তাঁর সঙ্গে একঝুড়ি মাটির পুতুল আর একতাল মাটি। মণ্ডপে বসে ওই মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ছেন আর ভাঙছেন।

এমন সময় একজিবিশন দেখতে এলেন মহারানী ভিক্টোরিয়ার সেজ ছেলে ডিউক অব কনট সঙ্গে কন্যা প্যাট্রিসি র‍্যামসে। বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ালেন ভারতীয় মণ্ডপে। দেখলেন শিল্পী একবার করে তাঁর দিকে তাকান, পর মুহূর্তেই হাত চালান কাদামাটির তালে। মিনিট খানেক মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

শিল্পীরও ততক্ষণে কাজ শেষ। আঙুলের চাপে মুহূর্তে মাটির এই তালটিকে আর এক ডিউক অব কনটে রূপান্তরিত করে ফেলেছেন। কাণ্ড দেখে বিস্মিত ডিউক সজোরে হাততালি দিয়ে উঠলেন। অন্যান্য মণ্ডপ থেকে ছুটে এল মানুষজন। বাঁধভাঙা ভিড় তখন ভারতীয় মণ্ডপের সামনে। প্যাট্রিসি তক্ষুনি কিনে নিলেন শিল্পীর যাবতীয় মাটির পুতুল। চমকে গেল গোটা লণ্ডন। পরের দিন খবরের কাগজের পাতায় পাতায় সংবাদ। সারা বিশ্ব চিনল কুমোরটুলিকে, কৃষ্ণনগরকেও। ঘটনাটি

কুমোরটুলির পরিভাষা

শব্দ	অর্থ
আতি	বাখারি (বাঁশের)
আলেবসা	আলগোছে বসা
ঈশ্বরবিত্তি → বৃত্তি	কুমোরের ঘর থেকে ঠাকুর নিয়ে যাওয়ার প্রণামী (পারিশ্রমিক বাদে)
খিলেন পোঁতা	পাটাতনে কাঠ পোঁতা
গরান পোঁতা	গরান কাঠের কাঠামো নির্মাণ
গরান পুজো	ওই উপলক্ষে তেল হলুদ সিঁদুর দিয়ে দেবীবন্দনা
গোঁজগাড়া	পাটাতনে বাঁশ রোপণ
গোলা মাখানো	এঁটেল মাটি গুলে কাপড়ে ছেঁকে প্রতিমায় প্রাইমার দেওয়া
চাকের মাটি	কুমোর চাকে ব্যবহৃত মাটি
চালান	'প্রতিমা পাঠাইলাম, গ্রহণ করিবেন'—নির্দেশ
চক্ষুদান	চোখ অঙ্কন
ছবি আয়না	সুন্দর মুখের উপমা
জগজগা	প্রতিমার মুখের সামনে দেওয়া চিক
জল আঁজড়া	মাটিতে জল সিঞ্চন বা মাখানো
টানাপৌরা	নান্দনিক
তালপাটা	তাল কাঠের পাটাতন
তবক	রুপোলি রাঙতা
দোমেটে	দ্বিতীয় মাটির প্রলেপ
ন্যাকড়া লেপা	ফাটল মেরামতির ব্যান্ডেজ
পাঁচপুতুল	কার্তিক গণেশ লক্ষী সরস্বতী সহ দুর্গা
পেটো দড়ি	পাটের দড়ি
পানপানা	পানের গড়ন
পোয়ান	দেশি ফার্নেস
পিঠবাতা	পিঠের দিকে প্রতিমা ধরে রাখা বাঁশের বাঁধুনি
পাশকাঠ	এক ধরনের বাঁধুনি
পাড় বাঁধা	আগে যে রীতিতে কাপড়ের পাড় দিয়ে খড় বাঁধা হত
ব্যানা/বেণী বাঁধা	খড় বাঁধা
বুকারি	বাখারি
বার্ষিকী	পণ্ডিত বিদায়ে দেয় অর্থ
ভুরোর কাজ	অ্যারারুটের আঠার প্রলেপ দিয়ে তার উপর অভ্র ও কাচগুঁড়োর কাজ
মানযেরা	মানুষ ঘেঁষা প্রতিমা
মেড় বাঁধা	খড় বাঁধা
মসকানো	মাটি মাখানো
রোলা দেওয়া	পাটাতনে গরান কাঠের, এখন বাঁশের বাঁধুনি তৈরি
সুঁদরী পাটা	সুন্দরী কাঠের পাটাতন

ঘটে ১৯২৪-এর জুলাই মাসে।

গোটা ঘটনাটির পেছনে ছিলেন তৎকালীন বাংলার প্রাক্তন গভর্নর লর্ড কারমাইকেল। ১৯১৫তে যখন তিনি ছোটলাট, সেই সময় একবার সস্ত্রীক বেড়াতে গিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরে। মৃৎশিল্প আর শিল্পীদের সুনাম শুনে গিয়েছিলেন ঘূর্ণিতেও। তখন ঘূর্ণির প্রবীণ খ্যাতনামা শিল্পী যদুনাথ পাল। তাঁর কাজ দেখতে ছোটলাট সটান হাজির যদুনাথের বাড়িতে। সেই সময় তাঁর বাড়িতে মূর্তি গড়ার কাজ করছিল বছর কুড়ির ছেলেটি। কারমাইকেলকে দেখে অতি দ্রুত তাঁর মুখাবয়ব বানিয়ে ফেলে সে। আর সেই দিনই তাঁর জানা হয় এ প্রতিভার নাম গোপেশ্বর পাল। দেশে ফিরেও এ নাম ভুলতে পারেননি কারমাইকেল। তাঁর সুপারিশেই ওয়েম্বলি হলে আমন্ত্রিত হন গোপেশ্বর।

কুমোরটুলির প্রতিমাশিল্পে গোপেশ্বর পালই প্রথম ভাঙচুরের কাজটি করেছিলেন। একচালের প্রতিমা থেকে তিনিই প্রথম পাঁচ দেবদেবীকে আলাদা করে দেন। যখন এ ঘটনা ঘটছে তখন কুমোরটুলি নিজের ঐতিহ্যের অনেকটাই খুইয়ে ফেলেছে। এ সম্পর্কে এই মুহূর্তে ওই পাড়ার প্রবীণতম শিল্পী প্রফুল্ল পাল এবং নিরঞ্জন পালের কথা শোনা যাক। — 'কুমোরটুলিতে সেই সময় লেখার (আঁকার) কাজটাই বেশি হত। মায়ের মাটির শাড়িতে যে ডিজাইন আঁকা হত তা সত্যিকারের কাপড়েও হয় না। আর ছিল চালচিত্রের কাজ। কালীঘাটের পটুয়ারাও থ' হয়ে যেত সেই কাজ দেখলে। বাঙলা ধারার মূর্তির তখন রমরমা। কী এক-একখানা প্রতিমা গড়তেন জিনু পাল, কাঙালি পাল, অন্নদা পালেরা! যেন জ্যান্ত প্রতিমা! তখন বৃন্দাবনি চাল উঠে গিয়েছিল কুমোরটুলি থেকে। হারিয়ে গেছে রামচন্দ্রী, দশাবতারী, ইন্দ্রাণী আর ব্রহ্মাণী চাল। চলছে কৈলাসী চাল। আর এ চালের ওস্তাদ শিল্পী তখন হরিজীবন পাল।' কৈলাসী চালের কাজ এখনও নমনম করে চলছে কুমোরটুলিতে। অবশ্য, তাতে আর মুনশিয়ানা কিছু নেই।

কৈলাসী চালের চারটি স্পষ্ট বিভাগ রয়েছে কুমোরটুলিতে। প্রথমত বাংলা চাল। এই চালের ঢাল, কুমোরদের কথ্য ভাষায় যা পাশ কাঠি বা পাশ টাটি তা আচ্ছাদিত কার্তিক-গণেশ অবধি। একে একহারা চালও বলেন কেউ কেউ। দ্বিতীয়ত রয়েছে খোপ চাল। এ চালে আঁকা হয় চক্ষুদান বা গোঁসাই পটের মতো দেখতে আড়ে-লাটাই পট। তৃতীয় ভাগে টানা চৌড়ি। এ চালকে কেউ বাঁকা চৌড়ি কেউ আবার মঠ চৌড়ি নামে অনুবাদ করেন। নামটা এসেছে সম্ভবত বর্ধমান-দাঁইহাটের শোলাচুমকির চৌড়ি

কলকাতায় প্রথম

কলকাতায় প্রথম শারদীয় বাড়ির পুজো	কুমোরদের প্রথম আগমন :	প্রথম কুমোরদের আদিনিবাস :	প্রথম বারোয়ারি পুজো :	কলকাতায় প্রথম বারোয়ারি পুজো :	কলকাতায় প্রথম সর্বজনীন পুজো :
১৭৫৭	ষোড়শ শতকে	সপ্তগ্রাম	নদিয়ার উলা, হুগলির গুপ্তিপাড়া	১৯১৮, বাগবাজারে	১৯২৬, সিমলা এবং বাগবাজারে

কুমোরটুলির আদমসুমারি

সমিতি	শিল্পীর সংখ্যা	আদি নিবাস	এলাকার বাসিন্দা	পেশার প্রকৃতি	শিক্ষা	শ্রমের হিসেব	গড় আয়	প্রবীণ শিল্পী
কুমোরটুলি মৃৎশিল্প সংস্কৃতি সমিতি সম্পাদক : দিলীপ পাল	নারী : ১৪ পুরুষ : ১৮৬ মোট : ২০০	মেদিনীপুর কৃষ্ণনগর শান্তিপুর নবদ্বীপ মুড়াগাছা বেথুয়াডহরি মুর্শিদাবাদ হাওড়া	স্থায়ী : ৯৬ ঘর ● অস্থায়ী : ১০৪ জন	সারা বছরের জন্য নিযুক্ত = ৬০ জন পার্শ্ব পেশায় নিযুক্ত = ১৫ জন	নিরক্ষর ক্লাশ ফোর ক্লাস এইট মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বি.এ-বি.কম এম.এ	দিনে ৮ ঘণ্টা ● ওভার টাইম ৩ ঘণ্টা	মাথাপিছু মাসিক দেড় থেকে দু হাজার	● প্রফুল্ল পাল ● নিরঞ্জন পাল ● গণেশ পাল ● কার্তিকচন্দ্র পাল ● যতীন পাল
কুমোরটুলি মৃৎশিল্পী সমিতি সম্পাদক : গৌরাঙ্গ পাল	নারী : ০ পুরুষ : ৬৮ মোট : ৬৮	ঢাকা বিক্রমপুর ফরিদপুর বরিশাল	স্থায়ী : সকলেই ● অস্থায়ী : নেই	সারা বছরের জন্য নিযুক্ত = ৬৪ জন পার্শ্ব পেশায় নিযুক্ত = ৪ জন	বকলম থেকে মাধ্যমিক	দিনে ৮ ঘণ্টা ● ওভার টাইম ৩ ঘণ্টা	মাথাপিছু মাসে চার হাজার	● রমেশ পাল ● রাখাল পাল ● মোহনবাঁশি রুদ্রপাল ● নেপাল পাল ● সাধুচরণ পাল
কুমোরটুলি মৃৎশিল্পী কারিগর সমিতি সম্পাদক : কালীশঙ্কর পাল	নারী : ০ পুরুষ : ৯২৩ মোট : ৯২৩	নদীয়া বর্ধমান উঃ ২৪ পরগনা মেদিনীপুর হুগলি	স্থায়ী : ৫০ জন ● অস্থায়ী : ৮৭৩ জন	সারা বছরের জন্য নিযুক্ত = ৯২৩ জন পার্শ্ব পেশায় নিযুক্ত = ৯২৩ জন	বকলম থেকে মাধ্যমিক	দিনে ৮ ঘণ্টা ● ওভার টাইম ৫ ঘণ্টা	মাথাপিছু মাসে ৯০০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত	তেমন কেউ নেই

গহনা থেকে। বড়িশার সাবর্ণ-বাড়ির প্রতিমা, দর্জিপাড়ার মিত্রবাড়ির প্রতিমা বা হাটখোলার দত্তবাড়ির প্রতিমায় এখনও এই চৌড়ি চালের ব্যবহার রয়েছে। তবে লুপ্ত হয়েছে পৌরাণিক জৌলুস। মঠচৌড়ি আর টানাচৌড়ির মধ্যেও সামান্য ফারাক রয়েছে। লক্ষ্মী- দুর্গা-সরস্বতীর পেছনে মঠের মতো তিনটি চাল হল মঠচৌড়ি আর টানাচৌড়িতে। তিন দেবীর মাথায় থাকবে প্রথমে তিনটি অর্ধবৃত্তাকার চাল, তার উপরে তিনটি মঠ আকৃতির চাল। এখন যে চালচিত্রটির কাজ সব চেয়ে বেশি চলছে তার নাম মার্কিনি চাল। লক্ষ্মী-সরস্বতী অবধি নেমে শেষ হয়ে যায় এই চাল। কার্তিক-গণেশ থাকে চালের বাইরে। অধুনা প্রয়াত সুরেন্দ্রনাথ পালের কাছ থেকে অবলুপ্ত আরও কয়েকটি চালের কথা জানা গিয়েছিল, গত শতকের শেষেও যেগুলির বহুল ব্যবহার ছিল কুমোরটুলিতে। যেমন দোথাকি চাল, গির্জা চাল আর সর্বসুন্দরী চাল।

একদা দিনের পর দিন নাওয়া-খাওয়া ভুলে এক শ্রেণীর শিল্পী চালচিত্র আঁকায় মেতে থাকতেন। সেসব চালের দিকে তাকিয়ে বোবা বনে যেতে হত। চণ্ডী বর্ণিত নানা ঘটনা ফুটে উঠত রঙে রেখায়। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তো থাকতেনই, থাকত শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ থেকে শুরু করে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র কথিত বিবিধ কাহিনী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের কুমোরটুলিতেও আঁকার কাজের এইসব শিল্পীদের আনাগোনা ছিল। তাঁদের হাতে তৈরি হত রকমারি সরা। নিরঞ্জন পালের কাছে জানা গেল, শুধু কুম্ভকাররাই নন, সরা আঁকিয়েদের মধ্যে ছিলেন ব্রাহ্মণ, সূত্রধর আর পটুয়ারা। চার-পাঁচ রকমের সরা আঁকা হত এ পাড়ায়। ঢাকাই সরা, ফরিদপুরী সরা, সুরেশ্বরী সরা, আচার্যি সরা আর কুমোরটুলি সরা। সাতের দশকের গোড়ার দিকেও কুমোরটুলি-সরায় বহির্বঙ্গের কোনও প্রভাব ছিল না। এই দশকেই এ পাড়ার সরা শিল্পটির মৃত্যু হয়েছে। লুপ্ত হয়েছে কলাটিও। এখন শান্তিপুর, নবদ্বীপ আর উত্তর ২৪ পরগনা থেকে আসে কাগজে আঁকা চালচিত্র। তা-ই সেঁটে দেওয়া হয় চালে।

এই দুর্দশার জন্যই কি গোপেশ্বর পাল চালচিত্র প্রথাটি তুলে দিয়েছিলেন? নাকি এর পেছনে ছিল বাজার, শিল্পের একঘেয়েমি?

প্রাণপ্রতিষ্ঠা

'বাংলায় আমাদের মনে আর্টের মধ্যে অস্থিবিদ্যার কোনখানে স্থান, এই প্রশ্নটা ওঠবার কয়েক শত বৎসর আগে এই পাগলের দলের একজন আর্টিস্ট এসেছিল। সে জেগে বসে

প্রতিমা নির্মাণ

প্রতিমার উপকরণ	প্রতিমার রঙ (পূর্বে প্রচলিত)
• তাল বা সুন্দরী কাঠের পাটাতনে গরান কাঠের খুঁটি	• চকখড়ি : সাদা রঙের জন্য
• খড় এবং উলুখড়	• খড়িমাটি : সাদা রঙের জন্য
• ধানের তুষ	• হিঙ্গুল : লাল রঙের জন্য
• শনের দড়ি	• পেঙুরি/পিউরি : হলুদ রঙের
• কাতার বা নারকেলের দড়ি	• ক্ষেতের নীল : নীল রঙের জন্য
• পাটের দড়ি	• গাম্বুজ : সবুজের উপর সবুজ রঙের জন্য
• এঁটেল মাটি	• মেটে সিঁদুর : কড়া লাল রঙের জন্য
• গোবর	• কাঠখড়ি/ মাজাখড়ি : সাদা রঙের জন্য
• দো-আঁশ মাটি	• ভুষো কালি : কালো রঙের জন্য
• মুখের ছাঁচ	• ভীমসেন : খয়েরি রঙের জন্য
• পায়ের ছাঁচ	• এলামাটি বা বাপএলা : অনুজ্জ্বল সাদা রঙের জন্য

নির্মাণের যন্ত্রপাতি	প্রচলিত সংস্কার
• করাত	• পঞ্জিকা দেখে দেবতা গঠনের দিন ঠিক করা
• কাটারি	• রথ, জন্মাষ্টমী বা রাধাষ্টমীতে গরানপুজো
• আগর	• শনি-মঙ্গলবারে মূর্তি তৈরি শুরু না করা
• বাটালি	• বাড়ির পুজোয় গরান পাঠানো
• চেয়ারি/ কামকাঠি/ কাইমকাঠি	• অশৌচে মাটিতে হাত্ না দেওয়া
• পেটোতুলি	• অম্বুবাচিতে মাটিতে লোহা না ঠেকানো
• ব্রাশ	
• বসুয়া : হাতির দাঁত বা কামিনী কাঠের	
• পিটানি	

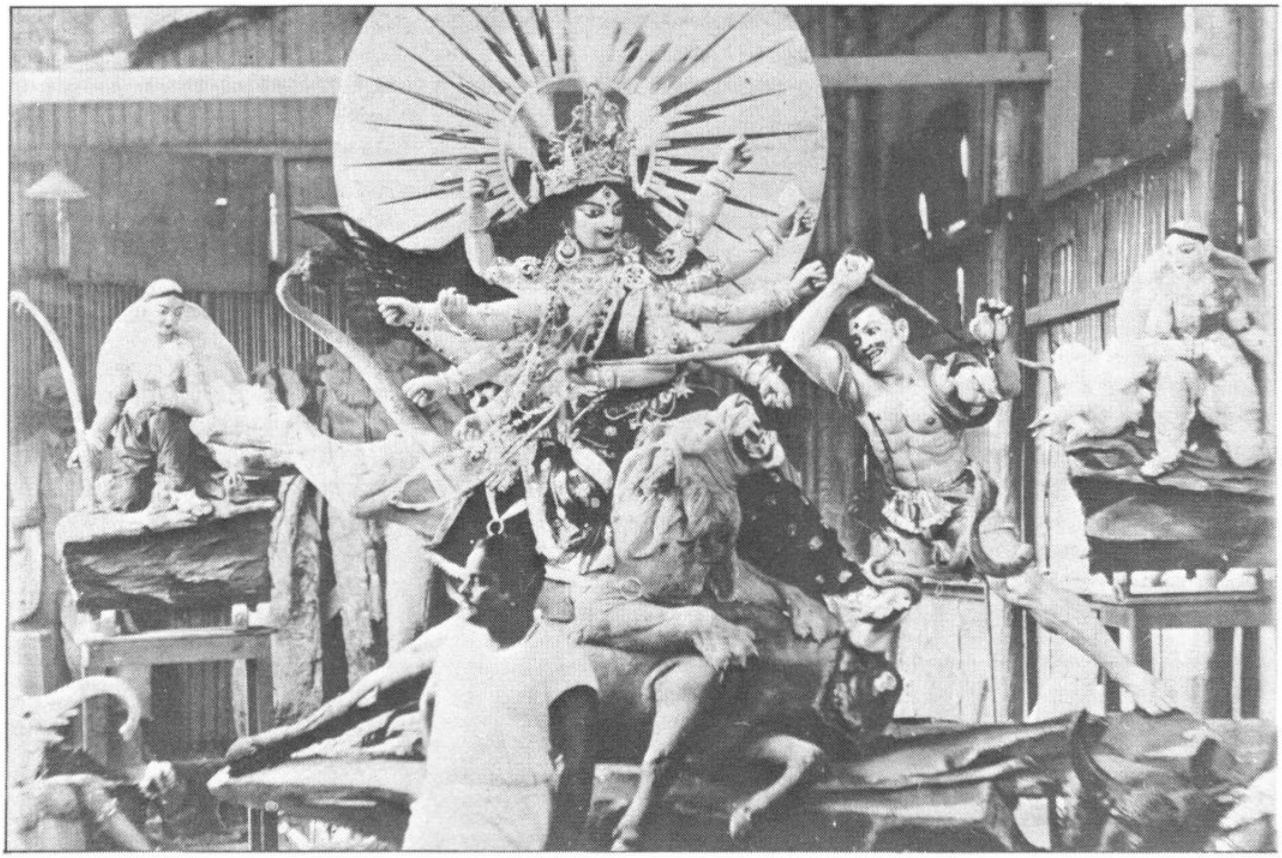

একচাল থেকে পাঁচ দেবদেবীকে পৃথক করেছিলেন গোপেশ্বর পাল

স্বপন দেখলে—যত মেয়ে শ্বশুরঘরে রয়েছে আসতে পারছে না বাপের বাড়ি, একটা মূর্তিতে সেই সবারই রূপ ফুটিয়ে যাবে! আর্টিস্ট সে বসে গেলো কাদা-মাটি-খড়-বাঁশ-রঙ-তুলি নিয়ে, দেখতে দেখতে মাটির প্রতিমা সোনার কমল হয়ে ফুটে উঠলো দশ দিকে সোনার পাপড়ি মেলে....বাংলার কোনো অজ্ঞাত পল্লীতে এই মূর্তির মূল ছাঁচ যদি খোঁজ তো দেখবে—তার সমস্তটা artistic anatomy-র নিয়মের দ্বারায় নিয়তির নিয়ম অতিক্রম করে শোভা পাচ্ছে ব্যতিক্রম ও অতিক্রমের সিংহাসনে।' —রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক অবনীন্দ্রনাথ যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একথা বলছেন তখন কোথায় গোপেশ্বর, কোথায় কি?

রূপ রচনায় গোপেশ্বর পালের প্রতিমা যদি সোনার কমল হয়ে ফুটে ওঠে তবে দেশভাগের ফলে ওপার থেকে ছুটে আসা ভাগ্যহীন শিল্পীদের হাতের সেই প্রতিমা ব্যতিক্রম আর অতিক্রমের সিংহাসন দখল নিয়েছিল।

এ ঘটনা চারের দশকের। যে দশকের সঙ্গে কুমোরটুলিতে জড়িয়ে আছে দাঙ্গা আর দেশভাগের কাহিনী। পূর্ববঙ্গের মৃৎশিল্পীদের কলকাতায় আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছিল দশকের গোড়া থেকেই। মূলত ওপারের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে। '৪৭-এর পর ভাগ্যসন্ধানী বহু শিল্পী আর কুম্ভকার ভিটেমাটি খুইয়ে চোখের জল পদ্মায় ফেলতে ফেলতে গঙ্গা-ভাগীরথীর পারের এই ভূখণ্ড আঁকড়ে ধরে।

কুমোরটুলির বিরাট একটা অংশ তখন ভাগ্যকুলের রায়দের জায়গা। সবে একটা হাসপাতাল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। উদ্বাস্তু শিল্পীরা সেখানেই অস্থায়ী শিবির করে রইলেন। ওই ঘটনার সাক্ষী ফরিদপুরের মাদারিপুর সাবডিভিশনের চাঁকদা গ্রামের শিল্পী ধনঞ্জয় রুদ্রপাল। তিনি এ-পাড়ায় পা রেখেছিলেন '৪৭এর সেপ্টেম্বরে। ঢাকা-বিক্রমপুরের ষোলোঘর গ্রামের শিল্পী রাখাল পাল আসেন পরের বছর। সঙ্গে চার ভাই হরিবল্লভ, গোবিন্দ, নেপাল আর মোহনবাঁশি।

খুব সহজে তিনি জায়গা পাননি কুমোরটুলিতে। তাঁর মতো ওপারের অনেক শিল্পীকেই লড়াই করতে হয়েছিল জায়গার জন্য। রাখালবাবুর মতে, এর কারণ হল বাজার। পূর্ববঙ্গজ শিল্পীদের বিরুদ্ধে পাড়ার স্থায়ী শিল্পীদের একমাত্র অভিযোগ হল—ওঁরা কম দামে ঠাকুর বেচে। কিন্তু ঠাকুর যে ওদের তুলনায় দেখতেও ভাল সেটা মুখ ফুটে বলতে পারেনি। তখনও কুমোরটুলিতে একচালার কংসনারায়ণী বা বিষ্ণুপুরী মূর্তির চল। গোপেশ্বরের রীতি তখনও এঁরা রপ্ত করতে পারেননি। অন্য দিকে চাল থেকে ঠাকুর আলাদা করার রীতি গোপেশ্বর পালের আগেই পূর্ববঙ্গে চালু হয়ে গেছে। তাই সেই বাজারটা ধরে ফেলতে অসুবিধে হল না ফরিদপুর-ঢাকার শিল্পীদের।

আর দাম কম? '৪৮-এ রাখালবাবু তৈরি করেছিলেন পনেরোটি প্রতিমা। 'দাম ছিল দেড়শো থেকে দুশো পঁচিশের মধ্যে। এটা কি কম দামের নমুনা?' রাখালবাবুর দাবি, 'কুমোরটুলির প্রতিমার বাজার তৈরি করেছিলাম আমরা। আর সেটা দখলেও ছিল আমাদের। এটাই এপারের শিল্পীদের ক্ষোভের কারণ।'

এ দাবি স্বীকার করলেন '৪১-এ ফরিদপুরের পালং থেকে আসা শিল্পী রমেশচন্দ্র পালও। প্রতিমার ব্যবসা করতে আসেননি এই শিল্পী। এসেছিলেন সরকারি আর্ট স্কুলে শিল্প নিয়ে পড়াশুনো করতে। রমেশবাবুর মতে কলকাতায় তখন বাড়ির পুজোর জাঁক কমে এসেছে। পাড়ায় পাড়ায় চলছে সর্বজনীন

পাঁচ চালের মূর্তি গড়ে কয়েক দশক মাতিয়ে রেখেছিলেন রমেশ পাল

পুজো। আহিরীটোলা, বি কে পাল পার্ক, বেনেটোলা, কুমোরটুলি, বাগবাজার, সিমলা প্রতি বছরই পুজার সংখ্যা বাড়ছে। রকম রকম চাহিদা হচ্ছে ক্রেতাদের। আর তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে ওপারের শিল্পীরা। এপারের শিল্পীরা তখনও সেই বাড়ির ঠাকুর নিয়ে পড়ে আছে।

রমেশ পাল নিজে কোনও প্রতিযোগিতায় যাননি। তিনি আর্ট স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে কুমোরটুলির রীতি মিশিয়ে না বাঙলা কলম, না মিশ্র কলম, না আজন্তা ধাঁচ, না রবি বর্মা—সব ধারা থেকেই নতুন এক পথ বের করে নিয়েছেন। তাঁর প্রতিমা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য হল—'আমি দেবীকে স্বর্গ থেকে মর্তের মাটিতে নামাইনি। মানুষকেই নিয়ে গেছি দেবলোকে।' শিক্ষিত ভাস্করদের মধ্যে শুধু রমেশবাবুই নন, প্রতিমা তৈরি করেছেন সুনীল পাল বা হালের অলক সেনও। কিন্তু সেই অ্যাকাডেমিক প্রতিমা সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের কথাই শেষ কথা। সুনীল পালের ক্লাসিক ঢঙের মূর্তি দেখে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—'কুমরেরা যা করে তাই-ই ঠিক। মেলা পার্বণে ক্লাসিক মূর্তি আড়ষ্ট বলে মনে হয়। পারমানেন্ট ভ্যালু এ ক্ষেত্রে আর্টকে ভারাক্রান্ত করে তোলে।'

বিলুপ্ত পাঠক্রম

১৯৪৫ সালে আমেরিকার 'ফিনিক্স' পত্রিকার তরফ থেকে কুমোরটুলি কভার করতে এসেছিলেন যুদ্ধ বিষয়ক অভিজ্ঞ সাংবাদিক লিউইস হেইগ। সঙ্গে ছিলেন চিত্র সাংবাদিক আর্নেস্ট গুডুইন। তাঁদের সংবাদে এপাড়ার মৃৎশিল্পীদের বেঁচে থাকার লড়াইটাই বিস্তৃতভাবে পরিবেশিত হয়েছে। মূর্তিশিল্প নিয়ে তাঁরা বিশেষ মাথা ঘামাননি।

লিউইস দেখেছিলেন সাধারণ মাপের একচালের একটি প্রতিমার দাম ছিল তখন পঞ্চাশ টাকা। অথচ হিসেব মতো প্রতিমা পিছু একজন শিল্পীর খরচ পড়তো পঁয়তিরিশ টাকার কাছাকাছি। হাতে থাকত পনেরো টাকা। লিউইসের হিসেব অনুযায়ী ওই পনেরো টাকা আয় করতে শিল্পীকে শ্রম দিতে হত প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা । সঙ্গে খাটতে হত শিল্পীর পাঁচ বছরের ছেলেটিকে আর বউকেও। তখনও এ-পাড়ায় বিদ্যুৎ আসেনি। রাত্রে কাজ করতে হত মাথায় কেরোসিন তেলের কুপি বেঁধে। এই করে একজন পালমশাইয়ের মাসে রোজগার হত পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা। লিউইস বিস্মিত হয়েছিলেন এত কম টাকায় একজন শিল্পী পরিবার নিয়ে বেঁচে আছে কেমন করে?

অন্য ঘটনাটি লিউইসের চোখে পড়েনি। পঁচিশ বা পঞ্চাশ টাকার সামান্য অঙ্ক থেকে ছিটকে পড়া শান্তিপুরের মেয়ে কামাখ্যাবালা পালের সঙ্গে তাঁর আলাপও হয়নি। কামাখ্যাবালার স্বামী ছিলেন কুমোরটুলিরই শিল্পী। তাঁর সংসারে দুটি মাত্র মেয়ে। স্বামী যেদিন চোখ বুজলেন জগৎসংসার অন্ধকার হয়ে গেল তাঁর চোখে।

ছোটবেলায় ঝুলনের পুতুল গড়তেন কামাখ্যাবালা। বিয়ের পরে স্বামীকে সাহায্য করতে করতে প্রতিমা শিল্পেও দক্ষ হয়ে ওঠেন তিনি। সেই বিদ্যে দিয়েই গত চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর তিনি শান্তিপুর থেকে কুমোরটুলিতে এসে প্রতিমা গড়েছেন। মেয়েদের বিবাহ দিয়েছেন। এক অর্থে তিনিই এ-পাড়ার প্রথম মহিলা শিল্পী।

চমৎকার পুতুল গড়তেন কামাখ্যাবালা। একটা সময় এ-পাড়ায় ছিলেন অনেক পুতুলশিল্পী। গবেষক পর্যটক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও দশঘরার বিশ্বাস পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে কুমোরটুলির পুতুলশিল্পী তারাপদ পালের সন্ধান পান। এই তারাপদ

আদিবাংলা ডাক সাজের অলঙ্কার ও গহনা

দেবীর গহনা

- মন্দির এবং ক্রাউন : থাকতো চালচিত্রের চূড়ায়
- কলকা : নানা রকমের কলকার ব্যবহার ছিল

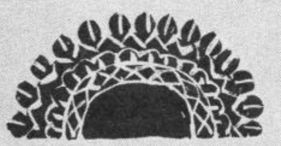

১. কুলো কলকা
২. খোঁচ কলকা
৩. গালতা কলকা
৪. পান কলকা
৫. গোল কলকা
৬. ভুনি কলকা
৭. গেলাস কলকা

- মনসা পাতা খোঁচ : দুই কলকার মাঝে ব্যবহার করা হত। ছিল বকের পালকের ব্যবহারও
- হীরেবটি (ভেতরে বুঁদি দেওয়া মিনের কাজ সহ) : চালচিত্রের উপরে নিচে ফ্রেমিং করা হত এ দিয়ে

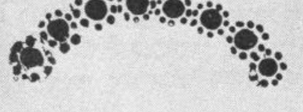

- ঝালট (মিনের কাজ করা)
- তাজফুল
- পিঠ-পট : দেবীর পিঠের দিকের চাল অলংকরণ

সাজের অলঙ্কার

- ফেরতা : কাঁধে উপর থেকে এক আঁচলা
- কণ্ঠা : গলায়
- কাঁচুলি : কুঁচ যোগে
- হাতের উপরের অংশে—বাহু বাঁক, বাজু, তাবিজ, তাগা

- ঝুমকো বা ঝাঁপা : কনুইতে
- হাতের দ্বিতীয় অংশে—বিচ্ছু, রুযনো, বাউটি বা চুড়ি—যা থেকে ঝুলতো পুঁটে, সলকাহন বা কনকন, রতনচুঁড়, আংটি
- পায়ের গহনা—পায়জোড়, গুজরি আর পঞ্চম
- আঁচলে—কোল আঁচলা অথবা বগ্‌লি

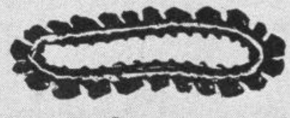

- কানে—ঘাড়বেণী, মকরমুখ, চৌদানি, কর্ণফুল এবং মুকুট থেকে ঝোলানো কানবালা
- কপালে—সিঁথি পটি
- গলায়—চিক, সাতনরি, পাঁচনরি ও দশনরি হার এবং বুক থেকে হাঁটু অবধি চাঁদমালার পটি

- গহনা অলঙ্কারের উপকরণ—খুন্তি বা কিরীট, জমি, ট্যাপারি, বকুল, নাকভাঙা, ডালফুল, ছড়, বীরবউলি, মোরাবিচ্ছাকি, নতের জমি, উচ্ছেফুল, চালতাফুল, কাঁকরোল, আধগোলা, বালকের জমি, বুলেন, চুমকি এবং ফোরসি

পালই সম্ভবত শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রতিমাশিল্পী ছিলেন। বর্তমান শিল্পী দিলীপ পাল তাঁরই নাতি।

দিলীপ পাল জানেন না, ১৯৩৭-৩৮ নাগাদ তাঁর দাদু কী অসাধ্যসাধন করেছিলেন দশঘরায়। বিশ্বাস পরিবারের গৃহদেবতার টেরাকোটার মন্দিরটি তিনি সংস্কার করেছিলেন তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভা দিয়ে। কাজটি করেছিলেন নিজের হাতে নকাশি টালি তৈরি করে।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'তারাপদ পাল ছিলেন চৌরাশি থাকের কুম্ভকার। ... মধ্যযুগ ও উত্তর-মধ্যযুগে বঙ্গদেশের মন্দির নির্মাণ ও অলঙ্করণ-শিল্পীরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে "গিল্ড" প্রথায় কাজ করতেন। এক এক অঞ্চলের এক-একটি গোষ্ঠীকে, মৃৎশিল্পের (অথবা অন্য শিল্পের) ক্ষেত্রে "থাক" নামে অভিহিত করা হত। ইংরেজিতে "স্কুল" বলতে যা বোঝায়, "থাক" বলতেও তাই বোঝাত। শতাব্দীকাল পূর্বেও বঙ্গদেশে "বর্ধমান", "অষ্টকুল থাক", . "চৌরাশি থাক" প্রভৃতি নামের মৃৎশিল্পী ও "টেরাকোটা" মন্দির-নির্মাতাদের ভিন্ন ভিন্ন "স্কুল" ছিল।'

তারাপদ পাল ছিলেন গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা। প্রতিমা ও পুতুল শিল্পে বেশ হাতযশ ছিল তাঁর। কুমোরটুলির আর এক টেরাকোটা-দক্ষ শিল্পী পটলচন্দ্র পালের কথাও জানিয়েছেন গবেষক। কিন্তু এই দুই শিল্পীর সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভবত শেষ হয়ে গেছে শিল্পকলাটি।

কুমোরটুলির শিল্পীদের আরও একটি গুণের কথা শুনিয়েছেন শিল্পী নিরঞ্জন পাল। গত শতকের শেষ পর্ব থেকে এই শতক শুরুর কয়েক দশক অবধি এপাড়ার বেশ কিছু শিল্পী বড় বড় বাড়ির অলঙ্করণের কাজ করতেন। ছাদের কার্নিসে লতাপাতার ডিজাইন, রকমারি ভঙ্গির নারীমূর্তি নির্মাণ, থামের উপর সিংহ বা মকরমুখ এসব কাজে দক্ষ ছিলেন সেই শিল্পীরা। শহরের অনেক বাড়িতেই সিমেন্ট চুন বালি সুরকির সেইসব নমুনা এখনও দেখা যায়। দেখা যায় না আর সেইসব শিল্পীদের।

উত্তরে সক স্ট্রিট বা দুর্গাচরণ ব্যানার্জি স্ট্রিট। দক্ষিণে বনমালী সরকার স্ট্রিট, অভয় মিত্র স্ট্রিট আর কুমোরটুলি পার্ক। পূর্বে চিৎপুর রোড। আর পশ্চিমে ভাগীরথী। কখনও এই ঠিকানায় হাজির হয়েছে সপ্তগ্রাম, কখনও কৃষ্ণনগর নবদ্বীপ মেটেরি শান্তিপুর, কখনও এসে মিশেছে ফরিদপুর বিক্রমপুর বরিশাল, কখনও আবার সরকারি আর্ট স্কুল কলেজ-ডিগ্রী ডিপ্লোমা। সমস্ত কিছুকেই জড়িয়ে ধরেছে খড় মাটি রঙ তুলি। তাই এ ঠিকানা আজও কুমোরটুলি।

অঙ্কন : অনুপ রায়

রবীন্দ্রসংগীতের নবরূপ

বি শ্ব জি ৎ রা য়

পঁচিশে বৈশাখের আগে-পরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট প্রকাশিত হয় সবচেয়ে বেশি। আবার পুজোর দিনেও অন্যান্য গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আনন্দের জোগান দেয়। আর, সে কথা মনে রেখে কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট বেরোয় এই পর্বে-ও। এই বছরে অর্থাৎ ১৯৯৮-এ যত রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট মুদ্রিত হয়েছে, তার প্রধান একগুচ্ছের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এই রচনার উদ্দেশ্য।

প্রথমত, মেয়েদের গাওয়া একক গানের ক্যাসেট। এই গায়িকাদের সকলেই যে সুপরিচিতা হয়ে উঠেছেন তা নয় কিন্তু যে আট জনের ক্যাসেট বাছা হয়েছে তাঁদের প্রত্যেকেই বিশিষ্টতার অধিকারিণী। এদের মধ্যে লোপামুদ্রা মিত্র শ্রুতিসুভগ কণ্ঠে গান করেছেন। সম্ভাবনাময়ী শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ হবেন। রাজশ্রী ভট্টাচার্যের কণ্ঠ সমৃদ্ধ নানা দিক থেকে। ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ক্যাসেটে পূর্বের মান বজায় রেখেছেন।

চারজন গায়িকা এখন পরিণতির পথে অগ্রসর। এঁদের মধ্যে দেবারতি সোম মিষ্টি এবং খোলা গলায় বাউল এবং কীর্তননির্ভর বেশ কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন। স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্তর কণ্ঠ উন্মুক্ত অথচ মধুর। নানা অলঙ্কার যথাযথ প্রয়োগে তিনি নিপুণা। শ্রীনন্দা মুখোপাধ্যায়ের বেদনাদিগ্ধ মাধুর্যময় প্রেমের গানগুলি শ্রোতাদের চিত্ত স্পর্শ করবে। রেজওয়ানা চৌধুরী (বন্যা)-র ক্যাসেট শুনে ভাল তো লাগবেই।

মেয়েদের তুলনায় একক ক্যাসেট মুদ্রণের ক্ষেত্রে ছেলেদের সংখ্যা কম। তবে, গলার পরিশীলিত প্রক্ষেপে বা গায়নভঙ্গিগত নিজস্বতা অর্জনে এবং সর্বোপরি প্রসাদগুণের দিক দিয়ে তাঁরা খাটো নন।

মোহন সিং-এর গানগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের যে-সব গানের মধ্যে মার্গসঙ্গীতের চরিত্র সুস্পষ্ট সেইসব রচনা তিনি প্রধানত রেখেছেন এবং স্বচ্ছন্দে পরিবেশন করেছেন। দীপক রুদ্র-র সুরেলা বিষণ্ণ গলায় অলঙ্কারের বৈচিত্র্য আছে। শ্রীকান্ত আচার্যর গানের ভঙ্গি হার্দ্য, যার ফলে তার এবারের অনেক গানই মনে দাগ কাটে। চাপা গলার মিষ্টি গান শান্তনু রায়চৌধুরীর গায়নভঙ্গিকে চিহ্নিত করে। পীযূষকান্তি সরকারের কণ্ঠের প্রক্ষেপে সযত্নে চর্চার দ্বারা আয়ত্ত প্রকরণের প্রয়োগ তাঁর গাওয়া গানকে বিশিষ্টতা দেয়। ইন্দ্রনীল সেন বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। তাঁর নিজস্ব গায়কীতে 'সুনীল সাগরে শ্যামল কিনারে,' 'প্রভু আমার প্রিয় আমার' ইত্যাদি গানগুলিকে যে রূপ দিয়েছেন তা শ্রোতাদের মুগ্ধ না করেই পারে না।

উপরোক্ত একক গানের ক্যাসেট ছাড়াও আরও তিনটি ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে। আরতি মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের মার্গসঙ্গীত-ভিত্তিক কয়েকটি ভাঙা-গান মূল রচনাসহ। ক্যাসেটটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গবেষকদের কাছে প্রিয় হবে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে বিভিন্ন আসরে সুবিনয় রায়ের গাওয়া কিছু গান দুটি ক্যাসেটে একত্রে মুদ্রিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যেসব গান সুবিনয় রায়ের গলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তার অনেকগুলিই এতে পাওয়া যাবে। সন্তোষ সেনগুপ্ত এই প্রজন্মের শ্রোতাদের কাছে হয়তো তেমন পরিচিত নন। কিন্তু মধুর, চড়া গলায় স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে তাঁর গাওয়া গানগুলি এখনও অভিনন্দনযোগ্য। ভাষ্য সহযোগে রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গানের দুটি ক্যাসেট একটি অ্যালবামে মুদ্রিত হয়েছে।

এই পর্যায়ের সব চেয়ে মূল্যবান ক্যাসেট হচ্ছে 'অবিস্মরণীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত'। অতীত দিনের মহিলাশিল্পীদের গাওয়া এই গানগুলি সত্যিই অবিস্মরণীয়।

সেরা ক্যাসেট সেরা শিল্পী

■ লোপামুদ্রা মিত্র— প্রাণের চলা — HMV-FPHVS 843042.

■ শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়— তোমার সাথে গানের খেলা — HMV-FPHVS 843048.

■ রাজশ্রী ভট্টাচার্য— ভাবনা কাঁপায় সুরে— Shruti Tapes & Records STR 00017.

■ ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়— হৃদয় আমার— FMD Founds BR 02335 J MD SPL.

■ দেবারতি সোম— আপন গানের টানে— Asha Audio AA 2040.

■ স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত— নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু— HMV FPHVS 843043.

■ শ্রীনন্দা মুখোপাধ্যায়— ভোলা দিনের কাঁদন-হাসি— HMV-FPHVS 843055.

■ রেজওয়ানা চৌধুরী (বন্যা)— মনের মাঝে যে গান বাজে— HMV-EPHVS 843088.

■ মোহন সিং— তব প্রেমসুধা রসে— HMV-FPHVS 843044.

■ দীপক রুদ্র— অঝোর-ঝরণ শ্রাবণজলে— HMV-FPHVS 843047.

■ শ্রীকান্ত আচার্য— নিভৃত প্রাণের দেবতা— সাগরিকা 31126.

■ শান্তনু রায়চৌধুরী— বন্ধু আমার— HMV-FPHVS 843045.

■ পীযূষকান্তি সরকার— বড়ো তৃষ্ণা— HMV-FPHVS 843037.

■ ইন্দ্রনীল সেন— চিরপথের সঙ্গী— BMG Creseendo/Atlantis Music Ant 170.

■ আরতি মুখোপাধ্যায়— চরণধ্বনি শুনি— HMV-FPHVS 843054.

■ সুবিনয় রায়— রবীন্দ্রসঙ্গীত (Live)- Asha Audio- ক্যাসেট ১ AA2038A, ক্যাসেট ২ Z-AA 2038B.

■ সন্তোষ সেনগুপ্ত— কেন বাজাও কাঁকন— HMV-FPHV 843050.

■ সংকলন— মন যে বলে চিনি চিনি— সাগরিকা ক্যাসেট-১ 31123, ক্যাসেট ২ 31124.

■ সংকলন— অবিস্মরণীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রথম খণ্ড— HMV-FPHV 843051.

আগমনী নয়, পুজোয় ঘর ভরানো গান

নীলাক্ষ গুপ্ত

পুজোর কথা ভাবলেই মনে পড়ে রেডিওতে ভোররাতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ। তাই পুজোর মরসুমে প্রকাশিত খান তেত্রিশ ক্যাসেটের মধ্যে প্রথমেই খুঁজতে লাগলাম স্তোত্রপাঠ। পেলামও দু'খানা। একটি ডাঃ পিনাকীরঞ্জন রায়ের 'শ্রী শ্রী চণ্ডী' দুই খণ্ডে (কনকর্ড ১২-০৬৪)। ডাঃ রায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ কায়দার ধারক। তবে বহু জায়গায় দন্ত্য 'স'-এর জায়গায় তালব্য 'শ' উচ্চারণ করেছেন। বড় কানে লাগে এ ধরনের জিনিস। সেদিক থেকে অনেক ভাল স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্তের 'ওঁ' স্তব ও স্তোত্রপাঠ (এইচ এম ভি ৮৪৩০৫৫)। এই সুপরিচিত গায়িকা বলিষ্ঠ কণ্ঠে, স্পষ্ট উচ্চারণে এবং উপযুক্ত সুরে আদ্যাস্তব, 'যা দেবী সর্বভূতেষু', কালীস্তব, শিবস্তুতি, সরস্বতী বন্দনা, নবগ্রহ স্তোত্র ও শিব-স্তোত্র পাঠ করেছেন। আজকালের ভাষায় 'পুরাতনী' গানের সঙ্গেও দুর্গাপুজোর নাড়ির সম্পর্ক। খুঁজছিলাম এই ধরনের কিছুই। পেয়ে গেলাম খোদ চণ্ডীদাস মালের 'পুরাতনী বাংলা গান' (এইচ এম ভি ৮৪২৯৮৪)। ইনি সাবেক ঢঙে দাশরথী রায়, শ্রীধর কথক, দয়ালচন্দ্র মিত্র, রামনিধি (নিধুবাবু) গুপ্ত ও আশুতোষ দেবের গান গেয়েছেন। সরোদ বাদক তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের যন্ত্রানুষঙ্গ পরিচালনাও উপযুক্ত হয়েছে। আধুনিক গানের ক্যাসেটের বেশির ভাগই পুরনো জনপ্রিয় গানের হয় পুনর্গায়ন নয় সংকলন। কাজেই এই বিভাগে খুঁজেপেতে মোটামুটি ছ'খানা ক্যাসেট পাওয়া গেল যাতে নতুন গান আছে। এর মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় অপেক্ষাকৃত নতুন গায়িকা লোপামুদ্রা মিত্রের 'ভেতর ঘরে বৃষ্টি' ক্যাসেটটির (এইচ এম ভি ৮৪৩০৭৪)। এর কারণ এই নয় যে তিনি শিল্পী হিসাবে অন্য পাঁচজনের চেয়ে উচ্চমানের। আসলে যে গানগুলি এতে আছে সেগুলি অপেক্ষাকৃত ভাল। এ ব্যাপারে গীত রচনাকার শুভ্র দাশগুপ্ত, রচনাকার ও সুরকার সমীর চট্টোপাধ্যায়, সুমন চট্টোপাধ্যায়, কবি জয় গোস্বামী এবং সুরকার কল্যাণ সেন বরাট ও জয় সরকারের কৃতিত্বও অনেকখানি। শ্লেষাক্ত 'মেঝেতে গর্ত ছিল' এবং

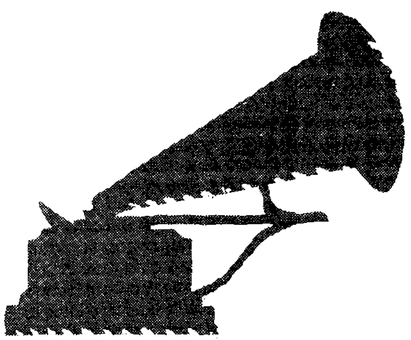

অনিবদ্ধ ছন্দের 'ঠিক সময় অফিস যায়' বেশ আকর্ষণীয়। তুলনায় জীবনানন্দ দাসের 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটির গীতকরণ অনুপযুক্ত ধরনের। স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্তের 'পাতাবাহার' (এইচ এম ভি ৮৪৩০৯৭) ক্যাসেটটির বেশির ভাগ গান প্রচলিত বাংলা আধুনিক ঢঙের তবে পাশ্চাত্য কায়দার যন্ত্রানুসঙ্গ কিছু নতুনত্বের আমদানি করেছে। গায়িকার নিজের কথা ও সুরে 'সেতারে সরোদে ভরেছে সুরবাহার' গানটিতে ঢিমা রক্ টাইমিং-এর পটভূমিতে যোগ রাগাশ্রিত সুরের সঞ্চারে বেশ মজার সৃষ্টি হয়েছে। আর একটি নিজ রচিত গান 'ইচ্ছে গাড়ি ছুটিয়ে দিয়ে' দ্রুত লাতিন আমেরিকান ছন্দ ও একটি বহুলব্যবহৃত স্প্যানিশ কর্ড প্রগতির উপভোগ্য ব্যবহার আছে। যন্ত্রানুষঙ্গ পরিচালক দুর্বাদল চট্টোপাধ্যায় মোটামুটি ভাল কাজই করেছেন তবে 'ছয় ঋতু ফিরে আসে' গানটির মাঝখানে পুরনো যুক্তরাষ্ট্রীয় 'সাউথ অফ দা বর্ডার' গানের সুর ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি।

শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এ মন আমার' ক্যাসেটটির (এইচ এম ভি ৮৪৩০৮৪) গানগুলি বহুকাল ধরে প্রচলিত বাংলা আধুনিকের ধারাই অনুসরণ করেছে। কোথাও কোথাও কিছু লোকসঙ্গীতের আভাসও আছে। এটির প্রধান ঐশ্বর্য গায়িকার কণ্ঠসম্পদ ও শিল্পবোধ। তরুণ গায়ক রাঘব চট্টোপাধ্যায়ও এই দিক থেকেই আকর্ষণীয় সম্পূর্ণ আধুনিক গায়ক হিসাবে। তাঁর 'ভোরের আলো' (এইচ এম ভি ৮৪৩০৭২) নামাঙ্কিত ক্যাসেটটিতে সাধারণ আধুনিক গানের কথা ও সুরের চালই প্রাধান্য পেয়েছে। পূর্ণেন্দু পত্রীর 'বড়ে গোলাম (ফুলের গন্ধ)' রচনাটিতে সুরকার চিরদীপ দাসগুপ্ত 'ললিত বিভাসে' পঙক্তিটিতে ললিতের স্বরে বেঁধে যেমন সাধারণ বুদ্ধি দেখিয়েছেন তেমন 'আয়ে না বালম' ও 'সাঁইয়া বোলো' গানগুলির অংশবিশেষ জুড়ে দিয়ে গানটিকে জগাখিচুড়ির পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন। ঐতিহ্যপূর্ণ ভৈরবী ঠুংরী 'বাজু বন্ধ খুল খুল যায়' গানটির মুখড়াটির আদলে এবং জোরদার পাশ্চাত্য ছন্দে 'আমার বুকে শুধু বালুচর' গানটি বেঁধে তিনি কী করতে চেয়েছেন তাও বোঝা মুশকিল। সেদিক থেকে রাঘবের নিজের সুর দেওয়া বাংলা ছড়া গান ঢঙের জয় গোস্বামী রচিত 'মাসি পিসি' অনেক বেশি সাঙ্গীতিক যুক্তিযুক্ত। তথাকথিত বাংলা 'জীবনমুখি' গানের গুরু সুমন চট্টোপাধ্যায় আর বব ডিলানের মতো গিটার বাজিয়ে গান না— ইলেকট্রনিক কী-বোর্ডে নিজের কথা ও সুরের সঙ্গে 'সমস্ত বাজনা' বাজান। তিনি আজ অনেক সংযত ও পরিণত। অন্তত তাঁর 'নিষিদ্ধ ইস্তেহার' (এইচ এম ভি ৮৪৩০৮৫) শুনে তাই মনে হয়। কাব্যাংশের অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিদীপ্ততা ও তাৎপর্যের ধারা বজায় আছে তাঁর এই ক্যাসেটটিতে। পাশ্চাত্য সুর ও বাংলা সুরের মিশ্রণের সজাগ প্রয়াস সব গানেই লক্ষণীয়। প্রতিবাদী গানের ধারাও বজায় রেখেছেন তিনি 'বিদ্রোহ', 'জমি' ও 'মেয়েটা' গানগুলিতে।

অপর নামজাদা 'জীবনমুখি' গায়ক, রচনাকার ও সুরকার অঞ্জন দত্তের এ বারের ক্যাসেট 'চলো বদলাই' (এইচ এম ভি ৮৪৩০৯৯)। বেশ গলা তাঁর—একই সঙ্গে জোয়ারিদার ও 'হাস্কি'। তবে তাঁর বেশির ভাগ গানের সুর সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য বাণিজ্যিক লোকসঙ্গীত ও পপসঙ্গীত কায়দার। যন্ত্রানুষঙ্গও তাই। বাঙালি মানস ও কলকাতার সঙ্গে যোগসূত্র তাঁর গানের কথা, যার কিছু কিছুর মধ্যে একটি উপভোগ্য কলেজ ক্যানটিন রসিকতা আছে। মার্কিন গায়ক জন ডেনভরের স্মৃতির উদ্দেশে গাওয়া তাঁরই 'সানশাইন' গানটি শুনে মনে হল অঞ্জন কিছু ইংরাজি ক্যাসেট করে বিদেশে পাঠালেও পারেন—বর্তমানের অনেক সাহেব গায়কের চেয়ে তিনি এসব ভাল গান! সুপরিচিত গায়িকা ইন্দ্রাণী সেনের ক্যাসেট 'চেনা চেনা সুরে' (এইচ.এম.ভি ৮৪৩০৯৬) পুরনো হিন্দি ছায়াছবির গানের বঙ্গীয়করণ (যদিও কভারে 'আধুনিক বাংলা গান' লেখা আছে)। ইন্দ্রাণীর কণ্ঠ ও শিল্পসম্পদই এইটির আসল নতুন সম্পদ।

নির্বাচিত তালিকার শেষ ক্যাসেটটি হিন্দুস্থানি/ উর্দু ভাষার গানের—'কাজরারে নয়না' (রাগা ২২৮-৯৮) এবং এই মাসেই প্রকাশিত। এটি কলকাতার 'ওমস্' (OHMS) দলের নতুন নিবেদন। দলটির প্রধান গায়ক ও সুরকার উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁর পৌত্র ও উস্তাদ মুনওয়ার আলি খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রজা আলি খাঁ। এঁকে আমরা এতদিন উচ্চাঙ্গসঙ্গীত গায়ক ও কসুর পাটিয়ালা ঘরানার খলিফা হিসাবেই জানতাম। দলের মুখ্য ইলেকট্রিক গিটার বাদক মধু মুখোপাধ্যায় ও বেস্ গিটার বাদক রজা আলির ছোট ভাই শাকির আলি খাঁ। প্রয়াত পাকিস্তানি গায়ক নুসরত ফতে আলি প্রসূত পাশ্চাত্য যন্ত্রানুষঙ্গের পটভূমিতে দেশজ গান গাওয়ার ধারারই এক সংস্করণ এই দলের শৈলী বলে মনে হয়। নিজের সুরে নিসার আখ্‌তারের 'এক তো নয়না,' আনসু আকবরবাদীর 'মেরি জান' ও 'তুমহারি লিয়ে', যুগান্তকারী গান 'মস্ত কলন্দর' এবং বড়ে গোলাম খ্যাত 'আয়ে না বালম' ও 'দেব মহেশ্বর মহাদেব' গানগুলি গেয়েছেন কৃতিত্বের সঙ্গে রজা আলি। সাড়াজাগানো সোলো গিটার বাজিয়েছেন মধু মুখোপাধ্যায় এই গানগুলির জায়গাবিশেষে। 'রাগা'র শব্দগ্রহণ ও গ্রন্থনা উচ্চমানের।

তালিকার বাইরের গোটা বাইশ ক্যাসেটের মধ্যে পুরনো আধুনিক গান ও ছায়াছবির গানের ভাল সংকলন 'বড় ভাল লাগে' (এইচ. এম. ভি ৮৪৩০৭২), 'আরো দূরে চলে যাই' (এইচ. এম. ভি ৮৪৩০৯৩), 'নাচ ময়ূরী নাচ রে' (এইচ. এম. ভি ৮৪৩০৯৪) ও 'সেই শান্ত ছায়ায় ঘেরা' (এইচ. এম. ভি. ৮৪৩০৮১)। পুরনো ও বিখ্যাত শিল্পীদের গাওয়া গানের যে নব সংস্করণগুলি গানের মান বজায় রেখেছে তার মধ্যে আছে শ্রীকান্ত আচার্য ও সাধনা সরগমের 'শুধু দুজনে' (সাগরিকা ৩১১২৫), পূর্বোক্তের 'কোন একদিন' (সাগরিকা ৩১১৩৫), সম্পা কুণ্ডুর 'গুন গুন সারাদিন' (সাগরিকা ৩১১৩২), অর্চন চক্রবর্তীর 'দূর আকাশের তারা' (এইচ. এম. ভি ৮৪৩০৭৩), শাওনী মিত্রের 'দূরের আকাশ' (এইচ. এম. ভি ৮৪৩১০১) এবং ইন্দ্রনীলের 'আমায় ভাল বাসবে দূরের বলাকা-৪' (অ্যাটল্যানটিস মিউজিক ১৮০)।

নানারকম দশটি

■ ওঁ। স্তব ও স্তোত্রপাঠ (সংস্কৃত)। স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত। এইচ.এম.ভি।

■ পুরাতনী বাংলা গান। চণ্ডীদাস মাল। এইচ.এম.ভি।

■ ভেতর ঘরে বৃষ্টি (আধুনিক)। লোপামুদ্রা মিত্র। এইচ.এম.ভি।

■ পাতা বাহার (আধুনিক)। স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত। এইচ.এম.ভি।

■ এ মন আমার (আধুনিক)। শ্রীরাধা বন্দোপাধ্যায়। এইচ.এম.ভি।

■ ভোরের আলো (আধুনিক)। রাঘব চট্টোপাধ্যায়। এইচ.এম.ভি।

■ নিষিদ্ধ ইস্তেহার (আধুনিক)। সুমন চট্টোপাধ্যায়। এইচ.এম.ভি।

■ চলো বদলাই (আধুনিক)। অঞ্জন দত্ত। এইচ.এম.ভি।

■ চেনা চেনা সুরে (বাংলায় হিন্দি ছায়াছবির গান)। ইন্দ্রাণী সেন। এইচ.এম.ভি।

■ কাজরারে নয়না (হিন্দুস্থানী/উর্দু) ওমস। রাগা।

পুরনো গানের মান রাখতে পারেনি শ্রেয়া ঘোষালের 'বেঁধেছি বীণা' (সাগরিকা ৩১১৩১) খারাপ উচ্চারণের জন্য; অনুসূয়া চৌধুরী (ঘোষ)-এর 'চেনা অচেনা' (এইচ. এম. ভি ৮৪৩১০০) শিল্পসমৃদ্ধির অভাবে; প্রসুন মুখার্জির 'সুরের আকাশ' (আশা অডিও এ. এ. ২০৩৬) খারাপ উচ্চারণ ও স্থৈর্যহীন কণ্ঠের জন্য; মধুমিতা, মধুশ্রী ও অমৃতার 'দূর নীলিমায়' (এইচ. এম. ভি ৮৪৩০৮৭) ত্রয়ীস্বর গানের অনুপযোগী হওয়ায়; মানসী মুখোপাধ্যায়ের 'তোমাকে ভালবেসেছি' (এইচ. এম. ভি ৮৪৩০৭৮) কিছু সুরচ্যুতি ও কণ্ঠে স্থায়িত্বের অভাবে; চঞ্চল চক্রবর্তীর 'কেন তুমি ফিরে এলে' (কনকর্ড ১২০৮৪) শ্যামল মিত্রের গান তাঁরই মতো গাওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টার জন্য এবং চন্দ্রাবলি রুদ্র দত্তের 'মেঘলা ভাঙা রোদ' (সাগরিকা ৩১১৩৭) কণ্ঠে স্থিরতার অভাবে।

মান্না দে-র নতুন ক্যাসেট 'মা আমার মা' (গাথানি ৭৮৭০) নিজ মানে হয়নি। নিজ মানের নিদর্শন হিসাবে তাঁর জনপ্রিয় গানের সংকলন 'হটস অফ মান্না দে (তৃতীয় খণ্ড)' (এইচ. এম. ভি ৮৪৩১০৫) শুনলেই এটা বোঝা যায়। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'কলসে কাঁকন লাগে' (এইচ. এম. ভি ৮৪৩০৮৩) মন্দ না হলেও তাঁর গান আগের মানের নয়। আর এক 'জীবনমুখী' নচিকেতার 'আমিই পারি' (এইচ. এম. ভি ৮৪৩০৭৬) ক্যাসেটটির বেশির ভাগ গানগুলির কথার সম্ভার যথেষ্ট ভাল নয়। সুরগুলিতেও নিজস্বতার অভাব আছে। 'রাজশ্রী' গানটির সুর উষা উত্থুপের একটি গানের মতো। তবে এটি রঞ্জন প্রসাদের 'নগর বেদুইন' ক্যাসেটটির (সাগরিকা ৩৩১১০৯) তুলনায় অনেক ভাল। 'স্বরচিত কাব্যসঙ্গীত কত চরিত্রহীন হতে পারে এই ক্যাসেটটি তার একটি ভাল নমুনা। রঞ্জন প্রসাদের কিছু রচনা জীবনমুখীদের সীমিতবুদ্ধিসম্পন্ন ভ্যাংচানি। পীট সীগার ও জন লেননের দুটি গানের রূপান্তর ঘটাতে গিয়ে তিনি এগুলির মহত্ত্ব নষ্ট করে দিয়েছেন। সীগারের একটি পঙক্তির রূপান্তর হয়েছে: 'সমাধির পাথরগুলি ফুল হয়ে ফুটে রয়'। মূল গানটিতে আছে—কবরস্থানগুলি ফুলে ছেয়ে গিয়েছে: 'গন্ টু দা ফ্লাওয়ারস এভরিওয়ান'। সাঙ্গীতিক মানের দিক থেকেও বাংলা সংস্করণগুলি অনেক নিম্নস্তরের। তবে গায়কের গলা মোটামুটি চলনসই।

বন্যার কন্যা, কি কৌতুকের দেবী

ক্ষণজীবী হলেও শারদ আকাশের মায়া মা দুর্গার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। অথচ মা যে অনেক সময়েই বর্ষার অঞ্চলাধৃত হয়ে আসেন এবং তাঁর আগমনে এই গাঙ্গেয় সমতট যে তখন আকণ্ঠ প্লাবিত থাকে, একথা মনে রেখে এককালে 'বসন্তক', যষ্টিমধু', 'সচিত্র ভারত' ইত্যাদি রসিক পত্রিকাগুলি বানভাসি উমাকে নিয়ে বহু কৌতুক পরিহাস করেছে। সেই কৌতুকাশ্রয়ী সৃজনশীলতা এখন আর বিশেষ দৃষ্টিগোচর নয়।

ছবি : 'বসন্তক'-এর সৌজন্যে

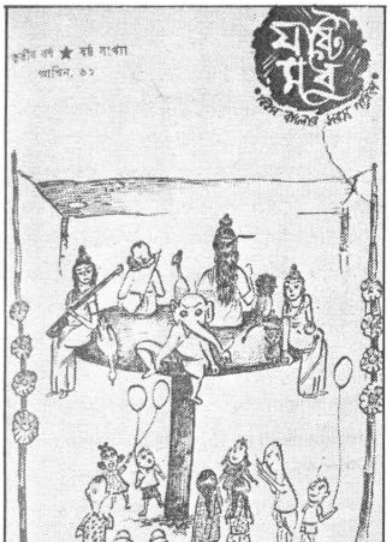

পুত্র কন্যা নিবে মাগো,
থাকো মাচায় ব'সে,
মাটির 'পরে নামলে পাছে
যাও গো বানে ভেসে।

চিত্র প্রদর্শনী নয়,
মায়ের পুজা

কাগজ-সর্বস্ব বাঙালীর মা

ছবি : 'যষ্টিমধু'-র সৌজন্যে

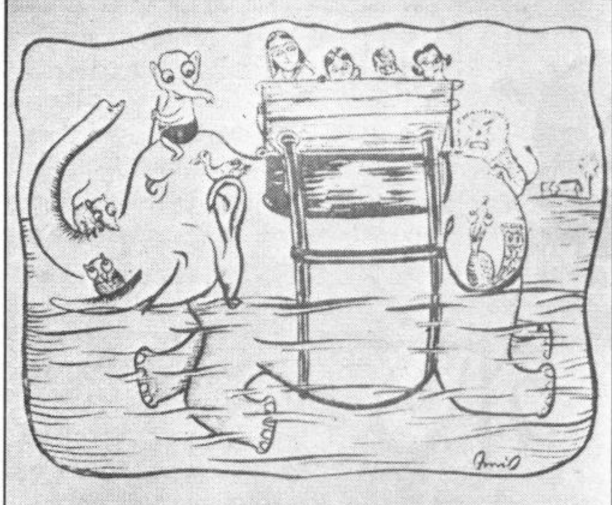

মা আসছেন গজে চ'ড়ে
সঙ্গে পুত্র কন্যা।
ঠাঁই নেইকো, বসাই কোথায়
চারদিকেতেই বন্যা॥

ফুটপাথে, মা

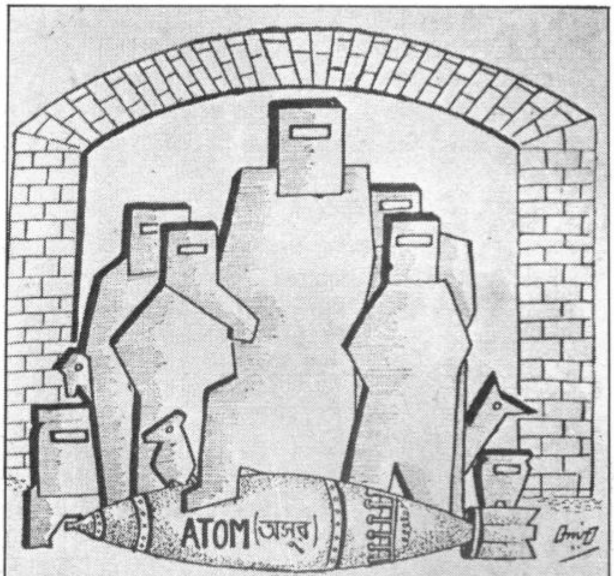

এটম-মর্দিনী

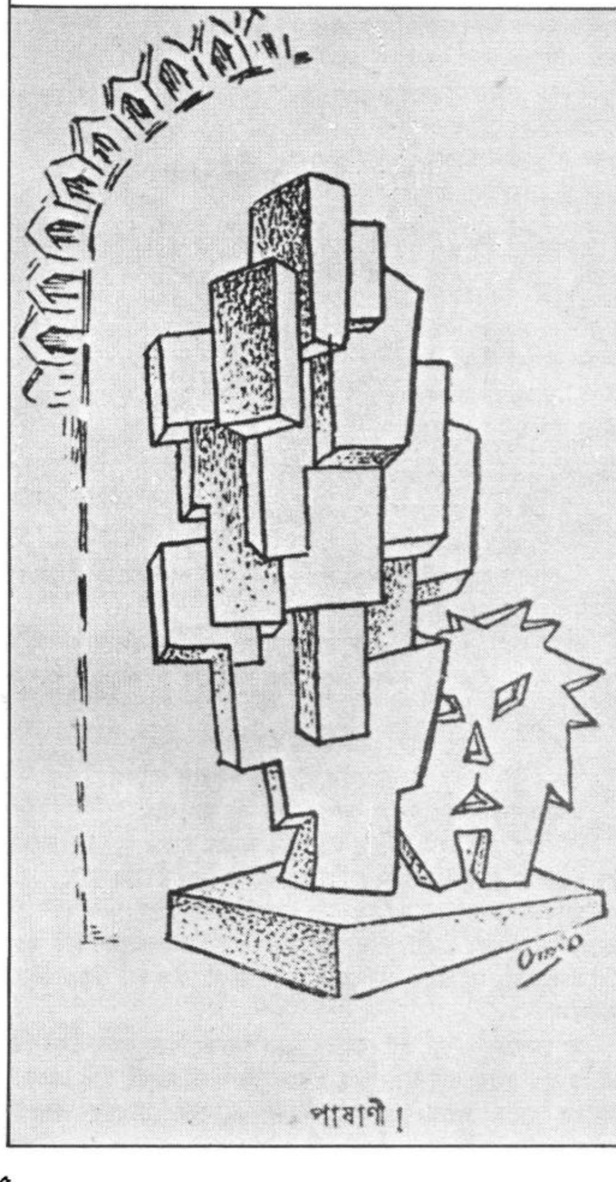

পাষাণী !

সংকলন : বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুনীল দাস

ছবি : 'যষ্টিমধু'-র সৌজন্যে

ধারাবাহিক উপন্যাস

অষ্টম গর্ভ

বা ণী ব সু

ঊনবিংশ পর্ব

শ্রীদাম-সুদাম-সুবল সখা

পাকুমা এসেছেন আমাদের বাড়ি। সঙ্গে মানিক। আমি বুনবুনের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলছি। মা ডাকছেন। আমরা দু-ভাই গেছি। পাকুমা অবাক হয়ে দেখছেন।

—'আশ্চর্য! কোনটা পুনপুন?'

ঠাকুমা হাসছেন—'আপনিই চিনে নিন না।'

পাকুমা তাকাচ্ছেন আমাদের দিকে। ভালো করে দেখছেন। এবার আমাকে খপ করে ধরে কাছে টেনে নিলেন।

—'ঠিক হয়েছে,' মা-ঠাকুমা বলছেন, মুখে হাসি।

—'কী করে চিনলেন!'

—'বাঃ, আমার মণি-মাণিক্য আমি চিনব না,' পাকুমার রহস্য নিশ্চয় কেউ বুঝতে পারল না।

আমি তো ছোট নই। পাকুমা আমাকে কোলে বসিয়েছেন বলে আমার লজ্জা করছে। বুনবুন পরে ঠিক আমাকে খ্যাপাবে। পাকুমা বুনবুনকে ডাকছেন।

—'এসো, তুমিও এসো। তোমাকে কী বলব? সোনা?'

বুনবুন পাকুমার হাত ছাড়িয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

মানিক বলল—'কেন রে পুনপুন, কত দিন যাস না।'

পাকুমার মুখে হাসি, কিন্তু দৃষ্টি স্থির আমার মুখের ওপর। চোখের ভেতর দিয়ে একেবারে মাথার ভেতর, বুকের ভেতর চলে যাচ্ছে।

মাণিক বলল— ' জানিস তো মেজদিমণির বিয়ে। কী মজা যে হবে। সারা হপ্তা মজা। খালি মজা করব। মাস্টারমশাইদের ছুটি করে দিতে বলেছি। মাসিমণি, পুনপুনের মাস্টারমশাইকেও ছুটি দিতে বলুন। বলুন না?'

মা হাসছেন—'হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমার মেজদিমণির বিয়ে যখন তখন তো ওরও ছুটি হওয়া চাই-ই! কিন্তু ইস্কুলে কি মাস্টারমশাই ছুটি দেবেন? মায়ের হাতে পত্তর। পাকুমা নিজে এসেছেন নেমন্তন্ন করতে। ডাক্তারবাবুর বাড়ি বলে কথা। যে ডাক্তারবাবু পাকুমার সায়াটিকাব ব্যাথা সারিয়েছেন। ছোটদের কৃমি, টনসিল, গ্ল্যান্ড, মাম্পস, হামজ্বর স-ব যাঁর কাছে এক্কেবারে কাবু হয়ে গেছে!

মানিক বুনবুনকেও সাধাসাধি করছে। 'চল না, চল না।'

আমার নিজের লোক এতগুলো, আমার একটু সাহস হয়।

বুনবুনের আগে পুনপুন এই ভাবে হাত ধরাধরি করে ওরা রাস্তা পার হয়। এখন পুনপুন লিড করছে, কেননা সিং বাড়িটা পুনপুনেরই চেনা এলাকা।

দীপুদা এসেছে, দীপুদা এলে সে মেজর-জেনারেল। 'সৈন্যগণ তোমরা নিশ্চয় জানো তোমরা আজাদ হিন্দ ফৌজ। মেয়েরা তোমরা ঝাঁসীর রানি বাহিনী। আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চল দিয়ে মাতৃভূমি ভারতবর্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।—চলো ইম্ফল। লাইন আপ বয়েজ অ্যান্ড গার্লস।'

আমরা সব বাইরের উঠোনে সার বেঁধে অ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে গেছি। 'স্ট্যান্ড অ্যাড ইজ', 'স্ট্যান্ড ইজি', বুনবুনের প্রত্যেকটা করতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। একবার দীপুদার বেটনের বাড়ি খেল। আমি শিউরে উঠছি। বুনবুন কাঁদবে না তো! দীপুদা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বলছে 'ডোন্ট মাইন্ড, আ অ্যাম নেতাজি ফলো মি।' বুনবুন কাঁদো-কাঁদো হয়েছিল। কান্নাটা গিলে নিয়েছে।

—'ভাই সব' দীপুদা/নেতাজি চিৎকার করে বলল 'চারদিকে ভী-ষ-ণ যুদ্ধ। বোমারু বিমান ঘোরাফেরা করছে আকাশে দলবেঁধে, আমরাও অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান নিয়ে রেডি আছি। ক্যাপটেন শাহনাওয়াজ, বুনবুনের দিকে তাকিয়ে বলল দীপুদা গেট রেডি। ওঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ।' বাস খেলা শুরু হয়ে গেল।

আমরা বাইরের উঠোন থেকে ভেতরের উঠোন। ভেতরের উঠোন থেকে অন্দরে, দোতলায়। আজকে আর কোথাও কোনও বাধা নেই। মাণিকের বাবার ঘরে টেবিলের ওপর মস্ত বড় চাদর বিছিয়ে দিয়েছি আমরা, বিছানা থেকে তুলে। চারদিকটা ঝুলে পড়ে টেবিলের তলাটা তাঁবু হয়েছে। আমি মানিক আর বেলী সেখানে। চাদর ফাঁক করে দীপুদা একবার দেখে গেল, খুব খুশি, বলল—'বাঃ, গুড, ঠিক আছে। কিন্তু ক্যাপটেন ধীলন, হবিবুর রহমান, লক্ষ্মী স্বামীনাথন তোমরা বলো এটা

কী?'

আমরা বলি—'তাঁবু, টেন্ট।'

—'উঁহু, এটা ট্রেঞ্চ। সোলজার্স, শিগগিরই কিন্তু শেল ফাটবে তখন তোমরা মরে যাবে।'

পকেট থেকে একটা হুইসেল বার করে দীপুদা ফুঁ দিল তাতে। জোরসে।

ব্যাস আমরা ট্রেঞ্চের ভেতরে ঢুকে গেলুম।

গায়েহলুদের তত্ত্ব এসেছে। সারা দালানটা ভরে গেছে। 'ছেলেরা খাবার নিয়ে খাও।' ট্রে থেকে তুলে তুলে আমাদের হাতে ইয়া ইয়া খাবার তুলে দিলেন মানিকের বড় জেঠিমা। খাস্তানিমকি, শিঙাড়া। বড় জেঠিমার শাড়ির পাড়ে বড় বড় হাতি চরে বেড়াচ্ছে। চুড়ি ঝমঝমে মোটা মোটা হাত। ছোট ছোট পুতুলের বালিশ তাঁর হাতের পাতায়। গায়েহলুদের তত্ত্ব এখনও আসছেই আসছেই। লাল ডুরে-শাড়ি-পরা দাসীতে দালান ঝমঝম করছে।

জেঠিমা বললেন, 'আমাদের এর ডবল যাবে।'

একজন কাকিমা বললেন—'এস্টেটের পয়সায় এখন কত লপচপানি করবে করে নাও দিদি, আমাদের ছেলেমেয়েগুলোর বেলায় ফক্কা।

—'মুরোদ থাকে তো বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এলেই হয়', কে একজন ঝংকার দিলেন।

—'কার বাপের বাড়ির কিসের পয়সা জানা আছে।'

এ বলল—'আমারও জানা, সকলেরই জানা, আমার বাবা ইয়ের টাকায় বড়লোক নয়।'

ও বলল—'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? ঠাকুমা তুলছো?'

সে বলল—'থামো থামো, জিনুর উনি তো ঠাকুমা নন, পিসিমা। বড় লোকের ধাইগিরি করে অনেক পয়সা ....'

এই রকম কথা ছোঁড়াছুঁড়ি চলতেই থাকল, আমরা টেবিলের তলায় শেল ফেটে মরে গিয়ে শুনতেই থাকলুম শুনতেই থাকলুম। মাঝখানে নিমকি, শিঙাড়া, কচুরিগুলো নিয়ে এসে আবার মরে গেছি। দীপুদা যদি এসে দ্যাখে মরবার নাম করে আমরা কচুরি-নিমকি খাচ্ছি, কী করবে বলা শক্ত। হঠাৎ তিন চারটে শাঁখের শব্দ। হুড়মুড় করে ছুটেছি সবাই। নীচে উঠোনে আলপনা, আলপনার মধ্যে শিল, চার দিকে কলাগাছ নিয়ে হলুদ হলুদ ডুরে শাড়ি পরে মানিকের মেজদিমণি চান করছে। কপালময় জবজবে তেল-হলুদ।

চারিদিকে মেয়ে মেয়ে খালি মেয়ে। মেয়েতে মেয়েতে ছয়লাপ। খিলখিল করে হাসতে হাসতে নামছে, উঠছে এ ওর গায়ে হেসে হেসে ঢলে পড়ছে। মেয়েগুলো ভারি ঢঙি হয়। পিসিমা বলেন—'ঢঙি, ধিঙ্গি, ভিরকুট্টি।' কতরকম রঙের শাড়ি, চুলের কী বাহার। গয়না ঝমঝম করছে। এত সাজতে হয় নাকি? ছিঃ আমাদের দিদিরা তো কখনও খোঁপা করে না। সব সময় বিনুনি। পাকা পাকা মেয়েরা খোঁপা করে। না রে বুনবুন? বুনবুন দেখ, ওরা কেমন মেঝেতে আলপনা আঁকছে, চুল আঁচল লুটিয়ে রয়েছে, ওদের শাড়িতেও আলপনা। কী ভালো লাগছে না রে? আমরা যেমন পেঁয়াজ রসুনের উগ্র গন্ধ সহ্য করতে পারি না, তেমনি বেশি সাজ, বেশি গয়নার মেয়েও সইতে পারি না। ভেতরটা কুঁকড়ে যায়। বুনবুনকে আমি মনে মনে জিজ্ঞেস করি, বুনবুন মনে মনে উত্তর দেয়। তার পর যেই আমরা দুজনে দুজনের দিকে তাকাই আমনি বুঝতে পারি বুনবুন কী বলছে, বুনবুন বুঝতে পারে আমি কী বলছি। এখন সুগন্ধ উঠছে চারদিকের বাতাসে। কেশতৈলের সুবাস, সেন্টের সুবাস। নিতুদা থেকে থেকে আমাদের গায়ে গোলাপ জল দিয়ে যাচ্ছে। আরও কত নতুন নতুন খেলুড়ি আসছে। ওই যে গোলাপি পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা গালফুলো হাবলুহুবলু ছেলেটা ও মানিকের পিসির ছেলে রথীন। বেনারসি ফ্রক পরা চুলে বো করে ফিতে বাঁধা যে মেয়েটা খালি একটা ঘরে ঢুকছে আর পান খেয়ে আসছে ও চামেলি, বেলীর দিদি। দীপুদার ছোট ভাই হীরুদার হাতেও একটা হুইসেল। মাঝে মাঝেই সেটা পকেট থেকে বার করে জোর ফুঁ দিয়ে দেয়। তার মানে স্ট্যাচু। আমরা যে যেখানে আছি দাঁড়িয়ে পড়েছি। কেউ সিঁড়ির এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে পা বাড়িয়ে, কেউ উঠোনে তিড়িং তিড়িং নাচের মাঝখানে, কেউ হা হা করে হাসছে সেই অবস্থায়।

শানাই বাজছে সমানে। শানাই বাজলে আমার কান্না পায়। দীপুদা বলেছে সন্ধেবেলায় আর খেলা নয়। ফিটফাট হয়ে অনেক কাজ করতে হবে। পদ্য বিলি করা, গোলাপফুলের বোকে আর বেলকুঁড়ির মালা দেওয়া। গোলাপজল স্প্রে করা। আমি গোবর্ধনকে ফুলের বোকে দিয়ে বকুনি খেয়েছি। নিতুদা সেই সক্কাল থেকে একটা গোলাপপাশ হাত করেছে। কিছুতেই হাতছাড়া করছে না। একদল ভদ্রলোকের ওপর দ্বিতীয়বার স্প্রে করতে একজন চোখ রাঙিয়ে বললেন—'আঃ ঃ ঃ ঃ!! কী হচ্ছেটা কী?' মানিকের নামে পদ্য হয়েছে,। একজন ভদ্রলোক মানিককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—'বারে মানিক বাঃ বেশ লিখেছিস তো! বল দিকিনি পদ্যটা একবার।' মানিক খানিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে কোঁচা গুটিয়ে দে ছুট। মানিক জানে না ও কী পদ্য লিখেছে? কী বোকা রে বাবা?

কিন্তু এতসব লোকের মধ্যে আমি নতুন কাকুকে খুঁজছি। আমার ভয় তিনি আমাকে খপ করে ধরে নিয়ে যাবেন। তার চেয়েও ভয় আমাকে নয়, বুনবুনকে আমি ভেবে, ধরে নিয়ে যাবেন। তখন সে পেচ্ছাপ আটকে মরে যাবে। আমি বুনবুনের দিকে তাকাই, সে ধুতি আর লাল সিল্ক সিল্ক পাঞ্জাবি পরেছে। বুনবুন পুনপুনের দিকে তাকায়, পুনপুন ধুতি আর সবুজ সিল্ক সিল্ক পাঞ্জাবি পরেছে। পুনপুন ভাবে বুনবুন নতুন কাকুর ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু বুনবুন মোটেই বুঝতে পারেনি, কেননা ও তো নতুন কাকুকে দেখেইনি। মানিক আমায় বলছে—'ভয় পাচ্ছিস কেন? নতুন কাকু তো নেই। দেশের জমি-জমা দেখাশোনা করতে পাকুমা নতুন কাকুকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। এত কাজ যে বিয়েবাড়িতেও আসতে পারেননি।' বলে মানিক এক রকম অদ্ভুত মুখ টিপে হাসি-কান্নার মাঝামাঝি মুখ করে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি মানিক নতুন কাকুকে ভয়ের কারণটা জানে। কী করে জানল? নতুন কাকু বলেছেন? যেদিন নতুন কাকু আমাকে নিয়ে দরজা দিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন কী মানিক আগে থেকেই আলমারির পেছনে লুকিয়ে ছিল?

রান্নাবাড়িতে মিষ্টির ঘরের সামনে চেয়ার পেতে কর্তামাকে বসে থাকতে দেখলুম। কর্তামাকে চেনেন না? উনি পাকুমার মেয়ে। এই মোটা! ভীষণ ফর্সা। চুলগুলো কুঁচি কুঁচি কুঁচি দেওয়া, সাদা- কালো ধবধবে সিল্কের থান কাপড় পরে হাতে কালো ভেলভেটের বটুয়া নিয়ে বসে আছেন। হঠাৎ খুব হই-চই কাণ্ড। রাঙাজেঠু, কর্তামার ছেলে বরযাত্রীদের মাঝখানে হাততালি দিয়ে নাচছেন, মুখ লাল, মুখের ফোলা জায়গাগুলো আরও ফুলে গেছে। কাছাকোঁচা খোলা অবস্থা। গোবর্ধন আর দায়ুদা চ্যাংদোলা করে শেষে রাঙাজেঠুকে নিয়ে যাচ্ছে। মানিকের বাবা বরযাত্রীদের বলছেন —'ওই সব নানান পৌষ্য, জ্ঞাতগুষ্টি রয়েছে, বুঝলেন না?'

কর্তামা দেখি ফোঁস-ফোঁস করে কাঁদছেন। এতক্ষণে পাকুমার দেখা মিলল। পাকুমা বলছেন—'অনেক দিনই তোমায় বলেছি বীথি, ছেলেদের বিলাস-ব্যসনের মধ্যে ডুবিয়ে না রেখে মানুষ করো, এখন কাঁদলে কী হবে?'

কর্তামা বললেন—'তাই বলে পাঁচজনের সামনে চিনতে চাইবে না?

পোষ্য-টোষ্য বলে হাত ধুয়ে ফেলবে? অ্যাতো আপমান?'

—'ওর চেয়েও বেশি অপমান কাজ-কর্ম না করে বসে থাকা। কিন্তু সে তো তুমি বুঝবে না!'

—'শুধু একটা করে বিয়ে দিয়ে দাও ছেলে দুটোর আমার..... এ কথা তোমাকে বলে বলে আমার মুখ পচে গেল মা, শুনলে আর এমন অবস্থা হত না।'

রাঙাজেঠু তো আমার বাবার চেয়েও বড়? রাঙাজেঠুর বিয়ে? শুনে আমার ভীষণ হাসি পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পাকুমা হাসছেন না, গম্ভীরভাবে বলছেন—'কর্মহীন, উদ্যমহীন পুরুষের বিয়ে দিয়ে কোনও মেয়ের নাককাটা আমার দ্বারা হবে না বীথি।'

কর্তামা এক থলো চাবি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন —'এই নাও তোমার মিষ্টির ঘরের চাবি।'

পাকুমা কোনও কথা না বলে দক্ষিণের ঘরে ঢুকে গেলেন। এদিক ওদিক চেয়ে কর্তামা আবার চাবিখানা তুলে নিচ্ছেন, চোখ মুছে ভারিক্কি হয়ে বসছেন চেয়ারে।

মানিকের এক কাকিমার মেয়ে ছবিরানি। একেবারে গোরিলার মতো মোটা। তার ভুরু নেই। চোখের পাতা নেই। নাক নেই। সমস্ত থাক থাক মাংসর তলায় যেন চাপা পড়ে আছে। ছবিরানি আমাদের থেকে বড়। কিন্তু কেন জানি না আমাদের দাদা বলে। আজকে বেগনি বেনারসী কাপড়ের কী একরকম মুসলমানী পোশাক পরে গড়গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তার ভুরু ধনুকের মতো করে আঁকা, ঠোঁটে লাল টুকটুকে লিলিস্টিক, গাল গেলাপি হয়ে আছে রং দিয়ে। নিশ্চয়ই ছবিরানিকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, তাই না? তার গলায় কত মালা, হার, কত রকম। কানে ঝুমকো। পায়ে ঝুমঝুম করছে মল। ছবিরানির সঙ্গে এক দিনেই আমার খুব ভাব হয়েছে। বলল,—'একটা জিনিস দেখবে'সো পুনপুনদা-বুনবুনদা। এসো না, এসো।' দোতলার কোণে ওদের ঘর। ঘরে কেউ নেই, খালি ছবিরানির খাস দাসী ক্ষ্যান্ত আছে। ছবিরানি বলছে—'এই ক্ষ্যান্ত, এই দাদাদের দেখা তো আমার সব জিনিস!' ক্ষ্যান্ত আঁচল থেকে চাবি বার করে খটাস করে একটা ট্রাঙ্ক খুলে ফেলল ভেতরে শুধু কাচের চুড়ি, রকম রকম কত রকম।

ছবিরানি বলল—'সব আমার বিয়ের তত্ত্বে যাবে।' বড় খ্যান্ত খটাস করে আর একটা ট্রাঙ্ক খুলল—তাতে শুধু মুক্তোর গয়না।

ছবিরানি বলল—'দেখেছো? কত্ত? ক্ষ্যান্ত দেখা দেখা আরও দেখা!'

ক্ষ্যান্ত বলল—'এমনি কত আছে। সোনা, হীরে, পান্না, চুনি সে সব বউদিমনির হুকুম না পেলে দেখাতে পারব না।'

আমি বললুম— 'থাক আর দেখব না।'

বুনবুন বলল—'থাক দেখব না। মে'দের গয়না দেখে কী করব?'

ঘরের একদিকে পরপর দশ বারোটা ট্রাঙ্ক। ছবিরানি বলল—'আলমারিতে আরও কত আছে। মা ছুঁচের কাজ করছে কত বালিশের ওয়াড়, কত চাদর, বেড কভার, টেবিল কভারে। সব আমার বিয়ের তত্ত্বে যাবে। একদিন মার সময় হলে দেখাব।'

হাসতে হাসতে ছবিরানি দরজার দিকে গড়াতে লাগল। পেছন থেকে বড় ক্ষ্যান্ত বলল—'বারো বছর বয়স হলেই তো মরে যাবে, কার ভোগে এ সব লাগবে কে জানে? ছবির দিদি তো দু বছর আগেই গেছে। তার আগেরটি গেল—তা বছর পাঁচ তো হবেই। শাঁপ আছে, শাঁপ!'

বুনবুন বলল—'মে'গুনো মরে যায়? আর ছেলেগুনো?'

—'ব্যাটাছেলে পেটে ধরতে পারে না গো। যাও পালাও দিকিনি, আমি এখন যক্ষির ধন আগলাই,' বলে ক্ষ্যান্ত ডিবে থেকে পান নিয়ে মুখে দিল।

অনেক অনেক লোকের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে খেতে চলেছি, এক

পাশে মানিক আর এক পাশে ছবিরানি মাঝে আমরা দু ভাই। বুনবুনকে আমি একবারের জন্যও কাছছাড়া করছি না। নতুন কাকু না থাকতে পারেন, কিন্তু এই বাড়ির পেটের ভেতরে অনেক গা-ছমছমে ব্যাপার আছেই আছে। ভুতুড়ে মেমসাহেব বউ, ভ্যানিশ-কাকিমা। আমার দায়িত্ব বুনবুনকে রক্ষা করা।

মানিক বলল—'আমি শুধু প্যাটিস আর আইসক্রিম খাব, ছবি তুই?'

ছবিরানি বলল—'আমি শুধু নুচি আর চপ। শেষকালে চাটনি দিয়ে পোলাও মেখে খাব, আর পাঁপর ভাজা। পুনপুনদাদা তুই?'

আমি বললুম—'আমি চপ, কাটলেট, প্যাটিস স-ব খাব।'

বুনবুন বলল—'আমি খালি মাংস খাব, মাংস। তোদের মাংসতে ঝাল দেয় না তো রে? আর আইসক্রিম।'

ছবি তার চুল ঝুলিয়ে বলল—'আর পান? পান খাবি না?'

—'নাঃ। সারা দিন পান খেয়েছি। এখন আমার দাঁত ব্যথা করছে। জিভ কেমন অসাড় ঠেকছে। আর পান খাব না।'

—'আমিও আর পান খাব না', ছবিরানি আমার হাত ধরে নাচতে নাচতে বলল—'আমারও সারাদিন ধরে পান খেয়ে খেয়ে গলা ব্যথা করছে, দাঁত যেন অসাড় ঠেকছে।'

রাত্তির বারোটার সময়ে যখন বর-কনে উলু দিয়ে দিয়ে বাসর ঘরে গেল তখনও চোখ টেনে টেনে জেগে থেকেছি। বাজি, বাজি হবে। বাবা বাড়িতে সাবান-নীল দিয়ে কাচা ধুতি পাঞ্জাবি পরে নেমন্তন্ন খেয়ে গেছেন। চুনোট করা ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবি পরা লোকেদের আমার ভালো লাগে না। আমাদের বাবাকে ভালো লাগে। কিন্তু এটাও ঠিক, এত লিলিস্টিক-রুজ মাখা লোকগুলোর মাঝখানে বাবাকে একটু

বেমানান দেখায়। আমার মনে হয় বাবাকে আড়াল করে থাকি। বাবাকে মলিন দেখালে আমি সইতে পারি না।

বাজি আরম্ভ হল। কে যেন বলল—'ভাগ্যিস বৃষ্টিটা হয়নি।' আরেক জন ভারী গলায় বলল—'রূপেন রায় বাজি পোড়াবে ঠিক করেছে, বৃষ্টি হবে?'

বাজির আলোয় হঠাৎ হঠাৎ দেখতে পাচ্ছিলুম দক্ষিণের ঘরের সামনে পাকুমা দাঁড়িয়ে। চুপটি করে। মুখটা বড্ড গম্ভীর। গম্ভীর না দুঃখী-দুঃখী? হঠাৎ মনে হল পাকুমা তো আসলে সুভগা যার সরল-সুন্দর দুটি ভাই হারিয়ে গেছে, পাকুমা তো আসলে শিবশঙ্করের বউ, যাঁর সঙ্গে শিবশঙ্কর রেগেমেগে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। পেছন থেকে বাবা এসে খপ করে আমায় তুলে নিয়েছেন। বুনবুন বাজির লোভ ছেড়ে অনেক আগেই চলে গেছে। বাবার কোল থেকে দেখছি আকাশে আগুনের অক্ষরে লেখা হয়ে যাচ্ছে—গুডবাই, ফেয়ার ওয়েল।

সকাল বেলা। বর-কনে ভোরবেলা চলে গেছে। অনেক দূরে যেতে হবে। আমাদের রাস্তাটার কী বিশ্রী দশা হয়েছে। কলাপাতা, মাটির গেলাস, খুরি, আর লোকের ফেলে যাওয়া উচ্ছিষ্টের পাহাড়, তার ওপর বাসি ফুল, ভিখারি আর কুকুর জড়ো হয়েছে কত। পেছনের দরজা দিয়ে কাঙালি বিদায় হচ্ছে। যা-যা সব বেঁচেছে কাঙালিরা পাচ্ছে। কিন্তু গন্ধে আমার গা-বমি করছে। কার যেন কী অসুখ, বাড়াবাড়ি হয়েছে। পাকুমা ডেকে পাঠিয়েছেন বাবাকে।

বাবা বললেন—'পাবন এখন যেও না, কাজে যাচ্ছি।'

মা বললেন—'যাক না। ছটফট করছে তখন থেকে। ও তো মানিকের সঙ্গে....'

বাবা তাঁর ওষুধের ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছেন। এর ভেতরে খোপ খোপ কাটা আছে তাতে রকমারি ওষুধ সাজানো। বাবার গলায় স্টেথোস্কোপ।

ছবিরানির বাবার অসুখ। তাই আমার ভীষণ কৌতূহল। মানিককে নিয়ে আমি ছবিরানির বাবার ঘরে ঢুকেছি। ট্রাঙ্কের ঘরটার পাশে। বিরাট ঘর! নিচু খাটে ছবিরানির বাবা শুয়ে। কী বিচ্ছিরি চেহারা। দাড়ি গোঁফ। গায়ে ঢাকা দেওয়া। বাবা একটা ওষুধ দিলেন।

পাকুমা বললেন—'ভাল হবে তো? ডাক্তারবাবু!'

বাবা খুব গম্ভীর। দেয়ালের দিকে চেয়ে বলছেন—'এ রোগ তো আপনার অনেক দিনের। কখনও ইনজেকশন নেননি? ওষুধ পালা কিচ্ছু করেননি? ছিঃ ছিঃ!' ছবিরানির মা কাঁদছেন। এই প্রথম ওঁকে দেখলুম। ছবিরানি ঠিক যতটা মোটা, ওর মা ঠিক ততটাই রোগা।

—'ছেলেমেয়ে হয়েছে?' বাবা জিজ্ঞেস করছেন।

পাকুমা জবাব দিচ্ছেন—'মেয়ে হয়, বেশ হয়, যত বড় হতে থাকে কেমন যেন হয়ে যায়। তারপর দশ-বার বছর বয়স হলেই...।'

—'হুঁ', বাবা বললেন 'আপনি যদি বলেন ওঁকে, মানে ওঁর স্ত্রীকে আমি একটু ওষুধ দেব এবারের সন্তানটি স্বাভাবিক হবে, মারা যাবে না।' বাবা ওষুধের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

পাকুমা বলছেন—'রুগিকে ওষুধ দিলেন না?'

—'দেব। হয়তো কষ্ট একটু কমবে, কিন্তু পাকুমা...বুঝতেই পারছেন...আপনারা বিধান রায় মশাইকে একটা কল দিয়ে দেখুন। কিন্তু ওঁর স্ত্রীর জন্য যে পুরিয়া দিয়ে যাচ্ছি, তা নিয়মিত খাওয়াবেন। নইলে আমাকে আর ডাকবেন না।'

যৌবন শক্তির অনুভব

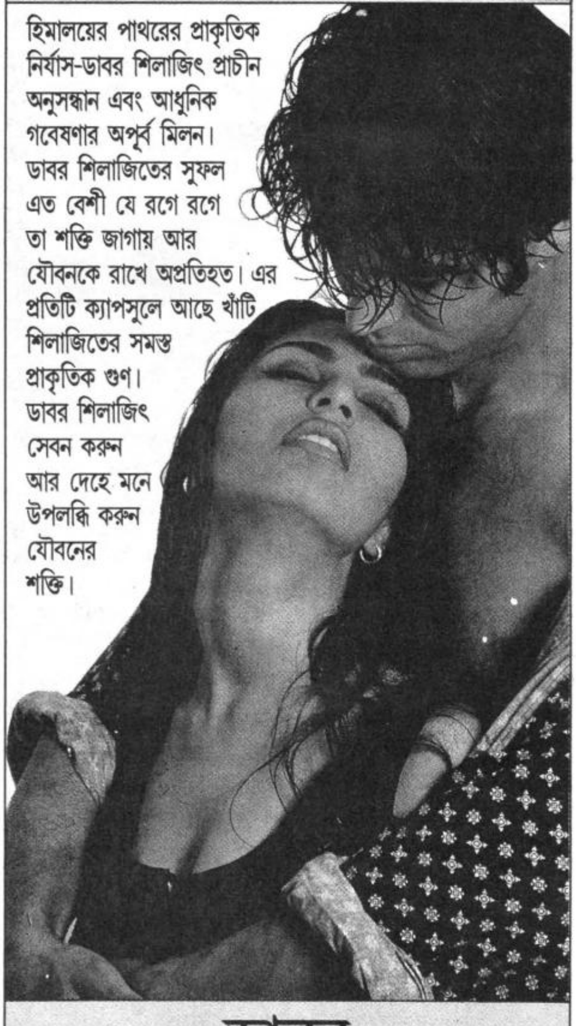

হিমালয়ের পাথরের প্রাকৃতিক নির্যাস-ডাবর শিলাজিৎ প্রাচীন অনুসন্ধান এবং আধুনিক গবেষণার অপূর্ব মিলন। ডাবর শিলাজিতের সুফল এত বেশী যে রগে রগে তা শক্তি জাগায় আর যৌবনকে রাখে অপ্রতিহত। এর প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে খাঁটি শিলাজিতের সমস্ত প্রাকৃতিক গুণ। ডাবর শিলাজিৎ সেবন করুন আর দেহে মনে উপলব্ধি করুন যৌবনের শক্তি।

ডাবর শিলাজিৎ

১০, ৩০ আর ১০০ ক্যাপসুলের প্যাকেট পাওয়া যায়।

ছায়ার মতো আমি আর মানিক সরে গেছি পেছনে। ছবিরানির মা বললেন—'অসুখের ঘরে ছোট ছেলেদের থাকতে নেই। কেন এসেছ?'

সত্যিই তো? কেন এসেছি? কিসের টানে? রোগ, যন্ত্রণা, মৃত্যুর টানে? না ছবিরানির মা বাবাকে দেখবার জন্য, যে ছবিরানির বিয়ের গয়না আর কাপড়ে একটা পুরো ঘর ঠাসা! না, বোধহয় মৃত্যুর টানেই। ছবিরানি আর মৃত্যু এক। দিন সাতেকের মধ্যেই মানিক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, ছবিরানি মারা গেছে। এত মোটা হয়ে গিয়েছিল যে ফেটে গিয়ে মারা গেছে। আমি ছবিরানির শব দেখতে পাইনি। খালি ওর বাবা-মার চোখ দেখেছিলুম। বাবা চোখ বুজিয়ে শুয়েছিলেন, আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না ছবিরানি নেই। মরে গেলেও কোথাও না কোথাও আছেই। খাটের তলায়, আলমারির কোনায়। আমার দৃষ্টি ছিল খাটের তলায়। হঠাৎ ওর বাবা ফটাস করে চোখ দুটো খুললেন, আবার ফটাস করে চোখ বন্ধ করলেন, যেন বাক্সের ডালা বন্ধ করা হল। ছবিরানির মা মেঝের ওপর একটা জরিপাড় ডুরে শাড়ি পরে বসেছিলেন। চোখ দুটো খোলা, কিন্তু যেন কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না।

ছবিরানির বাবা ঠিক কবে মারা গেলেন, আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু পরে যখনই ও ঘরে গেছি দেখেছি কেউ নেই। বিছানা সুজনি দিয়ে ঢাকা, ঘরে এত ধুনো-গুগগুল দেওয়া হচ্ছে যে সুগন্ধ ধোঁয়ায় ঘরে টেকা যায় না। ডুরে শাড়ি পরা রোগা মাকে দালান দিয়ে আস্তে আস্তে নিয়ে যাচ্ছে খ্যান্ত দাসী। তারপর একদিন নিউ ইন্ডিয়ান স্কুল থেকে ফিরতে মানিক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল ছবিরানির মায়ের একটা খোকা হয়েছে। খোকা দেখতে অমনি ছুটেছি। ডাক্তারবাবু, নার্স, সাদা অ্যাপ্রন পরে বাইরে বেরিয়ে এলেন, পাকুমাকে বললেন—'ভয় নেই। উনি ভালো আছেন। বাচ্চা সেন্ট পার্সেন্ট নর্ম্যাল।'

পাকুমা হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন—'ডাক্তারবাবুর দয়া।'

ডাক্তার হেসে বললেন—'দয়া-টয়া কিছু নয় মা, সায়েন্স, মেডিক্যাল সায়েন্স।'

পাকুমা বিষণ্ণ হাসি হাসছেন। আমি বুঝতে পেরেছি উনি এই ডাক্তারবাবুর কথা বলছেন না। আমার বাবার কথা বলছেন। পেছন ফিরে আমায় দেখে মাথায় হাত রাখলেন পাকুমা।

—'খোকা দেখবে?'

—'হ্যাঁ, পাকুমা।'

—'খ্যান্ত, দেখাও তো!' খ্যান্ত কোলের ওপর ধবধবে সাদা তোয়ালে-জড়ানো, মুখ-কুঁচকোন, লোমশ একাটা সাদা মতন বাচ্চা দেখাল। কাঠি কাঠি হাত পা।

—'কেমন, ভালো?'

মানিক বলল—'বিচ্ছিরি, বাঁদরের মতন।'

আমি বললুম—'বেরালছানা ভিজে গেলে এরকম হয়।'

খ্যান্ত হেসে বললে—'তিন চার মাস যেতে দাও তখন এই বাচ্চাকে দেখে দেখেই আর তোমাদের আশ মিটবে না, ঘর আলো করা খোকা হয়েছে, আহা।'

এ তো গেল জন্মকথা। মৃত্যু কিন্তু ছবিরানির সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে দুটোকে আলাদা করতে পারতুম না। তাই কিছুদিন পরে যখন আমার ঠাকুর্দা মাঝরাতে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মারা গেলেন, তখন আমি চোখের সামনে যেন দেখতে পেলুম সাদা, পিপের মতো, মাখনের মতো, ভুরুহীন, চোখের পাতাহীন, ছবিরানি মুসলমানি পোশাক পরে গড়াচ্ছে. গড়াতে গড়াতে ফুলে যাচ্ছে, আরও ফুলে যাচ্ছে, তার পর দুম করে ফেটে গেল। ব্যাস আমার ঠাকুর্দাও মারা গেলেন। এই ছবিরানি। এই-ই মৃত্যু ।

অঙ্কন : সুব্রত চৌধুরী

(ক্রমশ)

কখন কোথায়

১৯ সেপ্টেম্বর—২ অক্টোবর

কলকাতা ও শহরতলির মঞ্চে কিংবা প্রদর্শশালায় যে সমস্ত অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়, তার নির্বাচিত বিজ্ঞপ্তি সম্ভাব্য দর্শক-শ্রোতাদের জানিয়ে দেওয়ার জন্য, এই নতুন বিভাগটি শুরু হয়েছে। পুজার ছুটির জন্য ৩ অক্টোবর সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। সেই কারণে ১৭ অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশের জন্য ১৭-৩০ অক্টোবরের 'দেশ' পত্রিকা সম্পাদকের কাছে ৭ অক্টোবরের মধ্যে পৌঁছে দিলে সে খবর এখানে সাদরে ছাপা হবে।

সংগীত

স্থান : সংগীত রিসার্চ অকাদেমি সময় : সন্ধে ৬টা

■ **সংগীত সন্ধ্যা**। শিল্পী : ইন্দ্রাণী চ্যাটার্জি (কণ্ঠ) গুরু : অরুণ ভাদুড়ী। তবলা : চন্দ্রভান, ২৩ সেপ্টেম্বর

শিল্পী : ইন্দ্রাণী চ্যাটার্জি

স্থান : গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন। সময় : সন্ধে ৬টা

■ **সংগীত সন্ধ্যা**। ভায়োলিন বাদন : জর্জ লিনডেনমেয়ার, তবলা : দেবাশিস ব্রহ্মচারী, ২২ সেপ্টেম্বর

স্থান : শিশির মঞ্চ : সময় : সন্ধে ৬টা

■ **তরুণ শিল্পীদের গান**। প্রযোজনা: সম্প্রীতি, ২০ সেপ্টেম্বর

■ **দুর্গার আগমনী গান ও নৃত্য**। প্রযোজনা : দীপ, ২৫ সেপ্টেম্বর

স্থান : ম্যাক্সমুলার ভবন, সময় : সন্ধে ৬-৩০

■ **বাদ্যানুষ্ঠান**। প্রযোজনা : ক্যালকাটা ফাউন্ডেশন অর্কেস্ট্রা, পরিচালনা: জোনাথন গোভিয়াস, ১৯ সেপ্টেম্বর

নাটক

নাট্যশালা : অ্যাকাডেমি, সময় : সন্ধে ৬-৩০

■ **মুখোমুখি**। প্রযোজনা : চার্বাক, ১৯ সেপ্টেম্বর, দুপুর ৩টে

■ **অগা**। প্রযোজনা : নটসেনা, ২০ সেপ্টেম্বর, দুপুর ৩টে

■ **সম্প্রদান**। প্রযোজনা : নিউ থিয়েটার্স গ্রুপ, ২০ সেপ্টেম্বর

■ **অরণ্যদেব**। প্রযোজনা : গণকৃষ্টি, ২১ সেপ্টেম্বর

■ **হিম্মত মাই**। প্রযোজনা : রঙ্গকর্মী, ২২ সেপ্টেম্বর

■ **রাতভোর**। প্রযোজনা : গন্ধর্ব, ২৩ সেপ্টেম্বর

■ **পাপ**। প্রযোজনা : অনসম্বল, ২৪ সেপ্টেম্বর

■ **মতিলাল পাদরী**। প্রযোজনা : মাঙ্গলিক, ২৫ সেপ্টেম্বর

■ **সমাপ্ত অধ্যায়**। প্রযোজনা : বহুরূপী, ২৬ সেপ্টেম্বর, দুপুর ৩টে

■ **পরাজিত বিদ্রোহী ও সমাধান**। প্রযোজনা : নান্দীপট, ২৬ সেপ্টেম্বর

■ **আতরবালার খালি কোঠি**। প্রযোজনা: প্রয়াস, ২৭ সেপ্টেম্বর, দুপুর ৩টে

■ **নাগরিক**। প্রযোজনা : সংস্তব, ২৭ সেপ্টেম্বর

■ **তপস্বী ও তরঙ্গিনী**। প্রযোজনা : থিয়েট্রন, ২৮ সেপ্টেম্বর, দুপুর ৩টে

■ **অদ্ভুত আঁধার**। প্রযোজনা : অন্য থিয়েটার, ২৮ সেপ্টেম্বর

■ **সদাগরের নৌকো**। প্রযোজনা : থিয়েটার ওয়ার্কশপ, ২৯ সেপ্টেম্বর, দুপুর ৩টে

■ **পটুয়া**। প্রযোজনা : অ্যাকট, ২১ সেপ্টেম্বর

নাট্যশালা: শিশির মঞ্চ, সময় : ৬-৩০

■ **পুঁটি রামায়ণ**। প্রযোজনা : নটরাজ, ২৬ সেপ্টেম্বর

স্থান: রবীন্দ্রসদন, সময় : ৬-৩০

■ **নর্মান বেথুন**। প্রযোজনা : চারণিক, ২৩ সেপ্টেম্বর

নাট্যশালা : মুক্ত অঙ্গন, সময় : সন্ধে ৬-৩০

■ **গভীর অসুখ** : প্রযোজনা : শৌভনিক, ২০ সেপ্টেম্বর

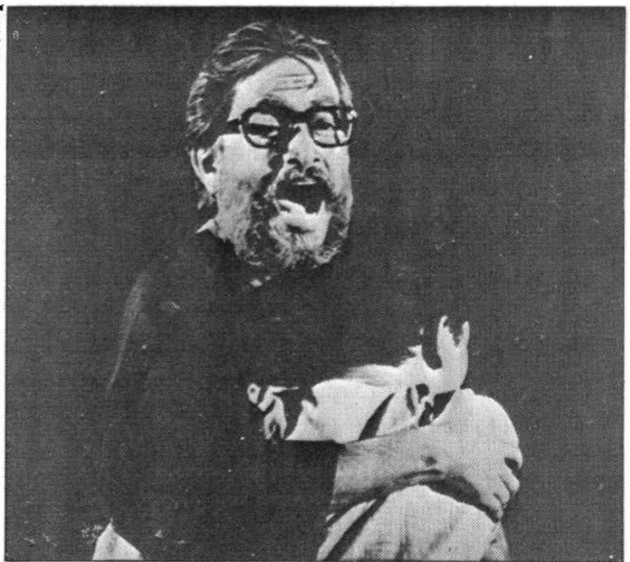

পঞ্চম বৈদিকের নাটক : অগ্নিমন্থ, ২৪ সেপ্টেম্বর, মধুসূদন মঞ্চ। সন্ধে ৬-৩০

■ **সাফল্য**। প্রযোজনা : নাট্যরঙ্গ, ২৯ সেপ্টেম্বর

■ **হাত বাকসো**। প্রযোজনা : সমকালীন শিল্পীদল, ৩০ সেপ্টেম্বর, দুপুর ৩টে

■ **যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল**। প্রযোজনা : গান্ধার, ৩০ সেপ্টেম্বর

■ **পানু শান্তি চেয়েছিল**। প্রযোজনা : রঙরূপ, ২ অক্টোবর, দুপুর ৩টে

নাট্যশালা : উত্তম মঞ্চ, সময় : দুপুর ৩টে ও ৬-৩০

■ **বাসভূমি**। প্রযোজনা : সায়ক, ২৯ সেপ্টেম্বর

নাট্যশালা : গিরিশ মঞ্চ, সময় : ৬-৩০

চিত্রকলা

প্রদর্শশালা : অ্যাকাদেমি অফ ফাইন আর্টস, সময় : ৩—৮টা

■ **বন্দনা রায়ের কাজ**। ওয়েস্ট গ্যালারি, ২১—২৬ সেপ্টেম্বর

■ **শক্তিব্রত মুখার্জির কাজ**। নিউ সাউথ গ্যালারি, ২১—২৬ সেপ্টেম্বর

■ **অশোক রায় কর্মকারের কাজ**। সেন্ট্রাল গ্যালারি, ২২—২৭ সেপ্টেম্বর

■ **শুভেন্দু প্রধানের কাজ**। ওয়েস্ট গ্যালারি, ৩—৯ অক্টোবর

■ **অরূপ মান্না এবং কৃষ্ণা দে'র কাজ**। নর্থ গ্যালারি, ৩—৯ অক্টোবর

■ **বিদুলা নাথের কাজ**। নিউ সাউথ গ্যালারি, ৩—৯ অক্টোবর

■ **বধির মহিলাদের কাজ**। সাউথ গ্যালারি, ৩—৯ অক্টোবর

শিল্পী : ইলিনা বণিক

প্রদর্শশালা : গ্যালারি ৮৮, ২—৭টা

■ **ইলিনা বণিকের কাজ**। ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

প্রদর্শশালা : ভারতীয় যাদুঘর, আশুতোষ শতবার্ষিকী হল : সময় : ১২—৮টা

■ **প্রশান্ত বসুর ভাস্কর্য ও চিত্র প্রদর্শনী**। ২১—২৩ সেপ্টেম্বর

সভাসমিতি

স্থান : গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন

■ **মহিষাসুরমর্দিনী** : বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কল (জুনিয়র)-এর নিবেদন, ২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধে ৬টা

■ **বেদান্ত থ্রু দি এজেস**। বক্তা : আর কে দাশগুপ্ত, ২১ সেপ্টেম্বর, সন্ধে ৫-৩০

■ **ভগবত গীতা**। বক্তা : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, ২২ সেপ্টেম্বর, সন্ধে ৬-১৫

অন্যান্য

স্থান : শিশির মঞ্চ, সময় : সন্ধে ৬টা

■ **চারুকলা বিষয়ে সেমিনার**। উদ্যোক্তা: তথ্যসংস্কৃতি বিভাগ, ১৯ সেপ্টেম্বর

স্থান : রবীন্দ্রসদন, সময় : সন্ধে ৬টা

■ **বিশ্বতানের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ**। উদ্যোক্তা : বাতায়নিক, ১৯ সেপ্টেম্বর

স্থান: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি, সময়: ৫টা-৯টা

■ **নাট্য আলোচনা**। উদ্যোক্তা: স্যাস নাট্যপত্রিকা, ১৯ সেপ্টেম্বর

■ **শিশুগ্রন্থ প্রকাশ ও আলোচনা**। উদ্যোক্তা: সংস্কৃতি সংসদ, ১৯ সেপ্টেম্বর

■ **কবিতাপাঠের অনুষ্ঠান** উদ্যোক্তা: প্রতিশ্রুতি, ২২ সেপ্টেম্বর

কিশোর সাহিত্যের সেরা আনন্দসম্ভার

সত্যজিৎ রায়

অপুর পাঁচালি ৭৫.০০
আরো একডজন ৪০·০০
আরো বারো ৩০·০০
আরো সত্যজিৎ ১৭৫·০০
একডজন গপ্‌পো ৪০·০০
একেই বলে শুটিং ৪০.০০
একের পিঠে দুই ৪০·০০
এবারো বারো ৩০·০০
কলকাতায় ফেলুদা ১০০.০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারী ২৫·০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ২৫·০০
গোরস্থানে সাবধান ২৫·০০
ছিন্নমস্তার অভিশাপ ২৫·০০
জবর বারো ৪০·০০
জয় বাবা ফেলুনাথ ২৫·০০
টিনটোরেটোর যীশু ২৫·০০
ডবল ফেলুদা ৩০·০০
তারিণীখুড়োর কীর্তিকলাপ ২৫·০০
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম ২৫·০০
দার্জিলিং জমজমাট ২৫·০০
নয়ন রহস্য ৩০·০০
পাহাড়ে ফেলুদা ১০০·০০

পুনশ্চ প্রোফেসর শঙ্কু ৫০·০০
প্রোফেসর শঙ্কু ৪০·০০
প্রতিকৃতি ৫০.০০
প্রোঃ শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৩০·০০
ফটিকচাঁদ ২০·০০
ফেলুদা এণ্ড কোং ৩০·০০
ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু ৩০·০০
ফেলুদা প্লাস ফেলুদা ২৫·০০
বাক্স রহস্য-ক্যাসেট সহ ৭৫·০০

বাক্সরহস্য ২৫·০০
বাঃ ! ১২ ৩৫·০০
বাদশাহী আংটি ২৫·০০
ব্রেজিলের কালো বাঘ ২৫·০০
মহাসংকটে শঙ্কু ৩০·০০
মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প ২০·০০
যখন ছোট ছিলাম ৩৫·০০
যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে ২৫·০০
রবার্টসনের রুবি ২৫·০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ২৫·০০
শঙ্কু একাই ১০০ ৩৫·০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৩০·০০
সেলাম প্রোফেসর শঙ্কু ৪০·০০
সুজন হরবোলা ৩০·০০
সেরা সত্যজিৎ ১৭৫·০০
সেরা সন্দেশ (সম্পাদিত) ১৫০·০০
সোনার কেল্লা ২৫·০০
স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু ৩০·০০
হত্যাপুরী ২৫·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আঁধার রাতের অতিথি ৪০·০০
আগুন পাখির রহস্য ৩০·০০
আ চৈ আ চৈ চৈ ২৫·০০
উদাসী রাজকুমার ৪৫·০০
উল্কা রহস্য ৩০·০০
কলকাতার জঙ্গলে ১৮·০০
কাকাবাবু ও বজ্রলামা ২৫·০০
কাকাবাবু বনাম চোরাশিকারি ৪০·০০
কাকাবাবু সমগ্র ১ ১২০·০০
কাকাবাবু সমগ্র ২ ১২০·০০

কাকাবাবু সমগ্র ৩ ১০০·০০
কাকাবাবু সমগ্র ৪ ১২০·০০
কাকাবাবু হেরে গেলেন? ২০·০০
কাকাবাবুর প্রথম অভিযান ৫০.০০
কালোপর্দার ওদিকে ৩৫·০০
খালি জাহাজের রহস্য ৩৫·০০
জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল ২৫·০০
জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ ২০·০০
জলদস্যু ৪০·০০
জোজো অদৃশ্য ৫০.০০
ডুংগা ৩০·০০
তিন নম্বর চোখ ৪০·০০
পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক ৫০·০০
বিজয়নগরের হিরে ২৫·০০
ভয়ংকর সুন্দর ৩৫·০০
মিশর রহস্য ৩০·০০
রাজবাড়ির রহস্য ৩০·০০
সত্যি রাজপুত্র ১৫·০০
সন্তু ও একটুকরো চাঁদ ২৫·০০
সন্তু কোথায় কাকাবাবু কোথায় ৫০·০০
সবুজ দ্বীপের রাজা ৩০·০০
হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি ২০·০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

কুঞ্জপুকুরের কাণ্ড ৩০·০০
গোসাঁই বাগানের ভূত ৩৫·০০
গৌরের কবচ ২৫·০০
চক্রপুরের চক্করে ৩০·০০
ছায়াময় ১৫·০০
ঝিলের ধারে বাড়ি ৩৫·০০
দুধসায়রের দ্বীপ ৩৫·০০
নবীগঞ্জের দৈত্য ৩০·০০
নৃসিংহ রহস্য ৩০·০০
পটাশগড়ের জঙ্গলে ২০·০০
পাগলা সাহেবের কবর ২৫·০০
পাতাল ঘর ৩৫·০০
বক্সার রতন ৩০·০০
বনি ৩০·০০
বিপিনবাবুর বিপদ ৩৫.০০
ভুতুড়ে ঘড়ি ৩৫·০০
মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ২৫·০০

সোনার মেডেল ২৫·০০
হিরের আংটি ২৫·০০
হেতমগড়ের গুপ্তধন ২৫·০০

সুকুমার রায়

সুকুমার সাহিত্য সমগ্র
১ম ৭৫.০০
২য় ৫০.০০
৩য় ১২৫.০০
সমগ্র কিশোর সাহিত্য ৪০·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকম্পের পটভূমি ১২.০০
শরদিন্দু অমনিবাস ৪র্থ খণ্ড ৭৫.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন : ২৪১-৪৩৫২, ২৪১-৩৪১৭

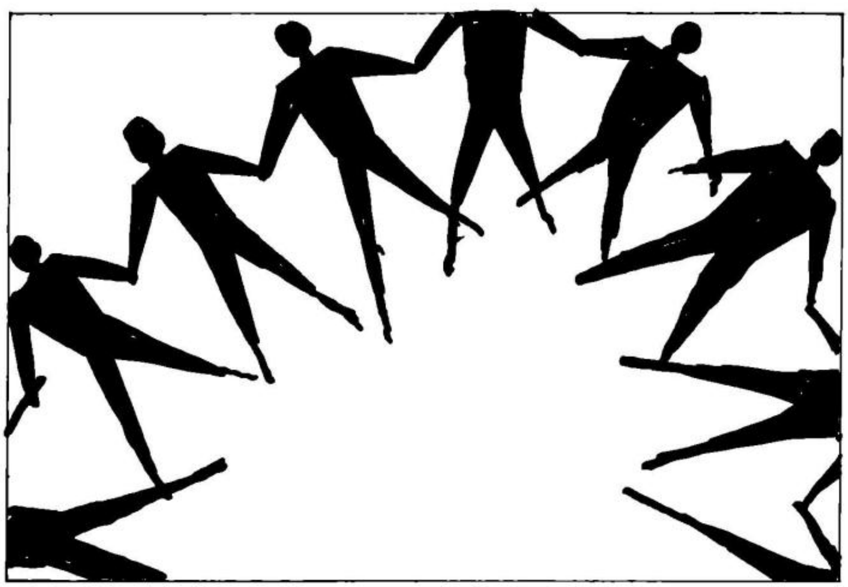

বাঙালি চিন্তনে সাম্যবাদভাবনার বৃত্তান্ত

আলোচনা : শোভনলাল দত্তগুপ্ত

বাঙ্গালির সাম্যবাদ চর্চা
(সং) শিপ্রা সরকার ও অনমিত্র দাশ
আনন্দ পাবলিশার্স/ কল-৯/ ২৫০.০০

সাম্যবাদ, বিপ্লব, বৈপ্লবিক মতাদর্শ, বিপ্লবী অভ্যুত্থান ইত্যাদি ধারণাগুচ্ছ বাঙালির মনন ও আবেগকে ইতিহাসের বিভিন্ন মুহূর্তে কেন প্রবলভাবে তাড়িত করেছে তা নিয়ে গবেষণা হয়েছে বিস্তর। অবিভক্ত বাংলায় সাম্যবাদী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ও তার বিভিন্ন দিক্ নিয়ে বেশ কিছু মূল্যবান লেখাপত্রও ইদানীং
কালে আমাদের হাতে এসেছে, যার মধ্যে অবশ্যই উল্লেখ্য সরোজ মুখার্জি, বিনয় চৌধুরী, রণেন সেন প্রমুখের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত একাধিক রচনা। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাঙালির মন ও চিন্তাকে সাম্যবাদের ধারণা বৌদ্ধিক স্তরে কতটা ও কেমনভাবে প্রভাবিত করেছিল, তার কোনও তথ্যনিষ্ঠ অনুসন্ধান এতকাল হয়নি। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ্ অধ্যাপিকা শিপ্রা সরকার অনমিত্র দাশের সহযোগিতায় আলোচ্য সংকলনটি প্রকাশ করে এই চাহিদা অনেকটাই পূরণ করেছেন এবং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে পুস্তকটি বাংলায় সাম্যবাদী আন্দোলনের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি আকর গ্রন্থের মর্যাদা পাবে। অনেক পরিশ্রম করে, প্রচুর তথ্য ঘেঁটে তাঁরা ১৯১৭-৪৭—এই ঐতিহাসিক কালপর্বের যে চিত্রটি তুলে ধরেছেন, তা একই সঙ্গে প্রশংসনীয় এবং কৌতূহলোদ্দীপক। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, সন্তোষকুমারী গুপ্তা, বিনয় সরকার, ধূর্জটিপ্রসাদ, তারাশংকর, সুশোভন সরকার, দিলীপকুমার রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, নির্মলকুমার বসু, সজনীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বসু, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, রেবতী বর্মন, গোপাল হালদার, সরোজ আচার্য, হুমায়ুন কবির, সোমনাথ হোড়, মানবেন্দ্রনাথ রায়, সুভো ঠাকুর প্রমুখ বিচিত্র এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাবলম্বী লেখককুলের সাম্যবাদ বিষয়ে ভাবনা গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণ এবং এগুলি সংগৃহীত হয়েছে অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য পত্রপত্রিকা থেকে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নারায়ণ, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, প্রবর্ত্তক, ধূমকেতু, সাম্যবাদী, সংহতি, শ্রমিক, গণবাণী, অগ্রণী, পরিচয়, অরণি, জনযুদ্ধ, ভারতবর্ষ,শনিবারের চিঠি ও একাধিক অজানা পুস্তকপুস্তিকা থেকে। অধ্যাপিকা সরকারের সুলিখিত ভূমিকাটি এই মূল্যবান সংকলনটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। যথেষ্ট শ্রম ও নিষ্ঠার ফসল এই আকর গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েই কিছু মন্তব্য করার প্রয়োজন বোধ করছি। প্রথমত, সংকলনটির শিরোনাম নিয়ে কিছুটা সংশয় জাগে। 'সাম্যবাদচর্চা' শব্দটি ব্যবহার করলে পাঠকের মনে যে ধারণা জাগে, সংকলিত প্রবন্ধাবলির সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু তা মেলানো যায় না। যে কোনও বিষয় সম্পর্কে চর্চা কথাটা ব্যবহার করলে তার একটা নির্দিষ্ট ব্যঞ্জনা থাকে; এরকম একটা ভাবনাই সেখানে কাজ করে যে যাঁরা সেই বিষয়টির চর্চায় রত, সেটির বৌদ্ধিক অনুশীলনে তাঁরা প্রায় সমানভাবেই আগ্রহী এবং
সেটি মননের স্তরে পরিগ্রহ করে একটি নির্দিষ্ট মাত্রা; এক কথায় চর্চার সঙ্গে যুক্ত হয় একটি সুবিন্যস্ত ভাব। এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুচ্ছ কিন্তু আদৌ সেরকম কোনও দিঙ্‌নির্দেশ করে না। ভ্রমণবৃত্তান্ত, উপন্যাস, গুরুভার প্রবন্ধ, সাম্যবাদবিরোধী রচনা—এ সবই এখানে স্থান পেয়েছে সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন, রুশ বিপ্লব ইত্যাদি প্রসঙ্গ উল্লিখিত হওয়ার সুবাদে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এই বিচিত্র রচনাসংকলন থেকে যে চিত্রটি উঠে আসে, সেটিকে সাম্যবাদ বিষয়ে বাঙালি মনের একটি অবিন্যস্ত ভাবনা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, চর্চা সম্ভবত নয়। দ্বিতীয়ত, সংকলনটির কাঠামো ও পরিকল্পনা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। রচনাগুলিকে সাজানো হয়েছে কালানুক্রমে; কিন্তু যেহেতু এখানে পাঁচমিশেলি হরেকরকমের লেখাপত্র স্থান পেয়েছে সেই কারণে বোধ হয় ভাল হত যদি বিষয় অনুযায়ী লেখাগুলিকে বেছে তার পরে সেগুলিকে কালানুক্রমে সাজানো হত। আশ্চর্য হয়েছি এই ধরনের সংকলন গ্রন্থের শেষে কোনও নির্দেশিকা (Index) না থাকাতে। খুবই প্রয়োজন ছিল যে অসংখ্য পত্রপত্রিকাকে সূত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলিরও একটি পৃথক নির্দেশিকা রাখার। সম্পাদিকার ভূমিকাতে কিছু কিছু প্রবন্ধের উল্লেখ থাকলেও অনেক নাম, রচনা ও বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কোনও টীকার অভাবে পাঠককে সমস্যায় পড়তে হয়। সম্পাদিকা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইতিহাসবিদ্; তাঁর পক্ষে

চিরকালীন সাহিত্য
মহাভারত
কালীপ্রসন্ন সিংহ গদ্যানুদিত। ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীর মূল্যবান ভূমিকা সহ। ১ম ১৫০, ২য় ২০০
বাল্মীকি রামায়ণ ৮০
হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য গদ্যানুদিত।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৮০
পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ। অসংখ্য ছবিসহ।
—সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ গদ্যানুদিত—
ভারতের সাধক ও সাধিকা ৭০
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ১০০
শ্রীমদ্ভগবদগীতা ২০
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধক ও ধর্মগুরু ৫০
তুলি-কলম : ১, কলেজ রো, কলি ৯ ২৪১ ৭৯০৩
সাহিত্য তীর্থ : ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি ৭৩

অনুষ্টুপের সদ্য প্রকাশিত
ষাট সত্তরের ছাত্র আন্দোলন ৭৫
সম্পাদনা : অনিল আচার্য
পল রবসনের আত্মজীবনী—যে পথে দাঁড়িয়ে
অনুবাদ : দীপেন্দু চক্রবর্তী— ৪৫
প্রয়াত অলকা চট্টোপাধ্যায়ের
চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী ৭০
প্রকাশিত হলো শারদীয় অনুষ্টুপ ৩৩ বর্ষ ১ম সংখ্যা
প্রবন্ধ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দু চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, আমির হোসেন, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, শ্যামল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিত রায়, শাশ্বতী ঘোষ, অরবিন্দ সামন্ত ও অন্যান্য।
গল্প প্রদীপ রায়গুপ্ত, কিন্নর রায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, শাহযাদ ফিরদৌস, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, উদয় ভাদুড়ি, নাসরিন জাহান, সাধন চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর সেনগুপ্ত, অভিজিৎ সেন, ও বিশ্বজিৎ পাণ্ডা।
ক্রোড়পত্র ১ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি : সম্পাঃ পলাশবরণ পাল।
লিখেছেন : দীপঙ্কর লাহিড়ী, সৌরিন ভট্টাচার্য, সমর বাগচী, বিশ্বরূপ মুখোঃ, অমিয়কুমার বাগচি, রাধাকান্ত মণ্ডল, পলাশবরণ পাল।
ক্রোড়পত্র ২ পূর্বাশা ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য : সম্পাদনা সত্যপ্রিয় ঘোষ।
লিখেছেন : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অশোক মিত্র, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, অমিয়ভূষণ মজুমদার, অরবিন্দ পোদ্দার, শোভন সোম, কৃষ্ণ ধর, পবিত্র সরকার, চিত্ত ঘোষ, নলিনীকান্ত চক্রবর্তী ও অন্যান্য। গ্রন্থপঞ্জী ও জীবনপঞ্জী।
নির্বাচিত লেখা : সঞ্জয় ভট্টাচার্য।
তৎসহ বিশিষ্ট কবিদের কবিতা
বিপুল আয়তন এই সংখ্যাটি সীমিত সংখ্যায় ছাপা হবে। গ্রাহক ও এজেন্টরা অগ্রিম যোগাযোগ করুন। দাম : সত্তর টাকা।
অনুষ্টুপ
২-ই, নবীন কুণ্ডু লেন, কলি-৯

এই কাজটা করা সম্ভবত খুব কঠিন হত না। বিকল্প হিসেবে রচনাগুলিকে বিষয়বস্তু অনুযায়ী কালানুক্রমে সাজিয়ে সম্পাদিকা যদি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি টীকা সেগুলির গোড়ায় সংযোজন করতেন, তাহলে পাঠক খুবই লাভবান হতেন।
এবারে সংকলনটির অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলির প্রতি একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক। বিষয়বস্তুর বিচারে তিন ধরনের লেখা এখানে স্থান পেয়েছে,— সম্পাদকীয় ভূমিকার একেবারে গোড়াতেই সে কথা পাঠককে জানিয়ে দেওয়া হয়।
এক: মার্কসবাদের তাত্ত্বিক আলোচনা, যেখানে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পক্ষে ও বিপক্ষে সব ধরনের মতামতকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কয়েকটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যেগুলি লেখকের বৈদগ্ধ্য ও চিন্তার মৌলিকত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে গণ্য হবে। সাম্যবাদের পক্ষে তাত্ত্বিক স্তরে রচিত এই লেখাগুলি হল: 'কার্ল মার্কসের শিক্ষা' (কুতুবুদ্দিন আহমদ, লাঙ্গল, ১৯২৬), 'সোশ্যালিজমের মূল সূত্র' (সুশোভন সরকার, পরিচয়, ১৯৩২), 'ফ্যাসিজম বনাম কমিউনিজম' (সুকুমার মিত্র, দেশ, ১৯৩২), 'সাম্যবাদের মর্মকথা' (বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩৮), 'মার্কসীয় দর্শন' (রবি রায়, ১৯৩৯), 'ভারতবর্ষ ও কার্ল মার্কস' (হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৯৪০), 'ধনসাম্যবাদ' (শ্রীকৃষ্ণ দে, শনিবারের চিঠি, ১৯৪০-৪১), 'কেন সোশ্যালিজম চাই' (অমলা দেবী, ১৯৪১), 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম' (বুদ্ধদেব বসু, ১৯৪২), 'মার্কসীয় দর্শনের স্বদেশি সমালোচনা' (সরোজ আচার্য, ১৯৪৩), 'মার্কসবাদ ও মনুষ্যধর্ম' (ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পূর্বাশা, ১৯৪৭) ইত্যাদি। এই ধরনের প্রবন্ধের পাশাপাশি আরও বেশ কিছু লেখার হদিশ আমরা পাই, যা প্রায় সমগোত্রীয়, যদিও তেমন মৌলিক নয়; বরং অনেক প্রবন্ধের ওপরেই পরিস্থিতিগত কারণে সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে তৎকালীন সোভিয়েত ভাষ্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের ধারণাকে প্রায় এক ধরনের অর্থনৈতিক নিয়তিবাদে রূপান্তরিত করা হয়েছে অতি সরলীকৃত কোনও ভাষ্যকে আশ্রয় করে। এই প্রসঙ্গে তাই স্বাভাবিকভাবেই উল্লেখ করতে হয় তেমন বেশ কিছু প্রবন্ধের, যেখানে সাম্যবাদের ধারণাটি সমালোচিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। আবার আছে এমনও বেশ কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ যেখানে সাম্যবাদের তাত্ত্বিক ধারণাটি নয়, চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে সাম্যবাদ প্রসঙ্গে প্রচলিত তৎকালীন রুশ ভাষ্যটিও। এর মধ্যে উল্লেখ্য 'মহাত্মা গান্ধীর বর্ণাশ্রম এবং কমিউনিজম' (নির্মলকুমার বসু, দেশ, ১৯৩৫), 'মার্কসের ডায়ালেকটিক' (প্রমথ চৌধুরী, পরিচয়, ১৯৩৬), 'কাব্যের বিপ্লব এবং বিপ্লবের কাব্য' (আবু সয়ীদ আইয়ুব, ১৯৩৮), 'মার্কসীয় ডায়ালেকটিকস' (তারকিশোর বর্ধন, প্রবর্ত্তক, ১৯৩৯), 'এষণা' (সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ভারতবর্ষ, ১৯৪২) ইত্যাদি।
দুই : সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে রুশ বিপ্লব, লেনিন, সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণের বেশ কিছু অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ খণ্ডচিত্র এবং সমকালীন বাংলা গদ্যসাহিত্যে সাম্যবাদের ধারণার জোরালো প্রতিফলন ঘটেছে এ রকম কিছু রচনার অংশবিশেষ। সেই যুক্তিতে নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা' (১৯২৬-২৭), ধূর্জটিপ্রসাদের 'আবর্ত'(১৯৩৫), গোপাল হালদারের 'একদা' (১৯৩৯) উপন্যাসের কিছু অংশের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। সম্পাদকীয় ভূমিকায় বলা হয়েছে যে আধুনিক গবেষণারীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এ কাজটি করা হয়েছে, কারণ কথাসাহিত্য, লোকসাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, উপকথা—এ সবই আজ ইতিহাসচর্চার সূত্র হিসেবে স্বীকৃত। এখানে কিন্তু আবারও সেই প্রশ্নটি ঘুরেফিরে আসে : উপন্যাসের চরিত্রের মাধ্যমে সাম্যবাদের যে চিত্রায়ণ ঘটে, তাকে কি যথার্থ অর্থে সাম্যবাদচর্চা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে? ভবনা ও চর্চার মধ্যে যে ধারণাগত পার্থক্য রয়েছে, সেটি এ ক্ষেত্রেও বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নয়। এখানে আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। যদি উপন্যাসের অংশবিশেষ কিংবা নিছক ভ্রমণবৃত্তান্ত (দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্নদাশংকরের পথে প্রবাসে, ১৯২৬-২৯, নরেশচন্দ্র রায়, রাশিয়াতে দিনকয়েক, ১৯৪১) সাম্যবাদচর্চার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, সুকান্ত ভট্টাচার্যের অন্তত কিছু কবিতাকে কি এই সংকলনে প্রবেশাধিকার দেওয়া যেত না? এই ধরনের পাঁচমিশেলি লেখাপত্রকে বাদ দিয়ে বরং আরও কিছু মননশীল প্রবন্ধকে সংকলনটিতে স্থান দিলে পাঠকের বৌদ্ধিক চাহিদার খোরাক আরও ভালভাবে মিটিত বলে মনে হয়। যেমন, এই মুহূর্তেই মনে পড়ছে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, নীরেন রায়ের রচনার কথা, যাঁদের লেখনী একটা সময়ে সাম্যবাদচর্চার ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থেই নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। এঁদের একটি লেখাও না থাকায় অবশ্যই কিছুটা হতাশ হয়েছি।
তিন : সংকলনটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বেশ কিছু রচনা যা শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, নারী আন্দোলন সম্পর্কিত এবং রচয়িতারা প্রত্যেকেই নানা ভাবে বিভিন্ন আন্দোলনের শরিক হওয়ার সুবাদে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ। সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভবানী সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিনয় রায়, সোমনাথ

লাহিড়ি, সোমনাথ হোড়ের পাশাপাশি আমরা পরিচিত হলাম একাধিক নামী-অনামী মহিলার সাম্যবাদী ভাবনার সঙ্গে যা মূলত নারী আন্দোলনের সমস্যা সম্পর্কিত। সন্তোষকুমারী গুপ্তা, অমলা দেবী, প্রতিমা দাশগুপ্ত, রুবি সেন প্রমুখের নারী আন্দোলন সংক্রান্ত ভাবনা আধুনিক কালের মানবীবিদ্যা চর্চার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের চিন্তার খোরাক জোগাবে।
এই ধরনের আকরগ্রন্থ যেহেতু এক রকমের ঐতিহাসিক তথ্যের সংকলন, সেই কারণে মুদ্রণবিভ্রাট না হওয়াটা একান্ত বাঞ্ছনীয়। বলতে বাধ্য হচ্ছি যে বেশ কিছু গুরুতর মুদ্রণত্রুটি কিন্তু চোখ এড়াতে পারেনি। সূচিপত্র থেকে জানলাম যে সম্পাদকীয় ভূমিকার পৃষ্ঠাসীমা ১১-২৬, কিন্তু ভূমিকাটির কোথাও পৃষ্ঠার উল্লেখ না থাকায় বিভ্রান্ত হয়েছি। সূচিপত্রে 'বাড়তি মূল্য' প্রবন্ধের রচয়িতা হয়ে গেছেন গোপাল হালদার, হবেন নীহার সরকার। সোমনাথ লাহিড়ির অতি পরিচিত রচনা 'লাল ঝাণ্ডার ডাক' সূচিপত্রে উল্লিখিত হয়েছে সোমনাথ হোড়ের রচনা হিসেবে। ভূমিকাতে দত্ত-ব্রাডলি থিসিসের সময় বলা হয়েছে ১৯১৫, সেটি পড়তে হবে ১৯৩৬।
সংকলনের মূল অংশে নির্মলকুমার বসুর 'হিন্দু সোশালিজম' প্রবন্ধের সূত্রটি উল্লিখিত হয়নি (পৃঃ ১৯৩); মনে হয় 'দেশ' পত্রিকা থেকে এটি নেওয়া হয়েছে। এই ধরনের আরও কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে যেগুলো পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নিলে পাঠক উপকৃত হবেন।

ভালোবাসার পদ্য, ভালো-লাগার গদ্য

আলোচনা : অশ্রুকুমার সিকদার

যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল/ জয় গোস্বামী
আনন্দ পাবলিশার্স/ কল-৯/ ১০০.০০

রৌদ্রছায়ার সংকলন/ জয় গোস্বামী
আনন্দ পাবলিশার্স/ কল-৯/ ৫০.০০

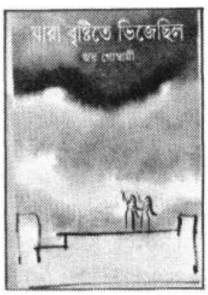

বাংলায় বোধহয় প্রথম কাব্যোপন্যাস লিখেছিলেন আনন্দ বাগচী। ইংরেজিতেও আমরা ইদানীং কিছু কাব্যোপন্যাস পড়েছি। যেমন অনেক সনেটে সাজিয়ে বিক্রম শেঠের লেখা 'দ্য গোলডেন গেট'। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে অ্যান্ কারসনের লেখা 'অটোবায়োগ্রাফি অব রেড' ('আ নভেল ইন ভার্স')। ভ্লাডিমির নবোকভের 'পেল্ ফায়ার' উপন্যাস যেন সম্পাদিত একটি কাব্য। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় অংশ একটি দীর্ঘ কাব্য, আর সেই সম্পাদিত কাব্যের ভূমিকা টীকা-টিপ্পনী উপন্যাসেরই অচ্ছেদ্য অঙ্গ। যেমন এইসব উপন্যাসকে, তেমনই জয় গোস্বামীর আদ্যন্ত কবিতায় লেখা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল'-কে পদ্যে উপন্যাস বলাই ভালো। গীতিকবিতাই চূড়ান্ত কবিতা; উপন্যাসের মতো দীর্ঘ রচনায় সেই শিখরে সমুচ্চ সাতটি অমরাবতী অক্ষুণ্ণ থাকে না। বহু আগে কাব্যতত্ত্ব বইতে হোরেস বলেছিলেন, 'এভরি সঙ/ইজ লায়াবল্ টু টিডিয়াস ইফ্ লঙ্'। উপন্যাসের কথা যদি ছেড়েও দিই, তাহলে জয়ের দীর্ঘ কবিতাগুলি—'কবে আমি বাহির হলেম', 'আত্মজীবনীর অংশ' ইত্যাদি—ছোট-ছোট গীতিকবিতার সমষ্টি আসলে। জয়ের এই পদ্য-উপাখ্যানেও সর্বত্র কবিতা নেই। ঘটনার সঙ্গে ঘটনাকে সংযুক্ত করবার তাগিদে, সংলাপের প্রয়োজনে কোনও কোনও অংশ কবিতার মাত্রা স্পর্শ করতে পারে না। সেইসব অংশকে গদ্যই বলা যেত যদি সেগুলি ছন্দে বিন্যস্ত না হত। কবিতার দুর্লভ বৈদ্যুতিক স্পর্শ কখনও কখনও মেলে, সর্বত্র মেলে না; মিলতে পারে না। তাই এই রচনাকে পদ্যে উপন্যাস বলা যেতে পারে। কিন্তু কী চমৎকার ছন্দের আর শব্দের বিন্যাস, আর মিলের অপ্রত্যাশিত অপ্রতিরোধ্যতা! ঝলমল করে ওঠে যেন সোনার মোহর। 'বাসন্তীর মা'-র সঙ্গে মিলে যায় 'ওয়াশিং নিরমা'। চলিত ভাষার মধ্যে পুরনো শব্দের আশ্চর্য ব্যবহার মুগ্ধ করে দেয়—'মুখ দেখা বাকি আছে, তেঁহ ধাক্কা হৃদ্‌পদ্মে লাগে'। শব্দ ছন্দ ভাষার জীবন্ত ধনুকের অব্যর্থতার পাঠক কেনা হয়ে যায়। আবার এই অতি দক্ষতা ভয়েরও, নেশা ধরায় বলে।
গল্পের আভাস আমরা জয় গোস্বামীর কবিতায়

অভিজাত প্রকাশনীর
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
কথার গুণে তরি কথার দোষে মরি- ৬৫
বেদুইন-এর ত্রয়ী- ৮০
দেখা হয় নাই ফিরে - ৪৫
মির্জা গালিব - ২৫
৬/১বি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলি-৬৯
২৪৩-০৫৭৯/২৪৮-৪৭১৮

সুদেষ্ণা চক্রবর্তীর বই
গল্প : কাল মণিদির বাড়ি পার্টিতে
শ্মশান বন্ধু ওরা ফিরে এলো
উপন্যাস : ভাগিরথীর ঢেউ
প্রবন্ধ : সাহিত্য ঘরে ও বাহিরে
প্রাপ্তিস্থান :
চক্রবর্তী চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং লিমিটেড
15, কলেজ স্কোয়ার, কলি-৭০০০৭৩

সুবোধ চক্রবর্তী-র
ট্যুরিস্ট গাইড
১৫০
ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, সিকিম, ভুটান
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভ্রমণ-পিপাসুদের চাহিদা মেটাতে প্রকাশিত হল ভূ-পর্যটক সুবোধ চক্রবর্তীর সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের বই 'ট্যুরিস্ট গাইড'। পাহাড়-পর্বত, সবুজ বনানী, সমুদ্র, মরুভূমি, ইতিহাস, স্থাপত্য-ভাস্কর্য শৈলীমণ্ডিত মসজিদ, মন্দির, গীর্জার বিবরণ ও পর্যটন মানচিত্র, রঙীন আলোকচিত্র ৩২ পৃ: আর হোটেল, হলিডেহোম, পর্যটন দপ্তর, সরকারী, বেসরকারী কন্ডাক্টেড ও প্যাকেজ ট্যুর সংস্থা, যাতায়াতের উপায়, রেল, বাস, বিমান দপ্তরের ঠিকানা, কোন নম্বর জানতে বইটি হিতকরী বন্ধু হিসাবে কাজ করবে। পূজা পর্যন্ত বইটি ২০% ছাড় পাবেন।
অসাধারণ বহুবর্ণ প্রচ্ছদ পার্থপ্রতিম বিশ্বাস
কামিনী প্রকাশালয় ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন
কলি-৯, ফোন : ২৪১-৩৩৩২

প্রকাশিত হয়েছে
ক্ষেত্র গুপ্ত
তারাশঙ্কর : অনুসন্ধান ৯৮
বিশিষ্ট সমালোচকের নিজস্ব রীতিতে তারাশঙ্করের সৃজনকর্মের উপর আকর্ষণীয় আলোকপাত। ৬০ টাকা
জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিতার দর্পণ : মোহিতলাল
মোহিতলাল মজুমদারের কবিতা আপাত দুর্বোধ্য মনে হলেও, আগ্রহী কবিতাপ্রেমীর কাছে কাব্যরস খুব সহজ ভাবেই ধরা পড়ে। বিশিষ্ট অধ্যাপক বইটি লিখেছেন ছাত্র-গবেষকদের কথা মনে রেখে। ৪৫ টাকা
সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত
ঝুমুর : আলোচনা ও সংগ্রহ
ঝুমুরের সামাজিক প্রেক্ষাপট, সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য, রচনার বৈচিত্র্য ইত্যাদি নানাদিক নিয়ে সুযোগ্য অধিকারীদের আলোচনায় এরকম গ্রন্থ এর আগে কখনও বেরোয়নি। ৬০ টাকা
পুস্তক বিপণি। ২৭ বেনিয়াটোলা লেন।
কলকাতা-৯। দূরভাষ ২৪১-৬৯৮৯

পাচ্ছিলামই—'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়', 'যে ছাত্রীটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে', এমন সব কবিতায়। 'কবিত্ব ফুড়ুৎ করবে, পিছ্ পিছ্ ছুটবো না হাঁ করে/ বাড়ি ফিরে লিখে ফেলবো বড় গল্প উপন্যাসোপম .....'। বাস্তবিক তেমন উপন্যাসোপম বড়গল্প লিখছেনও জয়। এবারে লিখলেন পদ্যে উপন্যাস। 'লেখাটি বেরিয়ে পড়ে গল্পের সন্ধানে। কাহিনী কোন্ দিকে যায় চরিত্র কি জানে?' এক কবিচরিত্র এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, যেমন কবিদের উপন্যাসে সচরাচর হয়। এই চরিত্র, তার দিদি আর পিসিমাকে নিয়ে একটি গল্প। আর একটি গল্প এক অসুখী নারীর, যার বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। তৃতীয় গল্প সম্পাদিকা কবি আর তার পাঠিকা এবং পাঠিকার অধ্যাপকের গল্প। এই তিন তরফ নিয়ে গল্প কোথায় যায় গল্পকার ও নায়ক চরিত্রটি নিজেও জানে না। প্রশ্ন উঠতে পারে, পদ্যে লেখা এই বাঁধুনি-বর্জিত রচনাকে উপন্যাস বলা যাবে কিনা। উত্তর হল, সবকিছুতেই যেমন খেলনা হয়, তেমনই সব রকমই উপন্যাস হতে পারে। উপন্যাস খুব স্থিতিস্থাপক। এই উপন্যাসের শেষটা আবার অলিখিত। যে-নারীর বিয়ে ভেঙে গেল, আর প্রথম যৌবনে তাকে দূর থেকে দেখত যে কবি বা 'সাইকেল-যুবক' ('অচেনা সেই ছেলে/অবাক চোখ এক হাত সাইকেলে'), তারা দূরে ছিটকে গিয়েছিল; এখন আবার কাছাকাছি আসবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তাদের।

'একজন কামশীতল।
অন্যজন পুরুষত্বহারা।
এদের মাঝখানে প্রেম
এসে দাঁড়াচ্ছেন সালংকারা ....'

প্রেম এসে মাঝখানে দাঁড়ানোর পরিণতি কী হবে সেই শেষ অধ্যায় লিখে নেবার দায়িত্ব জয় পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

চরিত্রটি ইস্কুল-শিক্ষক, উপরন্তু কবি। 'দিদি সাত বছরের বড়। তার হিস্ট্রি আছে।' ছাত্রীর আঙুল নিয়ে খেলা করত তরুণ শিক্ষক। 'শেষে খেলা সাঙ্গ হলো।' বিয়ে করবে না দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ দিদি অকাল-প্রয়াত বাবার জায়গায় চাকরি পায়। ডেলি-প্যাসেনজার দিদির দপ্তরের সেকশনে নতুন লোক যোগ দিলে জামার বোতাম উঁচুনিচুর দরুন মহিলাদের কাছে আহম্মক বলে চিহ্নিত হয়। মাঝবয়সী এই পুরুষের ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টাকে উপভোগ করে দিদি। একদিন বৃষ্টিভেজা পার্কে দাঁড়িয়ে এই 'আক্ষরিকভাবে চিরকুমার' মানুষ জানায় তার অনুরাগের কথা, জানায় আজই চাকরি ছেড়েছে হার্টের অসুখের কারণে। বৃষ্টির মহোৎসবে দাঁড়িয়ে দিদি স্তব্ধ হয়ে যায়। বাড়ি ফিরে ভেজা কাপড় না ছেড়ে সম্বোধনহীন চিঠি লিখতে বসে। মাঝে-মাঝে ছুঁচসুতো বোতাম নিয়ে কিরণ রায়ের বাড়ি যাবে, ঠিকমতো বোতাম লাগানো যায় কিনা দেখবে। এই দেখার পরিণতি জখম দুই নরনারীর জীবনে কী হবে কে জানে! বলা-গল্প এখানেও না-বলা গল্পের দিকে ইঙ্গিত করে।

বাবা মারা যেতে আজকের বিয়ে ভাঙা বউটি মা-বোনকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল কাকার বাড়ি। মায়ের সঙ্গে বড় মেয়ের দুর্ভাবনায় রাত কাটে—'চাঁদ ডোবে মা-মেয়েকে জাগরিত রেখে'। টাইপ শেখে, টিউশনি করে মেয়ে। কাকা-কাকিমার প্ররোচনায় মেয়েটির প্রশ্রয় চায় পাড়ার উঠতি প্রমোটার। তার হাত থেকে রেহাই যদিও মেলে, বিয়ের হাত থেকে অনাথার অব্যাহতি মেলে না। অলীক হয়ে যায় আরও পড়াশুনোর, চাকরির, স্বাবলম্বনের স্বপ্ন। এখন 'ভোর থেকে রাত, রাত থেকে ভোর' শুধু ব্যবহৃত হতে হয়। এক দিকে শাশুড়ি, অন্যদিকে স্বামী,

"ঘাড় ধরে তোমার কাছ থেকে ভালোবাসা
নেওয়া হবে ......
এর পর নাক টিপে হাঁ-করিয়ে
তোমাকেও দেওয়া হবে
জিভ-খসা চুম্বন ...."

দেহে-মনে নির্যাতিতার মনে পড়ে কলেজজীবনের কথা, বাবার আঙুল ধরে বর্ণপরিচয়ের কথা। অক্ষম স্বামী, তাই সন্তানও নেই। স্বামী অক্ষম, কিন্তু ব্যভিচারী। এক ঝলক বাতাসের মতো মুক্তি নিয়ে ফিরে আসে ইস্কুল বন্ধু রীণা। সে পালিয়ে বিয়ে করেছিল, দুর্ঘটনায় প্রেমিক স্বামীর মৃত্যুতে আজও হাসিখুশি, আজও অদম্য। যদিও 'এই বৃষ্টি হওয়া রাতগুলোয়/কষ্ট হয় খুব—' গায়ে হাত তোলার জন্যে স্বামী শুকনো স্যরি বলে, আর বলে সকাল-সকাল ডেকে দিতে। 'নিজে রক্ষিতাকে নিয়ে প্রমোদে বেরোবে/আর বউকে ভোর ভোর ডেকে দিতে হবে।' সব বিয়েই এমন—খাটে ওঠা, নেমে আসা, ভাত-ডাল-রুটি? 'নিকেল, অচল পয়সা ঝনঝন করবে ঘরে', নতুন বিয়ের পরে এক সময় যাকে ভাবত সোনা। অসহ্য জীবন থেকে স্যুটকেস হাতে বেরিয়ে পড়ে আমাদের বউটি। এই মেয়ে যখন কুলত্যাগ করল তখন, "সবুজ হলুদ সর পড়া একটা পুকুর থেকে লক্ষ্মী উঠে/ ঝাঁপিটা হাতে দিয়ে বললেন, 'সাবধানে যাস!' "
—এমন অলৌকিক ঘটল কিনা হলা হয়নি। বৃষ্টিভেজা অবস্থায় সে রীণার অপেক্ষায় থাকে স্টেশনে। রীণা আসে, দেখা হয়ে যায় তখনই উপন্যাসের 'চরিত্র', সাইকেল-যুবকের সঙ্গে। রীণার বাড়িতে থাকবে এই বিয়ে ভাঙা বধূ; বিকেলে যখন ছাদ থেকে কাপড় তুলবে তখনই হয়তো দেখা হবে ইস্কুল ফেরত কবি-মাস্টারের সঙ্গে বারেবারে। সংকোচ ভাঙবে, হয়তো প্রেম এসে দাঁড়াবে মাঝখানে। আমরা জানি না, এই প্রাক্তন বিবাহিতা নারী এক-একবার ভাববে কিনা, 'কে ডেকে দেয় সকাল সকাল? ..../কার গায়ে হাত তোলে এখন?'

সমস্ত উপন্যাসে যারা মন্দ তারা নিঃশব্দে হঠাৎ কখন মূল গল্পের আড়ালে চলে যায়। কোথাও কোনও শ্লেষ নেই, নেই তীব্র ঘৃণা বা অভিযোগ; গল্প এগিয়ে চলে নদীর স্রোতের মতো। পাড়ে জমা হতে থাকে জীবনের ক্লেদ, শুধু ভালোবাসার মূল ধারা বয়ে যায় শেষ অবধি। খেয়ে হাত ধুয়ে ভাইবোন বারান্দায় মাদুর বিছায়, একেবারে গোড়াতেই ফুটে ওঠে করুণ-মধুর এই ছবি। সর্বব্যাপী ভালোবাসার আভাস মেলে, যে ভালোবাসা ছুঁয়ে থাকে মানুষের ছোটবেলাকে, তার বেড়ে-ওঠাকে, গৃহস্থালিকে, গাছপালাকে, সব কিছুকে। সেই ভালোবাসা থেকেই জন্ম নেয় কবি। কিন্তু কবিনামের সাফল্য, প্রচার আর হাততালি গ্রাস করতে চায় তার নিভৃত সত্তাকে। কবির মধ্যে জন্ম নেয় এক হাহাকার। চালাঘর, দাওয়া আর বাঁশের বেড়ার চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় কবির প্রেত। 'আমারও কবিত্বে তুমি চন্দন পরিয়ে দিয়ে গেছো কতকাল/এখন চন্দন নেই, কবিত্বের কাচ ঘিরে ধুলো আর মাকড়সার জাল।' এক সর্বব্যাপী ভালোবাসা আর এক গূঢ় বেদনাবোধ জয় গোস্বামীর সব কবিতার মতো এই উপন্যাসেও জড়ানো। উপন্যাসটি যত্ন করে ছাপা বলে, আর এটি এক কবির কথা বলে ভুল বানান বিশেষত, 'বাল্মীকি' বানান ভুল আহত করে।

জয় গোস্বামীর 'রৌদ্রছায়ার সংকলন' বইটিতে কবিতা বিষয়ে পাঁচটি রচনা আছে। এগুলি প্রচলিত অর্থে সমালোচনা নয়। জয়ের কবিতা যদি ভালোবাসার কবিতা, তাহলে জয়ের এইসব রচনা কবিতা ভালো-লাগার কথা। এখানে আছে অনুভূতিদেশ থেকে আলো ফেলে কবিতা বুঝবার চেষ্টা। খানিকটা যেন ডায়েরি, খানিকটা স্বগতোক্তি।

জয় দেখান নিজের অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি এক রহস্যময় মুহূর্তে অন্য কবির কবিতার মর্মোদ্ধার করিয়ে দিতে পারে। 'মুখ ঢাকার/মুখ তোলার/শঙ্খ ঘোষ' যখন লেখেন 'লেখো আয়ু, লেখো আয়ু' তখন বুঝতে হয় সমস্ত জীবন দিয়ে, অস্তিত্ব দিয়ে লেখার নির্দেশ নিজেকেই এই বাক্যে। অনেক পরে অভিজ্ঞতায় বোঝা যায় নারীর 'নিবিড় কালো চুলের ভিতরে/ কবেকার সমুদ্রের নুন' জীবনানন্দের এই কথার

তাৎপর্য। আবার জানি অনেক কবিতা স্তব্ধ। এক সময়ে সহসা আলো জ্বলে উঠতেও পারে, তারই অপেক্ষায় থাকে। জীবনানন্দের অনেক কবিতার শব্দ যেন অর্থের তোয়াক্কা করে না, 'স্বাধীন সব মণিমুক্ত'।

কেন কবিতা পড়া? তরুণ কবি প্রতিষ্ঠিত কবিদের কবিতা পড়েন শিখবার জন্য। এমন পাঠক থাকতেও পারেন হয়তো যিনি কবিতা পড়েন সুনীল বা শঙ্খ 'কতোটা এগোল' দেখবার জন্যে! আসলে কবিতার মধ্য দিয়ে কবি পাঠ করেন সহযাত্রী মানুষকে, পাঠক জানেন ব্যাপ্ত জীবনকে। কেন কবিতা পড়া? — এই প্রশ্নের উত্তরে জয় গোস্বামী এই জরুরি কথাটা নানাভাবে বলেন। তিনি দেখান, শঙ্খ ঘোষের কবিতায় ক্ষমতাদর্পের অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিরলংকার হিংস্র প্রতিবাদের বিস্ফোরণ কীভাবে কবিতায় স্থায়ী মূর্তি পায়। যিনি ভুখ-মিছিলে পুলিশের গুলিতে কিশোরীর মৃত্যু নিয়ে একদা লিখেছিলেন 'যমুনাবতী', তিনি আজ লেখেন, 'তিন রাউন্ড গুলি খেলে তেইশ জন মরে লোকে এত বজ্জাত হয়েছে,' 'চরিত্রই নেই যার তার আবার ধর্ষণ কোথায়?' বাবরি মসজিদ ধ্বংস বিষয়ে 'হাওয়ায় হাওয়াই ঝাঁকি অক্ষরে অক্ষরে জাগুয়ার', বিয়ের পণের দুশ্চিন্তা থেকে বাবাকে মুক্তি দিতে তিন বোন যখন আত্মহত্যা করে তখন 'হাতে তুলে দিই তাই তিন মুণ্ড যৌতুকের মতো'। ক্ষমতার দাম্ভিকতা বোঝাতে শঙ্খ ব্যবহার করেন 'গান্ধারীর আবেদন'-এর অপ্রতিরোধ্য চরণ— 'আপামর জনে আমি কহাইব আজ/আমিই গম্বুজ চূড়া আমি দেশ আমিই সমাজ।' শঙ্খ ঘোষের কবিতায় আমি-তুমির বদলটা চমৎকার লক্ষ করেন জয়। তিনি দেখান, 'সর্বস্বজোড়া আত্মোদ্ঘাটন' শুধু শঙ্খর কবিতার নয়, প্রবন্ধেরও কথা।

আরাধনাশীল সব কবি চরণে-চরণে জীবনকে ধারণ করেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাই তাঁর কবিতায় নানান চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হন— মফস্বলের ক্লাস এইটে পড়া রাধারমণ, ফটিক, এক নবাব খাঞ্জা খাঁ-র খামখেয়ালের ছেলে, যে-মানুষ মাছহীন ভাতের থালার সামনে বসে থাকে, যার নুলো পিসতুতো ভাই ট্রেনে ধূপকাঠি বিক্রি করে। নিঃসঙ্গ কুষ্ঠরোগী, পথভ্রান্ত জন্মান্ধ, বাতিল বেশ্যাদের হয়ে কবির যুদ্ধ যেন শয়তানের সঙ্গে। পোখরানে এই শয়তানের কারসাজিতে আগুন নিবে যাবার পর নামে ছাইরঙের অন্ধকার, 'যেখানে নদী ছিল সেখানে নদী নেই।'

'তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি শিশু
সমস্ত ঘৃণা ও অবিশ্বাসের গরল মন্থন করে
সে ঠিক উঠে এসেছে আবার...
শুধু তারই জন্যই আবার জাগতে হবে
সূর্যকে।'

এই ভালোবাসার, আস্থার, আস্তিক্যের কথা সুনীলের কবিতা থেকে জয় তুলে আনেন। কবিতায় জীবনকে ধারণের কথা জয় গোস্বামী আমার প্রিয় কবি অলোকরঞ্জন, শরৎকুমার, ভাস্কর চক্রবর্তী, রণজিৎ দাশ এবং গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে দেখিয়ে আমার কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন।

এঁদের কবিতায় দুঃখ-অন্ধকার থাকে, ক্ষমতার দম্ভ রক্তচক্ষু হয়, পারমাণবিক বিস্ফোরণ হয়— কিন্তু সব কিছুর মধ্যে ঝলমল করছে বেঁচে থাকা।

এই বেঁচে থাকার, অস্তিত্বের সারাৎসার কবিতায় পাই আমরা। তাই কবিতা পড়ি। জীবন শুধু ভোগ নয়, প্রতিষ্ঠা নয়, সঞ্চয় নয়; জীবন পবিত্র। সেই বোধ যার থাকে তাকে কবিতা পড়তে হয়। আবার কবিতা পড়ে সেই বোধ জন্মায় বলেও কবিতা পড়তে হয়। জয় গোস্বামীর কবিতা-পড়া আমাদের সেই বোধের দিকে নিয়ে যায়।

"সেরা মডেল, দুর্দান্ত ফটোগ্রাফার, দারুণ ফিল্মপ্রডিউসার, পাঁচতারা হোটেলের ডিনার, তারপরই পেটের গণ্ডগোল। ভাগ্যিস্! পুদীনহরা আছে।"

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্য, এ্যাডভার্টাইজিং এক্‌জিকিউটিভ। পুদীনহরা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে আমরা রোজই অনুরূপ প্রতিক্রিয়া জানতে পারছি।

বিজ্ঞাপনের জগত সত্যিই অদ্ভুত জগত। 72 ঘণ্টা ঘুম নেই। সকাল, দুপুর, রাতের খাওয়া সবই অসময়ে। শরীর কি আর সইতে পারে? ফলে প্রথম হামলা হয় আপনার পেটের ওপর।
তাই এই হামলার মোকাবিলা করতে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্য ভরসা করেন একমাত্র পুদীনহরা-তে।

পুদীনহরা ঃ প্রকৃতির চিরসবুজ বরদান।
পুদীনহরাতে আছে মিণ্ট (পুদীনা) তেলের সংমিশ্রণ যা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত এবং অত্যন্ত কার্যকর! এটি পাচনতন্ত্রে স্থানীয়ভাবে কাজ করে ও ব্যথা কমিয়ে আরাম দেয়। তাছাড়া পুদীনহরায় আছে চমৎকার *এ্যান্টিস্প্যাসমোডিক (যন্ত্রণা উপশমকারী), কারমিনেটিভ (গ্যাস নিবারণকারী)* এবং *হজমশক্তির গুণ।*

পুদীনহরা ঃ কার্যকরী অথচ কোনো সাইড এফেক্ট নেই।
সারা বিশ্বে এখন রাসায়নিক পদার্থের সাইড এফেক্ট নিয়ে গভীর উদ্বেগ বেড়ে চলেছে। সত্যি বলতে কি এর মধ্যে কিছু কিছু ওষুধ সম্প্রতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পুদীনহরা হ'ল এমন এক প্রাকৃতিক উপচার যার কোনো সাইড এফেক্ট নেই।

একবার পুদীনহরা ব্যবহার করুন।
আপনি সর্বদা এতেই ভরসা করবেন।

যেমন করেছেন বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্য এবং আরও লক্ষ লক্ষ পুদীনহরা ব্যবহারকারীগণ।

Pudin® Hara লিক্যুইড এবং পার্লস্

সঠিক এফেক্ট,
নেই সাইড এফেক্ট.

Dabur

For more information on Pudin Hara, write in with your name, sex, date of birth, education, profession, address and phone no. to: Dabur Pudin Hara (DSH), P.O. Box 7326, New Delhi 110 065.

HTA.5722.98.BEN

স্বপ্ন অনেক সময় স্বপ্নই থেকে যায়।
কাজের বাজার

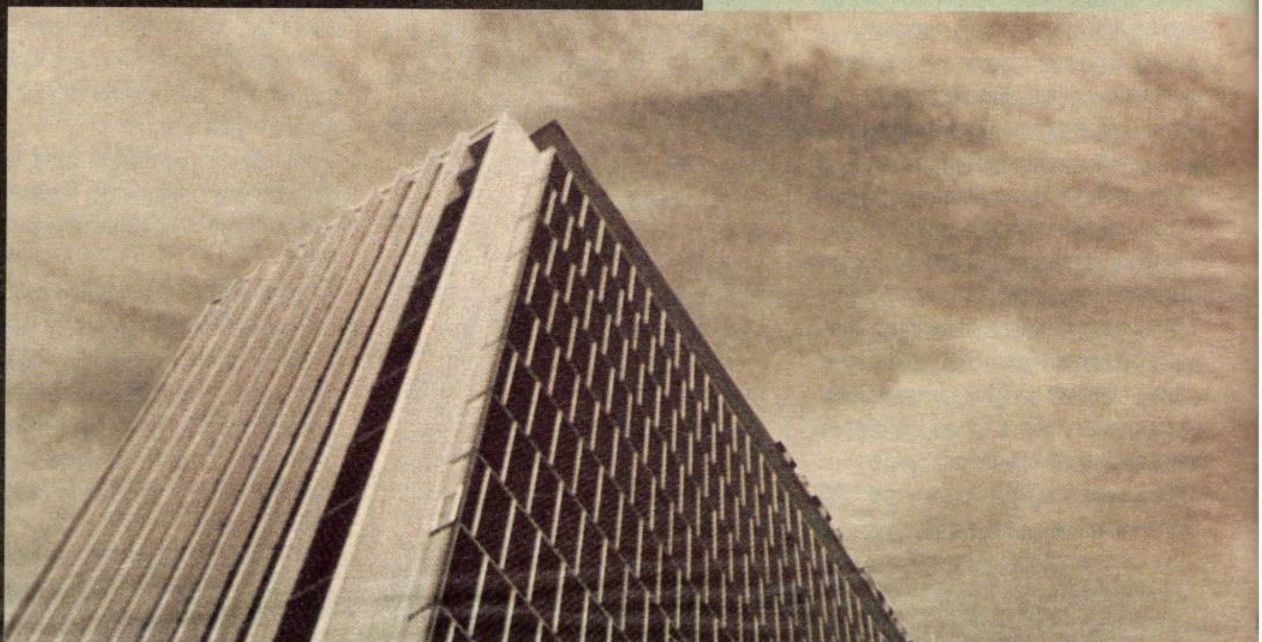

CONTRACT ABP93.98

না-পড়া এর একটা বড় কারণ হতে পারে।

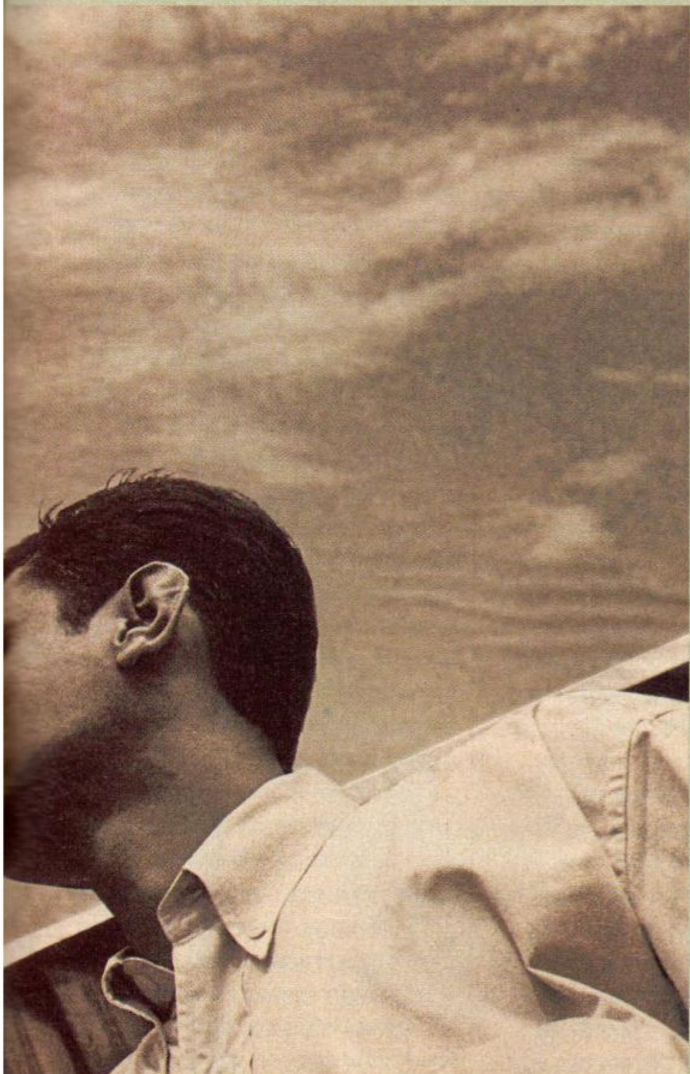

প্রতিমুহূর্তেই বদলে যাচ্ছে পৃথিবী। খুলছে নতুন নতুন কেরিয়ারের পথ। পালটাচ্ছে যোগ্যতার সংজ্ঞা। সচেতন, উচ্চাকাঙ্খী বাঙালি তরুণ-তরুণী বদলানো এই পৃথিবীতে নিজেদের জায়গা করে নেওয়ার স্বপ্ন দেখে। সেই স্বপ্নকে বাস্তব করার এ লড়াই শুধু তাদের একার নয়, আনন্দবাজার মনে করে। লড়াই আমাদের সবার।

ভবিষ্যতকে গড়ে তোলা — আনন্দবাজার জানে, এ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার নয়। তাই 'চিচিং ফাঁক' বিভাগে প্রায় প্রতি শনিবার যুবক-যুবতীদের বিভিন্ন কেরিয়ারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। 'কাজের বাজার' পাতায় নিয়মিত বক্তব্য রাখেন বাণিজ্য বা শিক্ষা জগতের কৃতী ব্যক্তিরা। অল্পবয়সী এগজিকিউটিভদের জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয় ই-ফ্যাক্টর ওয়ার্কশপে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত কেরিয়ার বেছে নেওয়ার সাহায্যে আনন্দবাজার নিয়ে আসে বিশেষ মেধার পরীক্ষা। সব দিক দিয়েই আজকের প্রজন্মকে চৌখস বানানোর চেষ্টা।

তারই সঙ্গে 'কাজের বাজার'-এর মুখ্য আকর্ষণ তো আছেই। প্রতি সোমবার পাতা জোড়া নামীদামী সংস্থাদের কর্মখালির বিজ্ঞাপন। বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানিগুলি ইংরেজি কাগজের সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রায়শই নেন।

মজার ব্যাপার, তবু অনেকেই বলে থাকেন, আজকাল চাকরির বাজারে মন্দা। হবেও বা। সবাই যে আনন্দবাজারই পড়ছেন, এমন তো নয়।

আনন্দবাজার পত্রিকা

পড়তে হয়। নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়।

এখন ২ টাকায়। সোম থেকে শুক্র।

উনিশ শতকের দুটি মুখ্য বিদ্রোহ : দুটি সমীক্ষা

আলোচনা : বারিদবরণ ঘোষ

সিপাহি বিদ্রোহ ও গণবিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
শশিভূষণ চৌধুরী
প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স/কল-৯/১০০.০০

সাঁওতাল গণযুদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য
রণজিৎকুমার সমাদ্দার
চ্যাটার্জী পাবলিশার্স/কল-৭৩/৩০.০০

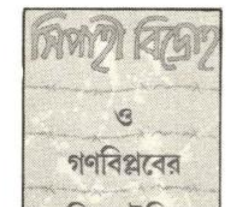

ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের স্বল্পজ্ঞানী পাঠকেরাও অন্তত দুটি তারিখের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত। প্রথমটি ১৭৫৭—যে বছরে পলাশির যুদ্ধে বাঙালির খুনে 'ক্লাইভের খঞ্জর' লাল হয়ে গেছিল এবং দ্বিতীয়টি ঠিক এর একশো বছর পরে ১৮৫৭—যে বছরে সিপাহি বিদ্রোহের সূচনা ঘটে ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছিল। আলোচ্য প্রথম বইটি লেখকের Civil Disturbances গ্রন্থের অসম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ—অবশ্যই লাইন থেকে লাইনের অনুবাদ নয়। উল্লেখ করার বিষয় অধ্যাপক শশিভূষণ ইংরেজিতে লিখতে, ভাবতে এবং বলতেই অভ্যস্ত-ছিলেন। এটি তাঁর একমাত্র বাংলা বই। সিপাহিবিদ্রোহের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দুটি দল প্রত্যক্ষ করা গেছে। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে— এই বিদ্রোহ বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত ছিল, সর্বভারতীয় ছিল না এবং সাধারণ মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। শশিভূষণ চৌধুরী রমেশচন্দ্র মজুমদারের ছাত্র হলেও গুরুর মতকে স্বীকার করে নিতে পারেননি সর্বাংশে।

তিনি মনে করেন এই যুদ্ধ আসলে কোম্পানির অত্যাচার ও ভূমিব্যবস্থার ফলে প্রজাদের মনের বিক্ষোভের বিস্ফোরণ। এই যুদ্ধ ছিল প্রজাদের পূর্বতন সুবিধা আদায়ের মরিয়া প্রচেষ্টা, বিদেশি শাসকদের সঙ্গে এই সংগ্রাম জীবনমরণের সংগ্রাম। ভূস্বামীদের ভূমিকাকে তিনি 'Unconcious tools of a nascent nationalism' নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে এই যুদ্ধকে সামরিক ও বেসামরিক—এই ভাবে ভাগ করে দেখতে গেলে এই যুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে তোলা যাবে না। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যুদ্ধের কারণ হিসেবে ধর্মীয় অভিযোগ শুধুমাত্র সিপাহিদেরই ছিল না, সাধারণ মানুষ ও সামন্তদেরও সমান অভিযোগ ছিল। Theories of Indian Mutiny গ্রন্থে শশিবাবু রমেশচন্দ্রের মতের সমালোচনা করে শেষ পর্যন্ত বলেছেন, যে এই সিপাহি বিদ্রোহ ভারতে 'সর্বপ্রথম বৃহত্তর পরিসরে একটি যুদ্ধ যার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি শাসন ও শোষণ হতে মুক্ত হওয়া। ভারতের ইতিহাসে ইতিপূর্বে অমন কোনও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ লক্ষ করা যায়নি, যেখানে বিদেশি শোষণের বলয় হতে মুক্তিলাভের জন্য প্রায় সমস্ত শ্রেণী যোগদান করেছিল' (পৃঃ ১৭৩-৭৪)।'

বক্ষ্যমান বইটি ছ'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে এই বিদ্রোহের ঐতিহাসিক পটভূমি বিচার করেছেন। অন্যায় ভাবে মাইনে কমিয়ে দিয়ে, ধর্মীয় সংস্কারের উপর হস্তক্ষেপ করে সিপাহিদের বিক্ষুব্ধ করে ইংরেজ এই যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছিল। এর সঙ্গে জমির মালিকানা হস্তান্তর, ভূমিব্যবস্থায় গলদ, অযোধ্যা রাজ্যের অধিকার গ্রহণ—অভিজাত, সামরিক শ্রেণী, মুসলমান সমাজ, কৃষক শ্রেণী সকলকেই বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। প্রতিটি দিন কিভাবে এই বিদ্রোহ স্থান থেকে স্থানান্তরে ছড়িয়ে পড়ছিল তার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক সিপাহিদের অন্যায় ভূমিকার কথাও বলতে ভোলেননি—'বিদ্রোহীদের বিভিন্ন দল অযোধ্যার রাজার নাম করে লুণ্ঠন ও কর আদায় শুরু করেছিল।' পরবর্তী চারটি পরিচ্ছেদে লেখক যথাক্রমে উত্তর ভারত, মধ্য ও পশ্চিম ভারত, পূর্ব ভারত এবং শাহাবাদ অঞ্চলে বিদ্রোহের যথাচিত্র অঙ্কন করেছেন। সেজন্যই মিরাটে 'সেনাবাহিনীর অস্ত্রাগার সমূহের একটিতেও চর্বি মাখানো কার্তুজ ছিল না'—এমন সত্য উচ্চারণে অকুণ্ঠ হয়েছিলেন। অথচ এখানেই ইংরেজ নিধনযজ্ঞে সবচেয়ে বেশি সংঘটিত হয়েছিল। সাধারণ মানুষ যে এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল তার বহুতর প্রমাণ লেখক এই বইয়ে উদ্ধার করেছেন। যেমন কোয়েল-এর মুসলমান জনসাধারণ সবুজ পতাকা নিয়ে সদলে ইসলামের গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে য়ুরোপীয়দের হত্যার সংকল্প নেয়। অথবা সম্বলপুরে বিদ্রোহের জনসমর্থন সরকারি চিঠিপত্র থেকেই পাওয়া যায়। বান্দা অঞ্চলে সেনা বিদ্রোহের আগেই জনসাধারণের বিশাল উত্থান ঘটে গিয়েছিল। অন্য দিকে পঞ্জাবি এবং হিন্দুস্তানিদের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ এবং শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষ থাকার ফলে। এই কারণের জন্যে এবং স্যার জন লরেন্সের চেষ্টায় পঞ্জাব এই বিদ্রোহের আওতার বাইরে থাকে। শিখ সৈন্যদের সহযোগিতার ফলেই দিল্লির পুনরধিকার ব্রিটিশের পক্ষে সম্ভব হয় (১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭)। তবে লেখক পূর্বভারতের প্রসঙ্গে সিপাহি বিদ্রোহের সময় কলকাতার অবস্থা সম্পর্কে তেমন কোনও আলোকপাত করেননি। অথচ করার মতো উপকরণের অভাব ছিল না। যে অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা তিনি বলেছেন তার চেহারা কলকাতাতেও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়া প্রসঙ্গে ২ এবং ২০ জুন ১৮৫৭ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন—'বাজারের নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দাম বাড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে জনসাধারণের কষ্ট বাড়িতেছে। বহির্বাণিজ্য ইহার কারণ। .... প্রার্থনা গবর্নর বাহাদুর রাজ্যের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, দুর্ভিক্ষ নিবারণে যত্নশীল হউন, তণ্ডুলাদি অগ্নিমূল্য হওয়াতে প্রজারা আর রক্ষা পায় না, রপ্তানি বন্ধ না করিলে দেশ বাঁচে না।'

এই বইয়ের শেষ পরিচ্ছেদটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানেই সিপাহি বিদ্রোহের চরিত্র নিরূপণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতের বিচার-বিশ্লেষণ আছে। তা বিচার করে লেখক কতকগুলি মতকে নিজের সিদ্ধান্তের অনুকূল হিসেবে তুলে ধরেছেন। যেমন 'এই প্রথম হিন্দু ও মুসলমানদের তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধে এই উদ্দেশ্যে শামিল হতে দিয়েছে।' 'এই সময় হিন্দুরা গঙ্গার নামে এবং মুসলমানগণ কোরান শপথ করে বলে "চলো ভাই" চিৎকার করে আলমবাগে ইংরেজদের নির্মূল করতে দ্রুত ছুটে এসেছিল।' মেকলে সঠিকই বলেছিলেন, বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত হিংসাত্মক কার্যকলাপ ইংরেজের অপশাসন থেকেই জাত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত লেখক বলেছেন '১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ নিছক ব্রিটিশ বিরোধী বস্তু ছিল না, কিন্তু ছিল স্বাধীনতার জন্যে গভীরে নিহিত আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি।'

ডঃ চৌধুরীর এই বইয়ের 'পাণ্ডুলিপি' সম্পূর্ণতা পায়নি তার মৃত্যুর কারণে। এটি তাঁর জামাতা

অধ্যাপক ডঃ শুভেন্দুকুমার দেব দীর্ঘদিন ধরে সযত্নে রক্ষা করছিলেন (ডঃ চৌধুরীর মৃত্যু হয় ১৩ জুন ১৯৮৩ তারিখে)। পরে এটি বিভিন্ন কৃতবিদ্য ব্যক্তির সহযোগে মুদ্রণযোগ্যতা লাভ করে এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এর একটি চমৎকার ভূমিকা লিখে দিয়েছেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সিপাহি বিদ্রোহের মতো সর্বভারতীয় না হলেও সাঁওতাল বিদ্রোহও ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা। এই বিদ্রোহও ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থান। এ বিষয়ে যে সমস্ত সরকারি চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয় তার উল্লেখ করে এই সাঁওতালি গণযুদ্ধের একটি নির্ভরযোগ্য ইতিবৃত্ত রচনা করে তাঁর গ্রন্থের সূচনাংশ রচনা করেছেন ডঃ রণজিৎকুমার সমাদ্দার। এটি রচনা করতে গিয়ে প্রাপ্তব্য সমস্ত ইংরেজি বাংলা এবং সাঁওতালি [illegible] তিনি পাঠ করেছেন এবং তাদের প্রয়োজন মতো ব্যবহার করেছেন। ইতোপূর্বেই তিনি এতদ্বিষয়ক একটি নাতিবৃহৎ বই লিখে (বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সেই বইতে একটি পরিচ্ছেদ সাঁওতাল বিদ্রোহের আলোচনায় নিযুক্ত ছিল। এই গ্রন্থে সেই পরিচ্ছেদটিই বিস্তৃত হয়ে গ্রন্থরূপ পেয়েছে। তবে প্রথমে সাঁওতাল আন্দোলনের ইতিবৃত্তটি সংক্ষেপে লিখে পরে বাংলা সাহিত্যে এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইতিহাস পর্বটি চারটি উপপর্বে বিভক্ত ছিল, সাহিত্যপর্বটি ছ'টি উপপর্বে বিন্যস্ত। প্রথমে তিনি গাথা কবিতা ও ছড়ায় সাঁওতাল গণযুদ্ধের ইতিবৃত্তটি তুলে ধরেছেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলিই এই ইতিহাসের প্রথম শ্রাব্য ও লেখ্য উপকরণ ছিল। অনেক পরে এর কাহিনী উপন্যাসের উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়। লেখক বাংলা উপন্যাসের কোনও কোনওটিতে কিভাবে ঔপন্যাসিকেরা এই বিদ্রোহকে পটভূমি হিসাবে গ্রহণ করেছেন—তার বিচার করেছেন। ছোটগল্পে এর বিচারের জন্যে একটি অধ্যায় গ্রহণ করেছেন। এভাবে নাটক, গান ও সাময়িক সাহিত্যে এর প্রভাব-বিচারে তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন। শেষে একটি সমীক্ষাপর্বে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্যপঞ্জী নির্মাণ করেছেন যার মধ্যে রয়েছে বন্দি ও দণ্ডিত সাঁওতালদের তালিকা, যুদ্ধাক্রান্ত স্থানসমূহের তালিকা, সাঁওতাল যুদ্ধের বিরোধী সেনাপতিদের নাম-তালিকা এবং সাঁওতাল-যুদ্ধের নায়কবৃন্দের নামপঞ্জী। পরিশেষে প্রাসঙ্গিক তথ্যপঞ্জী-নির্দেশিকাদি পরিবেশিত হয়েছে।

গাথা-কবিতা-ছড়া অধ্যায়ে বিদ্রোহী সাঁওতালদের কবিতা, সাঁওতাল হাঙ্গামার কবিতা এবং ছড়া, সাঁওতাল বিদ্রোহে আহ্বানের কবিতা এবং বিদ্রোহের ছড়া সংকলিত হয়েছে লেখকের প্রাসঙ্গিক সূত্রধারের ভূমিকাসহ। এগুলি তিনি বিভিন্ন প্রস্তুত সূত্র থেকে পেয়েছেন। যেমন প্রথম দীর্ঘ কবিতাটি 'দেশ' পত্রিকাতেই (৪ আগস্ট ১৯৮৪) কুরুবিন্দ ভট্টাচার্য প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এই কবিতাটি কিছু পাঠান্তরসহ বহু পূর্বেই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩৩৪) প্রকাশ করেছিলেন বীরভূমের সিউড়ির সাহিত্যিক প্রবর গৌরীহর মিত্র (বস্তুত আমার মনে হয়েছে এই প্রবন্ধটি এ-বিষয়ে রচিত একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাংলা রচনা)। এই সব কবিতা-ছড়া থেকেই আসল ইতিহাসটি পাওয়া যায় কিছু আবেগ-উচ্ছ্বাসের অতিশয্য সত্ত্বেও। এই সব লোক-উপাদানকে কাজে লাগিয়ে ড. সমাদ্দার উপযুক্ত কাজ করেছেন। উপন্যাস-পর্বে লেখক সাতটি মুখ্য উপন্যাসের আলোচনা করেছেন। এগুলি হল— পাঁচুগোপাল ভাদুড়ির 'ভাগনাদিহির মাঠে' (১৯৫৫), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' (১৯৩৯), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্যবহ্নি' (১৯৬৬), সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'জঙ্গলে' (১৯৫৫), মহাশ্বেতা দেবীর 'সিধুকানুর ডাকে' (১৯৮৫), তপন বসুর 'ভগনাডিগির সেঙ্গেল' (১৯৮৯) এবং 'চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য' ছদ্মনামে ভাগলপুরবাসী সুভাষচন্দ্র বসুর 'অগ্নিপর্ণী শালপিয়াল' (১৯৮৩)। এ ছাড়া স্বর্ণ মিত্র রচিত ও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত 'দামিন-ই-কো'র ইতিকথা', সুধাংশু চক্রবর্তীর 'অরণ্যকন্যা' এবং ইংরেজিতে রচিত কার স্টেয়ার্নের Marma's Village' উপন্যাসটির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করেছেন। আলোচনাটি কালানুক্রমিক হয়নি। বিভূতিভূষণই প্রথম 'আরণ্যক'-এ সাঁওতাল বিদ্রোহোত্তর পরিবেশকে কাজে লাগান। তিনি ছাড়া তারাশঙ্কর, মহাশ্বেতা দেবী এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পরিচিত লেখকদের মধ্যে পড়েন। অন্যেরা ততখানি পরিচিত নন। কিন্তু তাঁরা বিষয়বস্তুর প্রতি যোগ্য দৃষ্টি দিয়েছেন। তবে লেখক মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার'-এর [বা 'বীরসা মুণ্ডা'র] নামোল্লেখ করতে পারতেন। এই বইয়ের ভূমিকায় মহাশ্বেতা দেবী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন কে. এস. সিং রচিত ডাস্ট স্টর্ম অ্যান্ড হ্যাঙ্গিং মিস্ট (পরবর্তী সংস্করণে বিরসা মুণ্ডা অ্যান্ড হিজ মুভমেন্ট, ১৮৭৪-১৯০১)-এর ঋণ স্বীকার করেছেন)। তবে তাঁর আলোচিত বইটির ত্রুটি লেখকের নজর এড়িয়ে যায়নি। তারাশঙ্করের উপন্যাসে, কানুর মৃত্যু হয়েছে গুলিতে, কিন্তু ইতিহাস বলে মৃত্যু হয়েছিল ফাঁসিতে। লেখক তুলনামূলকভাবে 'অগ্নিপর্ণী শালপিয়াল'-এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সঙ্গত কারণেই। একটি মাত্র ছোটগল্পের আলোচনা লেখক করেছেন—সুধীর করণ-এর 'অরণ্যপ্রহরী'। এতে সিদু-কানুর জীবনসংগ্রামের ছবি নেই। অবশ্য ছোটগল্পে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রত্যাশিতও নয়। খণ্ড মুহূর্তগুলির উজ্জ্বলতাই সেখানে প্রার্থিত। সাঁওতাল বিদ্রোহ অবলম্বন করে যে তিনটি সুন্দর নাটক রচিত হয়েছিল তার খবর কম জনেই রাখেন। প্রখ্যাত যাত্রাপালাকার আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'মরেও যারা মরে না' পালাটি। এতে কাল্পনিক চরিত্রের প্রসার বেশি হলেও ইতিহাস উল্লঙ্ঘিত হয়নি। প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায় লিখেছিলেন প্রত্যক্ষ নামে একটি নাটক 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'। তিনি মুখ্যত নির্ভর করেছিলেন ডব্লু ডব্লু হান্টারের লেখা 'Annals of Rural Bengal' বইটির উপর। আর একজন আধুনিক সুপরিচিত নাট্যকার বাদল সরকারের 'বাসিখবর'-ও হুল বিদ্রোহ নিয়ে রচিত। খুব ভাল হয়েছে সাঁওতালী ভাষায় রচিত যুদ্ধের গানগুলির সংকলন। লেখক এগুলির বাংলা অর্থও দিয়েছেন।

লেখকের নিষ্ঠাই পুরনো সংবাদপত্রের জীর্ণ পৃষ্ঠায় লুকিয়ে থাকা সাঁওতাল বিদ্রোহবিষয়ক সংবাদগুলিকে পুনঃসংকলন করায় আগ্রহী করে তুলেছিল। 'সমাচার সুধাবর্ষণ', 'সংবাদ প্রভাকর' এবং 'সম্বাদ ভাস্কর'-এ প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট সংবাদগুলি তিনি চয়ন করেছেন। এ-বিষয়ে পূর্বসূরিদের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকৃত হলে ভালো হত। সমসাময়িক ইতিহাস রচনায় এগুলির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। কারণ এখানে শুধু তথ্য থাকে না, সমসাময়িক মানসিকতাও ধরা পড়ে অনিবার্যভাবে।

সব শেষে লেখক যে তালিকাগুলি দিয়েছেন তা থেকে জানতে পারা যায় যুদ্ধপরবর্তী দণ্ডিত সাঁওতাল বন্দির সংখ্যা ও বিবরণ (৪২ জন)। এঁদের মধ্যে যে কুড়িজন বীরভূমের সেসন জজ কর্তৃক দণ্ডিত হন তাঁদের মধ্যে ১৭ জনই ছিলেন জেলার নলহাটি থানার 'গেরিয়াপানি' গ্রামের অধিবাসী। আছে ৪২ জন সাঁওতাল যুদ্ধ-নায়কের নামও।

লেখক কেন যে সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে রচিত প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে আলোচনা করলেন না, বুঝতে পারলাম না যদিও তথ্যসূত্রে কয়েকটির

নাট্যচিন্তা

বের্টোল্ট ব্রেশট শতবর্ষ সংখ্যা

.................................বিষয়সূচি.................................

ব্রেশট ও আমরা : ঋত্বিক ঘটক। ব্রেশট প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা : শম্ভু মিত্র। বের্টোল্ট ব্রেশট, কমরেড : উৎপল দত্ত। ব্রেশটের সঙ্গে পরিচয় : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রেণী সংগ্রাম, অবৈকল্য ও ব্রেশট : অশোক মিত্র। বের্টোল্ট ব্রেশট : জ্যোতি ভট্টাচার্য। ব্রেশটকে নিয়ে : হাবিব তনবীর। ব্রেশট : জীবন ও শিল্পকর্ম : সৌভিক রায়চৌধুরী। ব্রেশট ও সমকালীন রাজনীতি : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রেশট ও তাঁর নাট্যসাধনা : কবীর চৌধুরী। নাট্যকার ব্রেশট: কুন্তল মুখোপাধ্যায়। পরিচালক ব্রেশট : পল রিলা : অনুবাদ ইরাবান বসু রায়। ব্রেশটের রাজনৈতিক ভাবনা : রথীন চক্রবর্তী। ব্রেশট এবং পিসকাটর : হিউ রোরিসন : অনুবাদ ধীরাজ বসু। ব্রেশট এবং স্তানিস্লাভস্কি : মার্গারেট এডেরশ : অনুবাদ সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত। এপিক থিয়েটার কাকে বলে : ভালটার বেনিয়ামিন : অনুবাদ সন্দীপন ভট্টাচার্য। ব্রেশটের মঞ্চরীতি : এরিক বেন্টলি : অনুবাদ ধ্রুব দাস। ব্রেশট ও সঙ্গীত : কিম এইচ. কাওকে : অনুবাদ অশোক চট্টোপাধ্যায়। ব্রেশট ও তাঁর কবিতা : বার্ণিক রায়। ব্রেশট ও চলচ্চিত্র : সরোজ মোহন মিত্র। সিনেমার প্রথম পাঠ : সোমেশ্বর ভৌমিক। বাংলা প্রযোজনায় ব্রেশট: নৃপেন্দ্র সাহা। বাংলা অনুবাদে ব্রেশট : শেখর সমাদ্দার। বাংলা সমালোচনায় ব্রেশট : আশিস গোস্বামী। বাঙালী ব্রেশটকে বোঝেনি : অশোক রুদ্র। ব্রেশটের নাটকে অমার্ক্সীয় ঝোঁক : দীপেন্দু চক্রবর্তী। ব্রেশট সম্পর্কে উপলব্ধি : মোহিত চট্টোপাধ্যায়। ব্রেশট প্রযোজনার অভিজ্ঞতা : কুমার রায়। মেঘনাদ ভট্টাচার্য। ঊষা গাঙ্গুলী। ব্রেশটপঞ্জী : তন্দ্রা চক্রবর্তী।

ক্রোড়পত্র/১

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ব্রেশটের প্রথম ও দ্বিতীয় নাটক

ক. আচ্ছা তাহলে চল্লাম : অনুবাদ জগৎ মিত্র। খ. হিটলার জার্মানি : অনুবাদ বীরেন দাস। ভূমিকা : পঞ্চানন সাহা

বাংলায় প্রযোজিত ব্রেশটের প্রথম নাটক

আইন : অনুবাদ জ্যোতি রায়। ভূমিকা : বিষ্ণু বসু

ব্রেশটের একটি ছোট নাটক : কর্মখালি । অনুবাদ : চন্দন সেন

ব্রেশটের একটি বড় নাটক : সিটি অব মাহগনি । অনুবাদ : উৎপল ঝা

ব্রেশটের দু'টি গল্প : জুলিয়াস সীজার এবং তাঁর সৈনিক : অনুবাদ নীহার ভট্টাচার্য। হাঙরেরা যদি মানুষ হতেন : অনুবাদ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।

ব্রেশটের কিছু কবিতা : সরোজ দত্ত । বিষ্ণু দে । শঙ্খ ঘোষ । অমিতাভ দাশগুপ্ত । ধনঞ্জয় দাশ । সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় । সমর সেন

ব্রেশটের ডায়েরি : অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ব্রেশটের দু'টি নিবন্ধ : থিয়েটার : একটি সংক্ষিপ্ত যোগসূত্র : অনুবাদ ছন্দম দেব। রবীন্দ্রনাথের কবিতা : অনুবাদ তরুণ সান্যাল

ক্রোড়পত্র/২

কলকাতা, ৪ মে এবং বের্টোল্ট ব্রেশট । নির্বাচিত কিছু ছবি

সম্পাদক : রথীন চক্রবর্তী। সংযুক্ত সম্পাদক : তন্দ্রা চক্রবর্তী, অলকা দাস। ৯০ টাকা

আনুষ্ঠানিক প্রকাশ আগামী ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে। একই সঙ্গে প্রকাশিত হবে একটি ক্যাসেট : 'থিয়েটারে ব্রেশটের গান' । প্রাপ্তিস্থান : নাট্যচিন্তা দপ্তর, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা ১৪। পাতিরাম, নবগ্রন্থ কুটির ও অগ্রণী বুক ক্লাব, কলেজ স্ট্রিট।

উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এছাড়াও বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পত্রস্থ হয়েছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে বাংলায় একাধিক বইও রয়েছে, সেগুলির উল্লেখও বাঞ্ছনীয় ছিল। যেমন গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্তের লেখা ছোট বইটি 'সাঁওতাল ও সাঁওতাল বিদ্রোহ' (১৩৮১ ব.), অথবা ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রকাশিত গোদাবরী পারুলেকর-এর 'আদিবাসী বিদ্রোহ' (১৯৭৮) বইটি। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের 'সাঁওতাল গণ সংগ্রামের ইতিহাস' তো অতি নির্ভরযোগ্য একটি বই।

বইটির যেটি সহজ গুণ, তা এর সহজপাঠ্যতা। গবেষণাগ্রন্থের মেজাজ ভারি গাম্ভীর্য এতে অনুপস্থিত।

●

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মলঙ্গী বিদ্রোহের ইতিহাস/ মালী বুড়ো
বামা পুস্তকালয়/কল-৭৩/৫০.০০

লবণ আইন অমান্য আন্দোলন এক সময় গোটা ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যেই আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এবং তার সঙ্গে ছিল একটা স্বাদেশিকতার ভাব। কিন্তু সেই আইন অমান্য আন্দোলনের পিছনেও যে আর একটা আন্দোলনের প্রভাব ছিল, সেটা খুব কম লোকেরই জানা।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ১৭৯৯-১৮০৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তমলুক ও হিজলী অঞ্চলের ৩৪ হাজার মলঙ্গী কোম্পানির অবিচার, অত্যাচার ও অ-মানবিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে যে গণ-বিদ্রোহ করেছিলেন, যাঁরা সমবেত হয়ে সেই বিক্ষোভ আন্দোলনের শামিল হয়েছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্টদের বিরুদ্ধে, তাঁদেরই আনুষ্ঠানিক ইতিহাস উল্লিখিত হয়েছে এই গ্রন্থে। ১৭৯৯ সালের এপ্রিল মাসে বিভিন্ন গ্রামের কিছু প্রতিনিধি সল্ট কমিটির প্রেসিডেন্টের কাছে তাঁদের দুঃখদুর্দশার অভিযোগ জানাতে গিয়ে যে লাঞ্ছনার শিকার হয়েছিলেন এবং তার ফলে পরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন সেই নাটকীয় কাহিনী এই রচনার ভিত্তি।

এমন একটি বিপ্লবের দলিল শুধু মেদিনীপুর নয়, সারা ভারতের পক্ষেই গৌরবের।

আকবর দ্য গ্রেট/ অসীমানন্দ মহারাজ
মল্লিক বুক স্টল/ কল-৭৩/ ৩৫.০০

আকবরের জীবন নিয়ে রচিত সরল আখ্যান। কোনও নতুন দৃষ্টিকোণ খুঁজলে হতাশ হতে হবে। যাত্রা-সুলভ আবেগ ও সংলাপ শুরু থেকে শেষ অবধি।

উপযুক্ত শিল্পীর হাতে পড়লে কত গভীর হতে পারে রাগ আভোগী তার প্রমাণ দিলেন নরেন্দ্রনাথ ধর

সং গী ত

উজ্জ্বল সংগীত উৎসব

এ বছরের সল্ট লেক সিটি মিউজিক ফেস্টিভ্যাল প্রয়াত গায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। যথারীতি কলাকুঞ্জে আয়োজিত অনুষ্ঠানটিতে প্রত্যেক বছরের মতো এবারেও কিছু শিল্পী ও তাঁদের গুরুদের জন্য "যদুভট্ট" পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। উল্লেখযোগ্য পুরস্কৃত গুরুদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত এ. কানন। রাহুল ভট্টাচার্য ও অনির্বাণ সাহা নামক দুই সঙ্গীত শিক্ষার্থী এ বছরের হালওয়াসিয়া বৃত্তি পান।

রাধিকামোহন মৈত্র ও উস্তাদ আমজাদ আলি খাঁর যোগ্য শিষ্য এবং লখনউ ভাতখণ্ডে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ধর ছিলেন তৃতীয় সন্ধ্যার শেষ শিল্পী। এঁর প্রধান নিবেদন ছিল রাগ আভোগী। আলাপের প্রথম মিনিট থেকে ঘন মিড়-আস দিয়ে ভরা অতি বিলম্বিত স্বরাচার করে রাগের মধ্যে তিনি এক উপভোগ্য গম্ভীর ভাব উৎপন্ন করে ফেলেন। আলাপের প্রথম দশ মিনিটের মধ্যে পরিষ্কার বোঝা গেল এই রাগ উপযুক্ত শিল্পীর হাতে পড়লে কত গভীরতার মাধ্যম হতে পারে। গান্ধার ধৈবৎ লাগানোর ঢঙে এবং বাম হস্তের উন্নতমানের ব্যবহারে আমজাদ আলির নিদর্শনের লক্ষণ স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিল। এরপর মাইক্রোফোন শিল্পীর মনের মতো না হতে থাকায় তিনি বেশ কয়েকবার নিয়ন্ত্রণকারীকে নির্দেশ দেন। বাজনার মেজাজ ফলে খানিকটা ব্যহত হয়। আলাপও মিনিট পনেরো মতো চলে শেষ হয়ে যায় তারপর শুরু হয় জোড়। এই অংশে কাঠামোগত দৃঢ়তার সঙ্গে সাবলীল সুরময়তার এক সুন্দর সমন্বয় ছিল লপেট ও গমকের কাজে। শেষে সংক্ষিপ্ত বোল অঙ্গের ঝালা ছিল। বারো মিনিটের বিলম্বিত তিনতাল

আলোচনা : নীলাক্ষ গুপ্ত

গৎকারিতে উচ্চমানের বিস্তার ও ছয়গুণের ছন্দের কাজ ছিল। নিজস্ব বোল বেশ জমিয়ে বাজান তবলাসঙ্গতকার শুভেন চট্টোপাধ্যায়। দ্রুত তিনতাল গৎকারিতে নরেন্দ্রনাথ দক্ষতার সঙ্গে আমাজাদ আলি ঢঙের গমক্ ও লপেটযুক্ত একহারা তান বাজান। ঝালার কাজও ভাল হয়। শেষে শিল্পী মিশ্র ভৈরবীতে আওচার ও কিছু প্রাচীন গৎ পেশ করেন।

নরেন্দ্রনাথের ঠিক আগে ছিল চিন্ময় লাহিড়ীর পুত্র শ্যামল লাহিড়ীর গান। ইনি চিন্ময়বাবুর রচিত রাগ রজনী কল্যাণে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল শোনান, ইমনে শুরু বন্দনার পর। রজনী কল্যাণ চিন্ময়বাবু ও তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা কলকাতায় অনেকবার গেয়েছেন। কাজেই রাগ পরিচয় করানোর মধ্যে আর যাওয়া হল না। তবে শ্যামলবাবু বললেন, রাগটি তাঁর পিতা ভীম ও কল্যাণের সমন্বয় হিসাবে তৈরি করেছিলেন। তাই যদি হয় তাহলে প র সঙ্গতি ছাড়া এই রাগে কল্যাণের কী উপাদান আছে? বিলম্বিত খেয়ালটির প্রথম অংশে চিন্ময়বাবুর কায়দায় বোল বানানোতে খানিকটা মজা থাকলেও স্বরক্ষেপণে ও স্বরচ্চারণে একপ্রকার বাংলা আধুনিক গান বা চলচ্চিত্রের গানের ন্যাকা ন্যাকা ভাব ছিল। উচ্চারণের বাঙালিয়ানা এই ভাবের একটি উপাদান ছিল।

পার্থ বসুর মালকৌঁশ রাগে আলাপ ও গৎকারি ছিল পঞ্চম সন্ধ্যার শেষে। এঁর বাজনা গত বছরের ডোভার লেন সঙ্গীত সম্মেলনেও শুনেছিলাম এবং বছর খানেকের মধ্যে বেশ লক্ষণীয় অগ্রগতি হয়েছে বলে মনে হল। মিনিট এগারোর আলাপটি তিনি মূলত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কায়দায় বাজিয়েছিলেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রোতার মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতা ছিল এই দৃঢ় চলনের

আলাপটির। উন্নতমানের গমকের কাজ ছিল জোড় অংশে এবং শেষে শিল্পী অল্পক্ষণ অতি পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট দ্রুত ঝালা বাজিয়েছিলেন। বিলম্বিত ও দ্রুত তিনতাল গৎকারিতে সুর ও ছন্দের সমন্বয় উন্নতমানের ছিল। তানকারি ও তান তেহাইয়ের ব্যবহারেও শিল্পী যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করেন। তানগুলি মূলত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের চালের হলেও তাতে নিজস্ব উদ্দীপনার লক্ষণও ছিল।

এ সন্ধ্যার আসর শুরু হয়েছিল সুনন্দ মুখোপাধ্যায়ের সরোদ বাদন দিয়ে। ইনি ইমন রাগে আলাপ ও তিনতালে নিবদ্ধ গৎকারি শোনান। আলাপের চালে এবং খেয়াল অঙ্গের কিছু কাজে উস্তাদ আমজাদ আলি খাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট ছিল। জোড়ের মিড় ও গমকের কাজেও এই প্রভাব ছিল কিন্তু জায়গাবিশেষে সুর সামান্য কম-বেশি লাগছিল। বিলম্বিত ও দ্রুত তিনতাল গৎকারি মোটামুটি ভাল হয়েছিল কিন্তু অতিদ্রুত ঝালার শেষ পর্বে সুর ছুটে গিয়েছিল। দ্বিতীয় শিল্পী সুরঞ্জনা বসু প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাঁঝ বিভাস নামক রাগে বিলম্বিত একতাল ও দ্রুত তিনতাল খেয়াল শোনান। রাগটির সঙ্গে প্রচলিত জয়েত রাগের বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। শ্রী রাগের কায়দায় গান্ধারের কন্ সমেত ঋষভ লাগানোর কায়দাটি স্বল্প পার্থক্যের মধ্যে একটি বলে ধরা যেতে পারে। তিনি বিস্তারের কাজ প্রধানত খাড়া স্বরের মাধ্যমে করেছিলেন বিলম্বিতটিতে। মধ্য বিলম্বিত থেকে মধ্য দ্রুত লয়ের বেশ কিছু সরগমের কাজও তিনি করেছিলেন সাধারণ দক্ষতার সঙ্গে। দ্রুত খেয়াল পর্যায়ের আকার তানকারি ও দ্রুত সরগমের কাজ তুলনায় অনেক ভাল হয়েছিল বলে মনে হয়।

ম্যান্ডোলিন বাদক স্নেহাশিস মজুমদারের বৈঠক ছিল চতুর্থ সন্ধ্যার শেষে। ইনি চারুকেশী রাগে আলাপ ও গৎকারি শোনান। আলাপটি প্রধানত সবচেয়ে মোটা তারটিতে বাজিয়েছিলেন শিল্পী। প্রথম ও দ্বিতীয় তারগুলি চিকারির কাজ করছিল। লম্বা ঘষে বাজানো মিড়গুলি মন দিয়ে শোনার মতো হয়েছিল এবং এইগুলির মধ্যে বেশ একটা উপভোগ্য ফাঁপা গমগমে ভাব ছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ তারে বাজানো খাঁড়া স্বরগুলির আওয়াজ ব্যাঞ্জোর কাছাকাছি ছিল। স্নেহাশিস সরোদের কায়দায় লড়লপেটে, বোলকারি ও গমকের কাজ বেশ ভাল বাজান। একাধিক তার ঘুরে আসা তানগুলিও যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছিল। ঝালার কাজও ছিল একই মানের। স্নেহাশিসের বিলম্বিত তিনতাল গৎকারি সেতার সরোদের গৎকারির মানেরই হয়েছিল। তাঁর বোল ও ছন্দের নকশাগুলির মধ্যে যথেষ্ট নিজস্বতা ছিল এবং মাঝেমধ্যে কর্ডের কাঠামোয় মজা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। তানের কাজ ভাল হলেও এতে আর একটু বৈচিত্র্য আনা হলে বোধ করি আরও ভাল হবে। এ-সন্ধ্যার আসর শুরু হয়েছিল পণ্ডিত এ কাননের বর্ষীয়ান শিষ্য দিলীপ দাসের ইমন রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়ালের মাধ্যমে। দিলীপ দাসের কণ্ঠ দরাজ ও বলিষ্ঠ। বিলম্বিত খেয়ালটিতে তিনি বেশ গুছিয়ে বিস্তার করেছিলেন এবং জমিয়ে গমকযুক্ত সরগম ও তানকারি গেয়েছিলেন। মারুবেহাগের দ্রুত খেয়ালটি ও শেষের পিলু ঠুংরিটিও তিনি ভাল গেয়েছিলেন।

এরপর সেতারবাদক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় রাগেশ্রী পরিবেশন করেন। মূলত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঢঙে বাজানো আলাপটি মোটামুটি ভালই হয়েছিল। শিল্পী জোড় শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে উপরের বড় প্রেক্ষাগৃহ থেকে ইলেকট্রিক বেস গিটারের আওয়াজ আরম্ভ হল। এতে বাজনা শুনতে ভাল রকম অসুবিধা হচ্ছিল। শিল্পী এই অংশে বেশ ভাল গমকতান, মিড় যুক্ত তান ও লড়লপেটে অঙ্গের তান বাজিয়েছিলেন। বিলম্বিত তিনতাল গৎকারিও একই মানের হয়েছিল এবং কিছু আটগুণের তান-তোড়া বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। দ্রুত তিনতাল গৎকারির তান-তোড়াও খারাপ হয়নি তবে মাঝেমধ্যে হাত ফস্কানো ও সুর ঠিকমতো না লাগার দুর্ঘটনাও ছিল। তিনি ঝালাটি বেশ ভাল বাজিয়েছিলেন।

কিশোর সরোদবাদক অভিষেক লাহিড়ী বাজিয়েছিলেন শেষ সন্ধ্যার শুরুতে। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার আগেই তিনি বেহাগ রাগে আলাপ ধরেন। এটা তাঁর গুরু ও পিতার চিন্তার অভাবের ফল বলে ধরতে হবে। বেশ গতিমান আলাপটি আলি আকবর ও আমজাদ আলি দুইয়েরই রসদ ব্যবহার করে ভালই দাঁড়িয়েছিল। জোড়ে কিশোরটি আমজাদ আলির কায়দার একহারা ও বোল অঙ্গের তান-তোড়া এবং ঝালা তাঁর বয়সের পক্ষে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে বাজিয়েছিলেন। তাঁর বিলম্বিত তিনতাল গৎকারিও বেশ ভাল। এই অংশে তিনি উপভোগ্য বিস্তার এবং আটগুণের একহারা ও গমকতান বাজিয়েছিলেন। সাথসঙ্গত বাজাতে বাজাতে তার ছিঁড়ে যায় এবং এর সঙ্গেই বিলম্বিত গৎকারি শেষ হয়। প্রথম দ্রুত তিনতাল গৎটির সময় শোনার জিনিস ছিল আলি আকবর কায়দার দুন ও চৌগুণ তান-তোড়া। নিজস্ব কায়দায় কিছু একহারা তানকারিও অভিষেক এই অংশে বাজিয়েছিলেন। এরপর উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর একটি দ্রুত রচনার স্থায়ীটুকু বাজিয়েই তিনি আমজাদ আলি কায়দায় ঝালা ধরেন এবং দক্ষতার সঙ্গে বাজান।

এরপর সরস্বতী রাগে (স র ম্ক প ধ ণ) বিলম্বতি একতাল খেয়াল ধরেন প্রসুন ও মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যা ইন্দ্রাণী মজুমদার। শুরুতেই তাঁর কণ্ঠস্বর সংক্রান্ত কিছু সমস্যা হচ্ছিল কাজেই বিস্তারের প্রথম অংশ ভাল হয়নি। দ্বিতীয়াংশ এর চেয়ে সামান্য ভাল হয়। সরগম ও তানকারিও একেবারেই ভাল হয়নি। দ্রুত তিনতাল খেয়াল ও শেষের তিলং ঠুংরিটিও একই রকম হয়েছিল। সম্মেলনটি শেষ হয় রীনা ও রাজীব চক্রবর্তীর বাগেশ্রী রাগে সেতার-সরোদ যুগলবন্দির মাধ্যমে। আলাপ ও জোড়ে তাঁরা মোটামুটি শোনার মতো রাগরূপায়ণ করেন এবং সমঝোতার সঙ্গে বাজান। চার তাল কি সওয়ারির গৎকারিতে রীনার ছন্দের কাজ, তেহাই ও তানকারি বিশেষ উপভোগ্য হয়। দ্রুত তিনতাল গৎকারিও মোটামুটি ভাল হয়।

দ্বিতীয় সন্ধ্যা শুরু হয়েছিল ইন্দ্রাণী সাহা চৌধুরীর কত্থক নৃত্যের মাধ্যমে। এরপর পুরিয়া ধানেশ্রী রাগে বিলম্বিত খেয়াল ধরেন পার্থসারথি মজুমদার। এঁর বোলবিস্তারে মাঝে মাঝে পাঞ্জাবি কায়দার মুড়কির ব্যবহার দেখা গেল। বিস্তারের অংশ মোটামুটি ঠিকঠাক হলেও বিশেষ উপভোগ্য হয়নি। তাঁর সরগমের কাজ বিশেষ ভাল হয়নি তবে এই অংশে তিনি যে কয়েকটি তান গেয়েছিলেন সেগুলি সরগমের চেয়ে ভাল। দ্রুত একতাল খেয়ালটিতে মাঝারি ও ছোট তান গাওয়া হয়েছিল। তানগুলি ওজনে হালকা এবং পাটিয়ালা ঢঙ ঘেঁষা। প্রায়ই শিল্পীর গলা তান গাওয়ার সময় নড়বড় করছিল। শেষের মিশ্র খাম্বাজ ঠুংরিটি কিন্তু তিনি অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে গেয়েছিলেন। এ-সন্ধ্যার শেষ শিল্পী ছিলেন সেতারবাদক কার্তিক শেষাদ্রী। ইনি প্রায় পণ্ডিত রবিশঙ্করের কার্বন কপির মতো চারুকৌশ রাগে আলাপ, জোড়, ঝালা ও চারতাল-কি-সওয়ারি গৎকারি বাজিয়ে শোনান। এঁর হস্তকৌশল মধ্যবয়সের রবিশঙ্করের স্তরের। শেষের মিশ্র মধ্যমসে (মধ্যমকে ষড়জ করে) গারা রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত তিনতাল গৎকারিও রবিশঙ্করের মতোই শুনতে হয়েছিল।

প্রথম সন্ধ্যার প্রথম বৈঠকটি ছিল তরুণ সরোদবাদক অভিজিৎ ঘোষের। এঁর যোগ রাগে আলাপ ও জোড় তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও ঝাঁপতাল গৎকারির তান তোড়া ও বোলকারিতে যথেষ্ট উন্নতির লক্ষণ ছিল। তবে কয়েকটি জায়গায় সামান্য সুরচ্যুতি হয়েছিল । দ্রুত তিনতাল গৎকারিতে ঝালার কাজ উন্নত মানের হয়েছিল। পরিষ্কার চিকারির কাজের

সঙ্গে খাদের কাজে দৃঢ় সুর রচনা উপভোগ্য হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে বেশ ভাল তবলাসঙ্গত করেছিলেন হিন্দোল মজুমদার। দ্বিতীয় ও শেষ বৈঠকে ছিল সংযুক্তা ঘোষের কণ্ঠসঙ্গীত। এঁর জয়জয়ন্তী রাগের বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল দুটি বিশেষ ভাল হয়নি। গলার অবস্থাও ভাল ছিল না। তবে আভোগী রাগে উস্তাদ মুনওয়ার আলি রচিত খেয়াল দুটি তুলনায় খানিকটা ভাল হয়েছিল। দুটি রচনাই অসাধারণ আমেজে ভরা।

হৃদয়খানি ঘুরে মরে

আলোচনা : শোভন সোম

বাংলা আকাদেমিতে একবিংশের উদ্যোগে দেবদত্ত গুপ্ত 'গওহরজান থেকে রবীন্দ্রনাথ ১৯০২-৩২' শীর্ষক অনুষ্ঠানে আলোচনা সহযোগে সে-সময়ের চব্বিশটি ডিস্ক বাজিয়ে শোনালেন। বাজাবার কথা ছিল আঠাশটি ডিস্ক। বাঙালির ঢিলেঢালা স্বভাবের কথা নতুন করে কী বলব। যথারীতি অনুষ্ঠান শুরু হল দেরিতে। ঘোষিত আলোচক ছাড়াও দফায় দফায় অনেককে মঞ্চে তোলা হল, যে-বক্তৃতার কথা ছিল না সে-সব হল। সম্ভাষণ অভিভাষণে বেলা গেল। যান্ত্রিক বৈকল্যেও বিলম্ব হল। ফলে ন'টা বাজতেই কক্ষের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বন্ধ হল, উজ্জ্বল আলো নিবে কম আলোয় অনুষ্ঠান শেষ করার সংকেত দেওয়া হল। রবীন্দ্রনাথ, অমলা দাশে আসার আগেই অনুষ্ঠান শেষ হল। অধিকাংশ অনুষ্ঠানের মতো এই অনুষ্ঠানেও প্রোফেশন্যালিজমের অভাব বিরক্তিকর মনে হল।

পুরনো ডিস্কে প্রথমে কিছু হিন্দি রাগভিত্তিক গান তারপর বাংলা গান ও বাংলা নাটকের গান শোনানো হল। স্বাধীনতার আগেও ঘরে ঘরে রেডিয়ো ছিল না। এই শতকের প্রথম আধাআধি ডিস্কই ছিল বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। যে-গান বার মহলের গান ছিল সে-গান ডিস্কে বাহিত হয়ে প্রবেশ করে অন্দরে। সুখী গৃহকোণ শোভে গ্রামোফোন, ছিল খুব লাগসই বিজ্ঞাপনী বার্তা। বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে আমরা কলের গানকে দেখেছিলাম, ইতিহাসের বিষয় হিসেবে দেখিনি। এদেশে ১৮৯৯ থেকে ১৯০৮ অবধি বাজারে পণ্য হিসেবে আসা দেশি ডিস্কের তালিকা বা ডিসকোগ্রাফি প্রথম খণ্ডটি আমরা প্রস্তুত করিনি, করেছেন চার বছর আগে অস্ট্রেলিয়া থেকে এসে মাইকেল কিনিয়ার। পুরনো ডিস্ক আমরা কেন শুনব, সে-কথাটা বলে দিলে ভাল হত। থেকে থেকে যাঁদের মঞ্চে ডাকা হল, তাঁদেরও সে-কথা জানা থাকলে ভাল হত, নতুবা জনৈক বক্তা মঞ্চে বসে কে মল্লিককে ভ্যাঙচাতেন না ; তিনি আলুপেঁয়াজের বস্তার উপর বসে হারমোনিয়ম প্যাঁ প্যাঁ করে টিপে গান গাইতেন,—এসব বলতেন না। এ ধরনের বক্তা আসরের মর্যাদা ও গুরুত্ব নষ্ট করেন। পুরনো ডিস্ক আমরা এ কারণে শুনব যে, এদেশি গানের ইতিহাসের শ্রুতিগোচর দলিল বিশ্বস্তভাবে এই একশো বছরের ডিস্কে ধরা আছে। ধ্বনিমুদ্রণ ব্যবস্থার আগে গান কীভাবে গাওয়া, সে-বিষয়ে নানাজনের নানা মত। গানের বিচিত্র বিবর্তনের দলিল হিসেবে এই গান আমাদের শুনতে হবে।

মাইকেল কিনিয়ারের বই থেকে জানা যায়, অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সুপারিশে এড্ওঅর্ড গেইস্বার্গের তোলা প্রথম বাংলা গানের ডিস্কে গেয়েছিলেন দু'জন ড্যান্সিং গার্ল বা নচ গার্ল শশীমুখী ও ফণিবালা। এই নৃত্যগীত-অভিনয় পটীয়সীরা দীর্ঘকাল জাপানি গেইশাদের মতো নাচ-গানের পরম্পরা প্রবাহিত রেখেছিলেন। উনিশ শো দুই নাগাদ গওহরজানের 'দরদ্-এ জিগর'-এর পাশে ত্রিশ বছর পরে কৃষ্ণচন্দ্র দে-র 'আমার কবিতা' শুনলে বোঝা যায় যে গাইবার ঢঙেরই বিবর্তন ঘটেছে কত দ্রুত। হিন্দি গানের চারটি ডিস্কের মধ্যে ছিল গওহরজানের ঝিঁঝিট যাতে ছোট ছোট কাজের মধ্যে ছিল দুটো সুন্দর তান। বাজানো হল জানকীবাইয়ের কাজরি, দুর্গাবাইয়ের সোহিনীতে ছোটা খেয়াল ও কেসরিবাইয়ের 'জাত কহাঁ হো', যা-শুনে 'বাবুল মোরা নৈহর ছুট যায়' মনে পড়ে। এই বাইজিরা বাংলায়ও রাগবদ্ধ গান বেশি গাইতেন। এঁদের মধ্যে গওহরজান, কৃষ্ণভামিনী, আশ্চর্যময়ী, বেদানা দাসী, ইন্দুবালা, পূর্ণকুমারী, আঙুরবালার গানের শিক্ষণীয় দিক এই যে, গান অনুসারে ওঁরা উচিত স্কেলে গাইতেন। তবলা আর হারমোনিয়ম সম্বল করে এবং সংগতকে কখনও চড়া হতে না দিয়ে ওঁরা যে-ভাবে গান তৈরি ও পেশ করতেন, তা অতুলনীয়। আঙুরবালা বলেছিলেন, ট্রেনার হিসেবে নজরুল সুরের কাঠামো ধরিয়ে দিয়ে ওঁদের গলার মিঠাস্ বা মিষ্টত্ব দিয়ে পেশ করার স্বাধীনতা দিতেন। তারই সুন্দর উদাহরণ শোনা গেল ইন্দুবালার 'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর' গানে। দাদরায় নিবদ্ধ এই গানে ইন্দুবালা 'শ্রাবণ মেঘে নাচে নটবর' অংশে যেভাবে মেঘের আবহ এনেছেন তা একটু স্বরলিপিজ্ঞান থাকলেই অনুভব করা যায়। আবহ সৃষ্টির এই অভিজ্ঞতা গানের পরবর্তী ডিস্কগুলিতে পাওয়া যায় না।

প্রণতির যে স্নিগ্ধ নম্রতা তাঁর গাইবার ঢঙে আছে, তা ঝমাঝম বাজনা সহযোগে চটুলভাবে পরে গাওয়া এই গানে তেমন শোনা যায় না। এই সব তুলনা এই ধরনের ডিস্ক শুনলে স্বাভাবিকভাবে মনে আসে।

নাটকের গানে শোনানো হল ক্ল্যারিনেট ও বেদানা দাসী, নীহারবালা, নরীসুন্দরী এবং কে সি দে-র গান। সময়ের কারণে যেমন সব ডিস্ক বাজানো যায়নি তেমনই সংকলনে এবং বিন্যাসে সম্ভবত ডিস্কের অভাবে কিছু ফাঁক থেকে গেছে। কিছু গান তুলনামূলকভাবে বাজানো যেত, যেমন বেদানা দাসী ও চারুশীলার গাওয়া 'আজি এসেছি এসেছি বঁধু হে'-র সঙ্গে কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া এই গান। পুরুষকণ্ঠে বাজানো হল লালচাঁদ বড়াল, বিশ্বনাথ রাও, কে. মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে ও কালিপদ পাঠকের গান। কালিপদ পাঠক ওই ডিস্কটি করেন ১৯৩২-এ। অথচ অনুষ্ঠানে, তাঁর আগেই করা রবীন্দ্রনাথের ডিস্ক বাজানো হল না। হিন্দুস্থান রেকর্ডে অতুলপ্রসাদ সেন ১৯৩২-এ তাঁর একমাত্র ডিস্কটি করেন। এটির কোনও উল্লেখই শোনা গেল না।

এ ধরনের অনুষ্ঠানের অ্যাকাডেমিক মাত্রা আছে, এ কেবল শুধু হাসিখেলা প্রমোদের মেলা নয়। তাই এর উপস্থাপনও গোছানো হওয়া উচিত ছিল। বাইজিদের নিয়ে বিস্তর গালগল্প আছে। তার সত্যাসত্য সংশয়াতীত নয়। এ ধরনের অনুষ্ঠানে ওসব না-তোলা উচিত ছিল। বক্তারাও আরও একটু ওয়াকিবহাল হয়ে বললে ভাল হত। যেমন শোনা গেল, জংলা একদা 'জনপ্রিয় রাগ' ছিল। ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন ১৯২৭-এ স্থাপিত হলেও জনৈক বক্তা ১৯২০তে রেডিয়ো আপিসের কথা বললেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানির কপিরাইট চুক্তি ১৯২৬-এ স্বাক্ষরিত হলেও জনৈক বক্তা বললেন নোবেল পুরস্কার পাবার ঠিক পরেই নাকি এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। কৃষ্ণভামিনীর 'ও যে মানে না মানা' সম্পর্কেও তথ্যে ভুল ছিল। চণ্ডীদাস মাল তুলনামূলক একটি গান গাইলেন। দেবজিৎ

বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়ে দিলেন যে কৃষ্ণচন্দ্র দে-র 'অন্ধকারের অন্তরেতে' ও 'আমার কবিতা' গান দুটিরই আকর হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'যখন তুমি বাঁধছিলে তার'। এ ধরনের অনুষ্ঠান আরও শুনতে চাই, তবে তা যেন যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে করা হয়।

নাটক

ভেলকির অন্তরালে মানবিক চেতনার কথা

প্রথমে সাদা ওড়না উড়িয়ে শ্বেতপরী-সদৃশ আবছা চেহারার এক নারী, তারপর প্রথমে ইতস্তত কিছু ছায়া ছায়া, এবং শেষে দলবদ্ধ কিছু যুবাপুরুষ ওয়ার্কশপের ভঙ্গিতে হালকা পায়ে মঞ্চ সাজিয়ে চলে গেল। মঞ্চে তখন চাপা জোছনার মতো আলো। ক্রমে সেই আলো অন্ধকার হয়ে ফের সেখানে পড়ন্ত বিকেলের আলো ফুটে উঠতে হেমকান্ত গুটি গুটি পা ফেলে গাছপালা ঘেরা পার্কের বেঞ্চে এসে বসলেন। রিটায়ার্ড, বিপত্নীক মানুষটার এটা নিত্যকার অভ্যেস। সংসারে বন্ধন বলতে অস্থির, লক্ষ্যহীন, কিছুটা-বা মনস্তত্ত্বের শিকার একমাত্র সন্তান বুলা। যার ঘাড়ে চেপে তার ছবি আঁকিয়ে বেকার প্রেমিক জীবনটা কাটিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখে।

এক সময় সেখানে এলেন বিধবা, চাকুরিয়া কণকলতা। যার কথা থেকে বোঝা যায়, তিনি অফিস থেকে বেরিয়ে প্রত্যহ এখানে আসেন। বাড়িতে তার নিঃসন্তান (বউমা সন্তানের মা হতে অনিচ্ছুক) ছেলে-ছেলের বউ। যারা পালা করে ঝগড়া করে, আবার একসঙ্গেই বাড়ি করে বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখে। তারা জানে, মা

আলোচনা: শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

অফিস থেকে বেরিয়ে মহিলা সমিতি করে বাড়ি ফেরেন। অর্থাৎ সংসারকে এড়িয়ে চলেন।

প্রথম দৃশ্যে কণকলতাকে হেমকান্তর পার্কের বাইরের দোকান থেকে নিজের হাতে ভাঁড়ে করে চা এনে খাওয়ানো এবং সংলাপে বোঝা গেল, তাঁদের আলাপ সেই মুহূর্তে হৃদয়ের অনেকটাই কাছাকাছি এসে গিয়েছে। প্রথম দৃশ্যেই শোনা গেল হেমকান্ত হেসে বলছে, এই কাছাকাছি থাকার সম্পর্কটা এবার পাকাপাকি করলে কেমন হয়? আমরা দু'জনেই তো নিঃসঙ্গ, পিছুটান বলতে তেমন করে কিছু নেই। হেমকান্তর তরঙ্গায়িত হাসির সঙ্গে সেই কথা শুনতে শুনতে কণকলতার মুখ-চোখে বয়স কমে গিয়ে এক ধরনের সলাজ হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

সমীক্ষণ প্রযোজিত 'অন্তরাল' নাটকে ঊর্মিমালা বসু ও পঙ্কজ মুন্সি

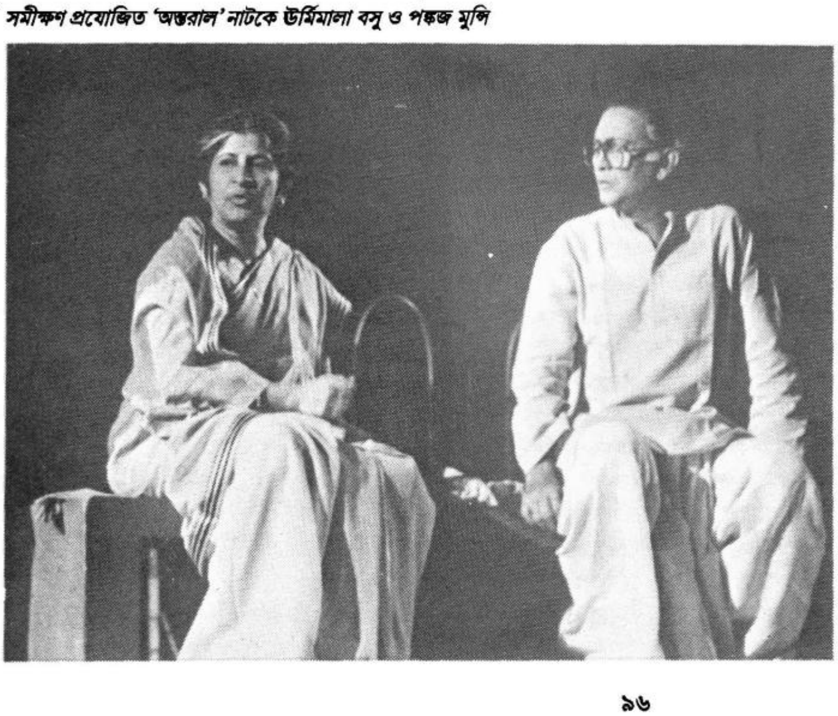

ঠিক এমনি সময়ে কাঁধে ব্যাগ, বগলে একটা মোড়া নিয়ে বিচিত্র পোশাকের এক বিদূষকের আবির্ভাব ঘটালে 'সমীক্ষণ'- এর অন্তরাল (নাটক: উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়) নাটকটি একধাক্কায় চালু এবং সজীব হয়ে উঠল। জগতের বন্ধু জগবন্ধু নামের সেই চরিত্রটি সর্বদা বিপরীত স্বরে কথা বলে, কথায় কথায় একটা টাকা নিয়ে হেড-টেল করে বাজি ধরে হেরে গিয়ে খুশি হয় মুহূর্তে এবং স্বেচ্ছায় ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলিয়ে ঝামেলা পাকাতে ভালবাসে। যে ভালবাসার নিট ফল, সুস্থ জীবনে উত্তরণ।

এই প্রতীকী চরিত্রটিকে সামনে রেখেই নাটকের বিস্তার অর্থাৎ ভেলকি। যে ভেলকির অন্তরালে সুস্থ, যূথবদ্ধ জীবনের ইঙ্গিত ঝিলিক দেয়। মানবিক সৌন্দার্যের কথা বলে। মানুষ হেরে গিয়েও জয়ের আনন্দে অধীর হয়ে উঠতে পারে। এ নাটকে সেই সুস্থ জীবনের সন্ধান আছে। আজকের অবক্ষয়িত জীবনের পক্ষে যা জরুরি। পরিচালক পঙ্কজ মুন্সী এ নাটকে যেমন অনায়াসে প্রৌঢ় নিঃসঙ্গ হেমকান্ত হয়ে উঠেছেন, তেমনই ঊর্মিমালা বসুর কণকলতাও আন্তরিক। তাঁর স্বচ্ছন্দ অভিনয় বুঝিয়ে দেয় তিনিও কত বড় মাপের শিল্পী। কালী মুখার্জীর জগবন্ধু যেমন সজীব তেমনই তিনি প্রাণবন্ত অভিনয় ও অভিব্যক্তিতে ইচ্ছাপূরণের মন্ত্রে সারাক্ষণ দর্শককে মাতিয়ে রেখেছেন। কণকলতার ছেলে নীলুর (সুনীল চন্দ্র) দাপুটে চরিত্রচিত্রণও মুগ্ধ করে। সোমদ্যুতি চট্টোপাধ্যায়ের ঝগড়ুটে, দাপুটে অলকা ও সুদেষ্ণা মুখোপাধ্যায়ের বুলা অনেকটাই বিশ্বাসযোগ্য। সেই অনুপাতে প্রশান্ত রায়চৌধুরী কিঞ্চিৎ ম্লান।

নাটক শুরু হয়েছে ফ্যান্টাসী দিয়ে, শেষটাও তাই। খালেদ চৌধুরীর মঞ্চ, মুরারি রায়চৌধুরীর আবহ এবং জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়ের আলো (বিশেষ করে আলোআঁধারির মধ্যে সেট পালটানোর দৃশ্যে) সেই কাব্যময়তাকে সজীব করে তুলেছে।

পেশাদারী নাটক এখন একরকম শরসজ্জায়। আর একটু সচেষ্ট হলে, মনে হয় গ্রুপ থিয়েটারের কিছু কিছু নাটক আবার সেই স্থান পূরণ করতে পারে। তাহলে বাংলা রঙ্গমঞ্চও বাঁচে।

চি ত্র ক লা

ঐতিহ্যবাহী ও ঐকান্তিক দুই শিল্পী

চিত্রলেখা কাঞ্জিলালের কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত ডিগ্রি না-থাকলেও তিনি সুপরিচিত শিল্পী মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দীর্ঘকাল তালিম নিয়েছেন। তাঁর কাজে তাই ভারতীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির ঐতিহ্যবাহী রূপটি স্বাভাবিক ভাবেই উপস্থিত। এবং এই ঐতিহ্যানুগ রূপের সাধনার ফলশ্রুতি লক্ষ করা

আলোচনা : সমীর দাশগুপ্ত

যায় সিল্কের জমিতে শিল্পীর জলরঙের সাবলীল প্রয়োগদক্ষতায়। সুপ্রাচীন এই মাধ্যমে স্বচ্ছ ও অনচ্ছ দু রকমের বর্ণস্তরকেই তিনি সুচিন্তিতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর দৃশ্যরূপের মেজাজ এবং স্থানিক বিন্যাস অনুযায়ী।

চিত্রলেখা তাঁর স্পর্শগ্রাহ্য প্রতিবেশ থেকে বেশি দূরে ভ্রমণ করতে অনিচ্ছুক। সেটা তাঁর নান্দনিক সুবিবেচনারই পরিচায়ক। কারণ অনেক তরুণ শিল্পীর কাজেই আজকাল যে-ধরনের কষ্টকল্পিত ফ্যানটাসির অবতারণা কিংবা অসংবদ্ধ দুমড়ানো বস্তুরূপের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়, তার অনুকারবৃত্তি যে-কোনও সৎ শিল্পীর পক্ষেই ভ্রান্তিকর। বস্তুরূপের বিকৃতকরণের তাগিদ শিল্পীর নিজস্ব প্রয়োজনবোধ থেকে উদ্ভূত হলে তবেই সেটা অর্থবহ হয়। চিত্রলেখা ভারতীয় ঐতিহ্যে সুস্থিত থেকেও আধুনিক ভাষার সন্ধানে বিশ্বাসী। তবে সে-ভাষা এখন পর্যন্ত প্রধানত ভঙ্গিপ্রধান। শিল্পীর দ্বিতীয় একক প্রদর্শনী সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টস-এ।

দেবাশিস ভট্টাচার্যের আঁকা একগুচ্ছ ড্রইং ও পূর্ণাঙ্গ চিত্রের প্রদর্শনীতে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক ছবির সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে, দর্শকের চোখে ছবিগুলির আকর্ষণ শুধুমাত্র এই কারণেই নয় যে এদের সৃষ্টিকার একজন প্রথম সারির মনোরোগ চিকিৎসক। বরং একথাই মনে হতে পারে যে মানুষের মানসিক জগতের গভীর থেকে আহৃত কিছু ভাবরূপও শিল্পীর সৃজনশীলতাকে সঞ্চলিত করেছে। কালিকলমে আঁকা ছোট আয়তনের আধা-বিমূর্ত ও পূর্ণ-বিমূর্ত ড্রইংগুলি রীতিমতো পরিণত শিল্পকর্ম বলা চলে। রূপকল্পনায় দ্বিধাহীনতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চিত্রকরের দ্রুত স্বচ্ছন্দ কলমের গতিময়তা। আরও কয়েকটি ড্রইং থাকলে প্রদর্শনীটির উপভোগ্যতা নিশ্চয়ই বাড়ত। চিত্ররচনা দেবাশিস ভট্টাচার্যের শখের ব্যাপার হলেও তিনি একজন ঐকান্তিক শিল্পী। তাঁর ড্রইং বিষয়ে প্রথমে উল্লেখ করার অর্থ এই নয় যে পূর্ণতর চিত্রাঙ্কনে তিনি অদক্ষ কিংবা অযত্নবান। তবে তাঁর নির্বাচিত অ্যাক্রিলিকে আঁকা ছবিগুলির রূপকল্পনাতে কিছুটা স্টাইলগত অসংলগ্নতা চোখে পড়ে। তুলনায়, শিল্পীর দুটি রঙিন ছবিতে ('অন দ্য বর্ডার' এবং 'ডার্ক মুন') বিষয় পরিকল্পনা স্পষ্ট। তুলির বলিষ্ঠ স্পর্শে এবং অ্যাক্রিলিকের সুমিত প্রয়োগে ছবি দুটির শরীরে বস্তুভার, তলগত বৈশিষ্ট্য এবং স্থানিক দর্শনানুপাত যথাযথ অর্পিত হয়েছে।

চিত্রলেখা কাঞ্জিলালের শিল্পকৃতি : ভারতীয় ঐতিহ্যে সুস্থিত থেকেও আধুনিক ভাষার অন্বেষণ

দুই তরুণ শিল্পী

আব্দুল হামিদ এবং মানস বিশ্বাস দুজনে আর্ট কলেজে কলাশিক্ষা শেষ করেছেন কমবেশি দশ বছর আগে। এর মধ্যে আত্মপ্রকাশের তাড়নায় ছবি আঁকার চর্চা যে বেশি করেছেন বা যত্ন নিয়েছেন তা মনে হয় না। ছাত্রাবস্থায় অর্জিত পুঁজি তাঁরা আর বাড়াননি, তবে তা অক্ষত আছে।

আলোচনা: মনসিজ মজুমদার

তেলরঙ, জলরঙ, দু'ধরনের কাজেই মানসের অ্যাকাডেমিক দক্ষতা আছে তাঁর বিষয় প্রকৃতি ও মানুষ। নিসর্গদৃশ্যগুলিতে চেষ্টা আছে ডিটেলসের কাজে জোর না দিয়ে একটা মুড বা ভাবকে প্রাধান্য দেওয়ার বা প্রাকৃতিক অবয়বের সামগ্রিক রূপকে ধরার। 'ফাঁকা জায়গা' নামের একটি তেলরঙের ছবিতে তিনি গাছপালা কেটে ফেলে জায়গা ফাঁকা করার দৃশ্য এঁকেছেন। রঙের টোনে এমন বিষণ্ণতা আছে যে পটের সামনের দুটি কেটে ফেলা গাছকে মৃতের মতো মনে হয়। জোর করে কোনও বেদনাবোধ জাগানোর চেষ্টা নেই। কোনও অতিনাটকীয় রূপকব্যঞ্জনা নেই। আর একটি ছবি 'রাত্রি'তে একটা ভাবালুতাহীন নরম বিষণ্ণতা আছে। জলরঙগুলিতে টেকনিক্যাল কাজ পরিচ্ছন্ন, বিষয়ের সাদৃশ্যের চেয়ে রঙ, অবয়ব, জমি নিয়ে কম্পোজিশন করার ঝোঁক বেশি। তুলনায় আব্দুলের কাজে প্রকরণের বা ভাব-ভাবনার তেমন জোর নেই। বরং তাঁর ড্রয়িঙের সীমাবদ্ধতা আছে এবং কিছু অনভ্যাসের ছাপও আছে। তবু দুটি নারীমুখের প্রতিকৃতি তিনি বেশ যত্ন করে এঁকেছেন। 'বৃষ্টি আসবে' নামের তেলরঙের শহরদৃশ্যে আকাশ ছাওয়া বর্ষার মেঘের ছবি এঁকেছেন তিনি। খুব সতর্কতার সঙ্গে তুলি চালিয়েছেন পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের চেহারা আঁকতে। ফলে মেঘের ভলিউম হয়েছে ঠিকই কিন্তু সে মেঘ গাভীর মতো চরে না। তাঁর আর একটি ছবির নাম বই পড়ার ইতিহাস। অংশত হলেও তাঁর তেলরঙ প্রয়োগে সাফল্যের পরিচয় আছে। সেই সঙ্গে তিনি যে স্বল্প ব্যঞ্জনায় একটি বিষয়কে ছবিতে জমিয়ে দিতে পারেন তাও বোঝা যায়। তিনি প্রথাসিদ্ধ জলরঙ আঁকেন না, অস্বচ্ছ রঙে তুলি ডুবিয়ে ছোট ছোট আঁচড়ে ছবির শরীর গড়ে তোলেন। এই ধরনের জলরঙে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য বেশি। তবে তাঁকে আরও এবং অনবরত আঁকতে হবে।

মাত্র আঠারো বছর বয়সের এক নবীন যুবক। নাম শঙ্কর। কেরলের ত্রিক্কুর গ্রামের ছেলে। জন্ম ১৯০৮, ১৫ ডিসেম্বর। মিশনারিদের স্কুলে পড়াশোনা সাঙ্গ করে সোজা ত্যাগের পথে চলে এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী শিবানন্দ 'মহাপুরুষ মহারাজ' তাকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দিয়েছেন। মহাপুরুষ মহারাজ তখন উটিতে। তিনি শঙ্করকে বললেন, রামকৃষ্ণ সংঘের মহীশূর কেন্দ্রে গিয়ে গোপালের কাজে সাহায্য কর। গোপাল মহারাজ অর্থাৎ স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ। মহীশূর আশ্রমে ব্রহ্মচারী শঙ্করের সেবাব্রত শুরু হল রান্নাবান্না, বাসন মাজা, কাপপ্লেট ধোয়ার কাজ দিয়ে।

সেই শুরু। আঠারো বছরের জ্বলন্ত উন্মেষ-লগ্নে নবীন ব্রহ্মচারীর আর এক নবজন্ম। গুরুবাক্য শিরোধার্য করে যে-আপাততুচ্ছ কাজে নিজেকে সেই তরুণ উৎসর্গ করেছিল সেদিন, তিনিই আজ পৃথিবী-পরিব্যাপ্ত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেবাকার্য ও অধ্যাত্মপরিমণ্ডলের প্রধান পুরুষ হয়ে উঠলেন। এই হয়ে-ওঠা তাঁর জীবনে অনিবার্য ছিল কিনা জানি না। কিন্তু যে-দীর্ঘ পথ তিনি অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে পরিক্রমা করে এখানে এসে পৌঁছেছেন, তার মূল্যায়ন করলে মনে হবেই এই সিংহাসন তাঁরই উপযুক্ত। আমরা স্বামী রঙ্গনাথানন্দজির কথা বলছি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, প্রণম্য, স্থিতপ্রজ্ঞ, বুদ্ধপ্রতিম, শাস্ত্রজ্ঞ ও যুক্তিনিষ্ঠ বাগ্মী এই সন্ন্যাসী এক সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন অতিবাহিত করেছেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কয়েকটি কেন্দ্রের তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, কয়েকটি কেন্দ্রের অধ্যক্ষ অথবা সচিব ছিলেন ১৯৩৯ থেকে ৯৩ সাল পর্যন্ত। এরই মাঝখানে ১৯৬২-তে তিনি রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৯-এ মঠ-মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ।

এই সব পরিচয় ছাপিয়ে তিনি এক 'আশ্চর্য বক্তা'। 'আশ্চর্য বক্তা' শব্দ দুটি কঠ উপনিষদে ব্যবহৃত হয়েছে।

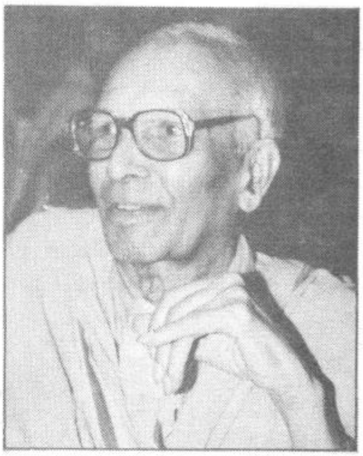

উপনিষদে এর অর্থ সুদুর্লভ বক্তা। পৃথিবীর পঞ্চাশটি দেশে (কমিউনিস্ট দেশগুলি সহ) যিনি বেদান্ত ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী বহন করে নিয়ে গেছেন বছরের পর বছর, অক্লান্ত পরিশ্রমে, তিনি সুদুর্লভ তো নিশ্চয়ই, একইসঙ্গে এক পরমাশ্চর্য প্রভাষক! তাঁর বক্তৃতা একবার যিনি শুনেছেন, তিনি কিছুতেই সেই বাণী ও এই মহৎ মানুষটিকে ভুলতে পারেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের আর এক ত্যাগী শিষ্য স্বামী অখণ্ডানন্দজি তাঁকে আশীর্বাদ করে বলে ছিলেন, তোমার কণ্ঠে সরস্বতী বিরাজ করুন। সেই আশীর্বাদ ব্যর্থ হয়নি। তিনি সদ্যপ্রয়াত স্বামী ভূতেশানন্দজি মহারাজের স্থলাভিষিক্ত হওয়াতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত মানুষ আশ্বস্ত হয়েছেন। কেননা শুধু পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞা নয়, শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্মবোধ নয়, কর্মৈষণা ও বক্তৃতাদান নয়, রঙ্গনাথানন্দজির মধ্যে সমন্বিত হয়েছে এক আশাবাদী মন ও সমস্যা ভারাক্রান্ত মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসায় ভরপুর এক হৃদয়।

'ফের যদি পরমাণু বিস্ফোরণ হয়, তবে কোনও দেশের সঙ্গে আমাদের শত্রুতার জন্য তা হবে না, তখন আমাদের শত্রু হবে এই পৃথিবী। এই পৃথিবীর আলো, বাতাস, আকাশ, জল সবই আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে।' এই আশঙ্কা লেখিকা অরুন্ধতী রায়ের। শুধু অরুন্ধতী নন, এ আশঙ্কা যে আরও অসংখ্য ভারতবাসীর তা বোঝা গেল গ্রীষ্মের এক বিকেলে। সেদিন লরেটো স্কুলে সব ধর্মের মানুষকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছিল 'ক্যালকাটা ইন্টার ফেথ ফোরাম'। উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ মানুষ বিশেষত স্কুলের ছেলেমেয়েদের পরমাণু অস্ত্রদৌড়ের ভয়াবহ দিক সম্পর্কে অবগত করা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ইন্টার ফেথ ফোরাম-এর তরফে ফাদার জর্জ প্যাটারি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে ব্যাখ্যা করেন কেন হঠাৎই এই ধরনের সর্বধর্ম সম্মেলনের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। আবহাওয়া শান্ত আর স্বাভাবিক থাকলে জোর করে কাউকে ডেকে বোঝানোর প্রয়োজন হয় না সময়টা 'প্লেগাক্রান্ত'। আর সেই কারণেই এই ধর্মীয় সমাবেশ, যাতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একে অন্যের সঙ্গে মত বিনিময় করতে পারেন। ফাদার জর্জ এরপর উপস্থিত সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন ইসলাম ধর্মের সুফি হাজি মেহবুব কাশিমের সঙ্গে। পণ্ডিত ও সুবক্তা সুফি কাশিম পাঠ করেন কোরানোর কিছু অংশ। আর তা ব্যাখ্যা করে দেন হিন্দি ও ইংরেজিতে। কোরান থেকে উদ্ধৃত করে তিনি দেখান কোনও ধর্মই হানাহানি বা মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেয় না। সুফি সাহেবের ভাষণের পর প্রার্থনাসঙ্গীত পরিবেশন করেন সিস্টার ব্রাগাঞ্জা। তাঁর সঙ্গে গলা মেলায় স্কুলের ছেলেমেয়েরা। সবশেষে পরমাণু বিস্ফোরণের ভয়াবহতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এনভায়রনমেন্টাল বায়োলজি'র প্রাক্তন অধ্যাপিকা অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, পরমাণু বোমা শুধুমাত্র একটি প্রজন্মেরই ক্ষতি করে না, পরবর্তী বেশ কয়েকটি প্রজন্মকেই এর ফল ভুগতে হয়। তাই যেমন করেই হোক দক্ষিণ এশিয়া-সহ সারা বিশ্বে পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে। অধ্যাপিকা মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সমর্থনে প্রত্যেকে এক স্মারকলিপিতে সই করে নিজেদের প্রতিবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে প্রার্থনাসঙ্গীত পরিবেশন করেন চিন্ময়ী মিশন যুব সংগঠনের ছাত্ররা।

পরিবেশদূষণ। রোগবীজাণু।
স্কুলের বাইরেই টকঝাল ফুচকা।

কয়েকটি প্রধান উপাদানের বৈশিষ্ট

আমলকী অ্যান্টি-অক্সিডান্ট, প্রতিষেধক-উদ্দীপক
কর্কটশৃঙ্গী অবসাদ-নিরাময়ী
ভূমি আমলকী যকৃত-রক্ষাকারী
পিপ্পলী অবসাদ-নিরাময়ী, প্রতিষেধক-নিয়ন্ত্রক, হজমশক্তি-উদ্দীপক
বিদরিকন্দ মেটাবলিজম উন্নতিবিধানকারী
বলা মেটাবলিজম উন্নতিবিধানকারী, অবসাদ-নিরাময়ী
মুস্তক প্রজ্জ্বলন-নিরাময়ী

ছোট্ট বাচ্চারা দূষণ বোঝে না। তবে এটা খুব বোঝে যে ফুচকা খেতে দারুণ মজা! দস্যিপনা, বৃষ্টিভেজা, যেখানসেখানকার জল খাওয়া... সাতবছরের বাচ্চাকে পরিবেশদূষণ বোঝায় কার সাধ্যি!

প্রতিরোধ শক্তি বা ইমিউনিটি

ইমিউনিটি: অর্থাৎ শরীরের ভেতরকার রোগ প্রতিরোধ শক্তি। একটু জ্বর হলেই ওষুধের পর ওষুধ আপনার বাচ্চাকে দুর্বল করে দেয়, রোগবীজাণুর সঙ্গে যোঝবার শক্তি কমিয়ে দেয়। ওর দরকার মজবুত শরীরের ভিত। যাতে রাস্তায় ফুটবল খেলে, ভেলপুরী-ফুচকা খেয়েও স্বাস্থ্য থাকে অটুট।

অনন্য 'ইমিউনিটি টনিক'

আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত ডাবর চ্যবনপ্রাশের এক বিরল গুণ: শরীরের ইমিউনিটি সিস্টেমকে গড়ে তোলার ক্ষমতা। যা আপনার বাচ্চাকে ভেতর থেকে শক্ত করবে এ্যালার্জি ও ইনফেকশনের সাথে মোকাবিলা করতে।

আয়ুর্বেদের দান

চরকসংহিতা অনুযায়ী আয়ুর্বেদের চিরায়ত প্রথায় তৈরী ডাবর চ্যবনপ্রাশে আছে ৪৮টি গাছ, গাছড়া, শিকড়, গুল্ম, ধাতুর গুণ। আছে আমলকী... ভিটামিন সি সমৃদ্ধ রোগবীজাণুর শক্ত প্রতিষেধক। সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যমতে, সেরা ও তাজা প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী। পুরোপুরি নিরাপদ, কোনোরকম অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া ছাড়াই।

প্রস্তুতকারক ডাবর

১১২ বছরের ঐতিহ্যে তৈরী ডাবর চ্যবনপ্রাশ: একদিকে আয়ুর্বেদের সঠিক প্রথা, অন্যদিকে আধুনিক গবেষণার ভিত্তি। যার গুণে নিয়মিত উপকৃত আড়াই কোটিরও বেশি মানুষ। প্রমাণ করছে দূষণ আর রোগবীজাণু সত্ত্বেও সুন্দর স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব।

জানতে চান ডাবর চ্যবনপ্রাশ কিভাবে প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায়? কুপনটি ভরে এই ঠিকানায় পাঠান: ডাবর চ্যবনপ্রাশ, পোস্ট বক্স 7326, নয়া দিল্লী 110 065। আমরা আপনাকে **বিনামূল্যে** একটি তথ্যপুস্তিকা পাঠিয়ে দেব।

নাম শ্রী/শ্রীমতী ______________________

বয়স ______________________

ঠিকানা ______________________

______________________ পিন __________

আপনার পরিবারে কেউ কি ডাবর চ্যবনপ্রাশ খান? আমাদের জানান কারা। ______________________

OVER 100 YEARS OF CARING
Dabur

· ভেতর থেকে শক্ত করে শরীরের ভিত ·

Response 22030

DESH (FORTNIGHTLY) 19 SEPTEMBER 1998 REGD. NO. WB/CC/184/74
MH/MBI-SOUTH/681/97 T.S/MS(C) 1346, RS. 15.00